ঈমান, তাহারাত, সালাত ও বিবাহ সংক্রান্ত মাসায়িল বিষয়ে
বাংলা ভাষায় রচিত প্রামাণ্য অসাধারণ একটি গবেষণা গ্রন্থ

মি'রাজুল মু'মিনীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রণেতা

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুর্শিদে বরহক, শায়খুল হাদীস, শাহ্‌সূফী
আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)

মানবাধিকার

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنهما - قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ , فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا , فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَقَالَا: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ " , فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ , فَقَالَ: " أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟

হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবি লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।র দু'জন সম্মানিত সাহাবী কাদেসিয়ায় বসা ছিলেন। তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে একটি জানাযা গেলে তাঁরা দাঁড়িয়ে যান। তাঁদের বলা হল যে, লাশটি স্থানীয় একজন অমুসলিম যিম্মীর। তখন তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পার্শ্ব দিয়ে একটি জানাযা গেলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাশটি এক ইহুদীর বলে বলা হলে তখন তিনি ইরশাদ করেন,

"সে কি মানুষ নয়?"

(সহীহ বুখারী-১৩১২, সহীহ মুসলিম-৯৬১)

মি'রাজুল মু'মিনীন

প্রণেতা

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুর্শিদে বরহক, শায়খুল হাদিস,

আল্লামা শাহ্সূফী কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

(মুদ্দা যিল্লুহুল আলী)

সম্পাদনায়

অধ্যক্ষ মাওলানা কাযী আবুল বয়ান হাশেমী

অধ্যক্ষ, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা
কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোনঃ ০৩১-৬৮৩৯১৭

প্রকাশনায় ঃ

আনজুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দঃ) গাউছিয়া ভিলাল্লী কমিটি,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মি'রাজুল মু'মিনীন

প্রণেতাঃ
ইমামে আহলে সুন্নাত, মুর্শিদে বরহক, শায়খুল হাদিস, আল্লামা শাহ্সূফী
কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী)

সম্পাদনায়ঃ
অধ্যক্ষ মাওলানা কাযী আবুল বয়ান হাশেমী

গ্রন্থের সর্বস্বত্ব ঃ
গোলজার হাশেমী ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ
৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরী
২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ ঈসায়ী

প্রকাশনায় ঃ
আন্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দঃ) গাউছিয়া জিলানী কমিটি,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন
পরিচালক, শাহ আমানত হজ্ব কাফেলা (ট্রাভেল্স এণ্ড ট্যুরস)
১৮৫/১৯৯ সিদ্দিক মার্কেট, মুরাদপুর সিডিএ এভিনিও, চট্টগ্রাম
ফোন- ০৩১-৬৫২৫৫২, মোবাইল- ০১৮১৯-৩৮১৩৯৫

হাদিয়া ঃ ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।
US $: ১০.০০

উৎসর্গ

যাঁরা আমার আহ্সানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া কামিল
(এম,এ) মাদ্রাসা, হেফজখানা ও এতীমখানার
প্রতি ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করে মওলায়ে
করীম জাল্লা মাজদুহু এর সাথে মিলিত
হয়েছেন, তাঁদের মাগফেরাত
ও আত্মার প্রশান্তির
উদ্দেশ্যে।

গ্রন্থকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা সমগ্র সৃষ্টিজগতের একক প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীন এর জন্য। যিনি আমাদেরকে অমূল্য সম্পদ 'ঈমান' দান করেছেন। পাশাপাশি হাদীয়া স্বরূপ সর্বোত্তম ইবাদত সালাত বা নামায দান করার মাধ্যমে আমাদেরকে সকল জাতির উপর সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছেন এবং নামাজকেই ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বোত্তম রাসূল আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, তাঁর আহলে বাইত, ও আসহাব এর প্রতি। যাঁর বদওলতে নামায নামক মহামূল্যবাণ 'মি'রাজুল মু'মিনীন' তথা নামায নামক মা নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।

হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শুকরিয়া ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি পরম শ্রদ্ধাভাজন ওয়ালেদে মকাররাম শাইখুল মাশায়েখ ইমামে আহলে সুন্নাহ পীরে ত্বরীকৃত শাইখুল হাদীস, ফক্বীহে মিল্লাত আল্লামা হাশেমী (বারাকাল্লাহু ফী হায়াতিহী) সাহেব কেবলার খেদমতে, যিনি 'মিরাজুল মু'মিনীন' নামক পুস্তকখানী লিখে ইবাদত বিমুখ জাতিকে ইবাদতের স্বাধ আস্বাদনে সফল হয়েছেন। আল-হামদু লিল্লাহ।

বিজ্ঞ পাঠক মহল অবশ্যই অবগত আছেন যে, অত্র 'মি'রাজুল মুমিনীন' নামক পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষি মুসলিম জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যার ফলে ইতিপূর্বে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে এখন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এ সংস্করণে সময়ের প্রয়োজনে যুগের চাহিদার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অনেক মাসআলা সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রান্তবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করা সহ অনেক নতুন বিষয়ও সংযোজন করা হয়েছে। নব্য ফিতনা আহলে হাদীস নামক গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান সহ তাক্বলীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি চার বরহক মাযহাবের বিশুদ্ধতা ও হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

আগের সংস্করণ সমূহে শুধু মাসআলা বর্ণনা করা হলেও এ সংস্করণে প্রায় সকল মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ ও ফতওয়ার কিতাবের সূত্র ও রেফারেন্স সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে পাঠক সমাজ এ পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত মাসআলা সমূহ আস্থার সাথে অনুসরণে দৃঢ়তা লাভ করবেন।

পুস্তকটিতে তৃতীয় অধ্যায় সংযোজন করে বিবাহ সংক্রান্ত মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দুয়ানী কুপ্রথা আমাদের মুসলিম সমাজের বিয়ে শাদীতে এত বেশী প্রবেশ করেছে যে, মুসলিম ও অমুসলিমের বিবাহ অনুষ্ঠানের পার্থক্য করা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের বিবাহ শাদীর মৌলিক বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ঈমান, তাহারাত, সালাত ও বিবাহ সংক্রান্ত এ সংকলনটির কাজে সবিশেষ উৎসাহ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আমার ওয়ালেদে মুকাররম এর বিশিষ্ট শিষ্য রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া বহুমুখী কামিল (এম,এ, অনার্স) মাদরাসার সভাপতি ও সাবেক অধ্যক্ষ মুহতারম মাওলানা আ. ম. ম শাসুল আলম চৌধুরী (হাফিযাহুল্লাহ) ও বাংলাদেশ জমিয়তুল মুদার্রেছীন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত মহা সচিব বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী (হাফিযাহুল্লাহ)।

পাশাপাশি আমার একান্ত আযীয সুন্নী ওলামা মাশায়েখগণের মুহসিন, গরীব দরদী, সমাজ সেবক, শাহ আমানত হজ্ব কাফেলার সম্মানিত পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন (হাফিজাহুল্লাহ) এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তার সার্বিক সহযোগীতার ফলে আমি এ সংকলনের প্রতি অনেকটা আগ্রহী হয়েছি।

এ সংকলনটি শেষ করার পর আমার মনে হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় কেবল নয়, উর্দু ভাষাতেও একটি গ্রন্থে এতগুলো যুগোপযোগী সমস্যার সমাধান সম্বরিত মাসআলার সমষ্টি হয়তো পাওয়া যাবেনা।

আমার ইলমী দূর্বলতা কিংবা মুদ্রণ জনিত কোনও অসঙ্গতি থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই বিবেকের আয়নায় না মেপে হৃদয়ের সুষমা দিয়ে আমাকে অবহিত করলে সাদরে গ্রহণ পূর্বক কৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের সর্বোচ্চ সুমহান দরবারে ফরিয়াদ যে, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এর ওসীলায় বাংলা ভাষাভাষি মুসলিম জনসাধারণের হিদায়তের জন্য কবুল করেন। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

সম্পাদক

অধ্যক্ষ কাযী আবুল বয়ান হাশেমী

মি'রাজুল মু'মিনীন

সূচীপত্র

- সম্পাদকের কথা: ----১
- গ্রন্থকারের কথা:---- ৫
- পেশ কালাম:----৯

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও পবিত্রতা প্রসঙ্গ

- ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ:--------- ----৯

কালেমা

- কালেমা-ই-তৈয়্যিবাহ: ----৯
- কালেমা-ই-শাহাদাত (সাক্ষ্য-বাক্য): ----১০
- কালেমা-ই-তামজীদ (মহত্ব ঘোষণা-বাক্য) ----১০
- কালেমা-ই-তাওহীদ (একত্ববাদ ঘোষণা-বাক্য) ----১১
- কালেমা-ই-রদ্দে কুফ্‌র (কুফরী খন্ডন-বাক্য) ----১১

ঈমান

- 'ঈমান' বাক্য দু'ভাগে উচ্চারণ করা যেতে পারে----১২
- ঈমানের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা----১৩
- এক নজরে ঈমান এর শাখা সমূহ ----১৫
- প্রথমতঃ অন্তরের কাজ সমূহ ----১৫
- দ্বিতীয়তঃ জবানের কাজ সমূহ ----১৭
- তৃতীয়তঃ শরীরের কাজ সমূহ ----১৭
- ধর্মীয় অনুশাসন পালনে মাযহাব (ধর্মমত) অনুশীলনের গুরুত্ব----১৯
- কুরআন-সুন্নাহ থাকতে মাযহাব কেন ঃ একটি সরল মূল্যায়ন ----৩০
- তাকলীদ করা ওয়াজিব কেন? ----৩৮
- চার মাযহাবের কারণ----৪৪
- গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী সালাফীরা এ উম্মতের মহা ফেতনা----৫০
- সিরাতে মুস্তাকীম এর অনুসারী কারা? ----৫৪
- আসলে তাকলীদ কাকে বলে? ---- ৫৫
- বালেগ হওয়ার সময় ---- ৫৬

ফরয

- ফরয এর প্রকার---- ৫৭
- এক নজরে ১৩০ ফরয----৫৭
- পবিত্রতার অধ্যায়---- ৬১

pdf By Syed Mostafa Sakib

- প্রকৃতিগত দশটি স্বভাব ---------- ৬২
- শরীর পাক করার বিবরণ ---------- ৬৭
- 'হাদস-ই-আসগর ---------- ৬৭
- অযু সম্পর্কিত একটি হাদিসের অপব্যাখ্যা খণ্ডন ---------- ৬৭
- হাদস-ই-আকবর ---------- ৬৯
- ওযু করা প্রসঙ্গে ---------- ৬৯
- যে সব কাজের জন্য ওযু করা ফরয ---------- ৭০
- যেসব কাজের জন্য ওযু করা সুন্নাত ---------- ৭০
- যে সব কাজের জন্য ওযু করা মুস্তাহাব ---------- ৭১

ওযুর আহকাম প্রসঙ্গ

- ওযুর ফরয সমূহ ---------- ৭২
- ওযুর সুন্নাত সমূহ: ---------- ৭২
- ওযুর মুস্তাহাব সমূহ ---------- ৭৩
- অযুর 'মাকরূহ সমূহ ---------- ৭৫
- অযু ভঙ্গের কারণসমূহ ---------- ৭৬
- অযু সম্পর্কিয় বিশেষ জ্ঞাতব্য: ---------- ৭৬
- অযুর নিয়ত: ---------- ৭৭
- অযু আরম্ভের দো'আ: ---------- ৭৭
- কুল্লির করার দো'আ: ---------- ৭৭
- নাকে পানি দেয়ার দো'আ: ---------- ৭৭
- মুখমণ্ডল ধোয়ার দো'আ: ---------- ৭৭
- ডানহাত ধোয়ার দো'আ: ---------- ৭৮
- বাম হাত দোয়ার দো'আ: ---------- ৭৮
- মাথা মসেহ করার দো'আ: ---------- ৭৮
- কান মসেহ করার দো'আ: ---------- ৭৮
- গর্দান মসেহ করার দো'আ: ---------- ৭৮
- ডান পা ধোয়ার দো'আ: ---------- ৭৮
- বাম পা ধোয়ার দো'আ: ---------- ৭৯
- ওযু শেষে পড়ার দো'আ: ---------- ৭৯
- বিশেষ জ্ঞাতব্য: ---------- ৭৯

গোসলের বিবরণ

- যে সব কারণে গোসল করা ফরয: ---------- ৮০
- যে সব কারণে গোসল করা ওয়াজিব: ---------- ৮০

- যে সব কারণে গোসল করা সুন্নাত : ---------- ৮০
- জ্ঞাতব্য: ---------- ৮১
- গোসলের ফরয: ---------- ৮২
- গোসলের সুন্নাত: ---------- ৮২
- গোসলের মুস্তাহাব: ---------- ৮২
- গোসলের মাকরূহ: ---------- ৮২
- গোসলের নিয়ত: ---------- ৮৩
- ফরয-গোসল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য: ---------- ৮৩
- ছেলেদের খতনা করা এবং মেয়েদের কান নাক ছিদ্র করা ঃ ---------- ৮৩
- গোসলের সময় যা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক: ---------- ৮৫
- মাইয়াতের গোসলের বয়ান: ---------- ৮৬
- নূর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্রান্ত আক্বিদা: ---------- ৮৭
- মইয়াতের চোখ বন্ধ করা সংক্রান্ত একটি হাদীসে নববী : ---------- ৯০
- কাফন পরিধানের বিবরণ: ---------- ৯১
- তায়াম্মুমের বিবরণ: ---------- ৯১
- যে সব কারণে তায়াম্মুম করা যেতে পারে: ---------- ৯১
- তায়াম্মুমের ফরয: ---------- ৯২
- তায়াম্মুমের সুন্নাত: ---------- ৯৩
- তায়াম্মুম ভঙ্গ হওয়ার কারণ: ---------- ৯৩
- তাইয়াম্মুমের নিয়ত: ---------- ৯৩
- বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়: ---------- ৯৩
- হায়য্ ও নিফাস্: ---------- ৯৪
- পবিত্রতা সম্পর্কিত কতেক মসায়েল: ---------- ৯৪
- মণী (বীর্য), ময়ী ও ওদী: ---------- ৯৫
- নাপাকী (অপবিত্রতা) দু'প্রকার: ---------- ৯৫
- উক্ত নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ: ---------- ৯৬
- নাপাকী সম্পর্কিত এক অদ্ভূত ফতোয়া: ---------- ৯৬

ইস্তিন্জার বয়ান

- মলমূত্র ত্যাগ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: ---------- ৯৭
- 'শরীর অপবিত্র' ও 'ওযুবিহীন ব্যক্তি' সম্পর্কে জ্ঞাতব্য: ---------- ৯৯
- 'হায়য' ও 'নিফাস' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য: ---------- ১০১
- মিস্ওয়াক সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য: ---------- ১০২
- মিসওয়াককরণ সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য: ---------- ১০২
- মিসওয়াকের দো'য়া: ---------- ১০৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

❦ পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:----১০৩
❦ কোন ধরনের পানি দ্বারা ওযু ও গোসল জায়েয:----১০৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
নামায প্রসঙ্গ

❦ নামায:----১০৫
❦ পাদটিকা: ----১০৬
❦ নামাযের বাহিরের ফরয সমূহ:---- ১১০
❦ বিশেষ দ্রষ্টব্য:----১১১
❦ নামাযের ফরযসমূহ (ভিতরের) সবিস্তারে বর্ণনা: ----১১১
❦ রাসূলুল্লাহ (দ.) এর দায়েমী সুন্নাত পুরুষের পাগড়ি বা শিরোভূষণ: ----১১২
❦ সাহাবায়ে কেরামের পাগড়ি: ----১১৩
❦ যেভাবে পাগড়ি পরতেন: ----১১৪
❦ পাগড়ির রং: ----১১৫
❦ নামাযের ওয়াজিবসমূহ:----১২০
❦ দোয়ায়ে তাশাহুদ সংক্রান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ:----১২২
❦ নামাযের সুন্নাত সমূহ:----১২৬
❦ নামাযের মুস্তাহাব সমূহ:----১২৮
❦ আওকাতে সালাত : একটি জরুরী জ্ঞাতব্যঃ----১২৯
❦ ফজরের নামাযের সময়:----১২৯
❦ যোহর ও জুমার নামাযের সময়:----১৩০
❦ পবিত্র রমজান মাসের "আখেরী জুমা" সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:----১৩০
❦ আসরের নামাযের সময়:----১৩৩
❦ মাগরিবের নামাযের সময়:----১৩৩
❦ এশা ও বিতিরের নামাযের ওয়াক্ত: ----১৩৪
❦ পবিত্র শবে বরাত ও শবে কুদরের নামায:----১৩৪
❦ হারামাইনের পরের দিন, ঢাকায় কেন ঈদের দিন: ----১৪২
❦ প্রয়োজনীয় মাসয়ালা:----১৪৭
❦ নামাযের নিষিদ্ধ সময়:----১৪৭
❦ নামায ভঙ্গকারী (মাকরূহ) বিষয়াদির বিবরণ:----১৪৯
❦ নামাযে একাগ্রতা, চিৎকার, কান্না প্রসঙ্গ :----১৫০
❦ নামাযে সুতরা বা আড়াল স্থাপনের গুরুত্ব: ----১৫৬
❦ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করার:----১৫৭
❦ ফরয নামাযের ইতিকথা:----১৫৭
❦ নামাযের ভিতরে বিশেষ লক্ষ্যণীয়:----১৫৯

❦ আকসামে সালাত:----১৫৯
❦ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ----১৬০
❦ নামায আদায়ের পদ্ধতি:----১৬২
❦ নামাযে "ক্বিয়াম" সম্পর্কিত বিভ্রান্তিমূলক বিশেষ ব্যাখ্যার অপনোদন:----১৬২
❦ তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা সহ নামায আদায়ের নিয়ম:----১৬৩
❦ সেজদায় পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী ও জায়নামাযে প্রতিস্থাপন:----১৬৬
❦ নামাযান্তে দোয়া মুনাজাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :----১৬৭
❦ বিতিরের নামাযের বয়ান:----১৬৯
❦ কুনুতে নাযেলার বিবরণ: ----১৬৯
❦ হারামাইন শরীফাইনে বিতির নামায সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:----১৭৫

আযান অধ্যায়

❦ মাইকযোগে আযান ও একামতের বয়ান: ----১৭৬
❦ আযানে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" শুনে আঙ্গুল চুম্বন: ----১৭৮
❦ একামতে সালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:----১৮৪
❦ দাফনের পর কবরে আযান সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :----১৮৬
❦ দাফনের পর কবরে তালকীন করার বিধান:----১৮৬
❦ মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় যে দো'আ পড়বে:----১৯০
❦ মসজিদে ঢুকার পর পড়তে হয় যে দো'আ:----১৯১
❦ মসজিদ হতে বের হবার সময় পড়বে:----১৯১

❦ ফরয নামাযের সালাম ফিরায়ে উচ্চস্বরে নিম্নলিখিত দো'আ পড়বে:----১৯১
❦ ঘর হতে বাহিরে যাওয়ার সময় বিনা অযু যাবে না এবং
ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দো'আ পড়বেঃ ----১৯২
❦ ঘরে ঢুকার সময় পড়বে:----১৯২
❦ যে সকল কারণে নামায ফাসেদ 'নষ্ট' হয়: ----১৯২
❦ ইসবাল বা টাখনুর নীচে কাপড় পরার বিষয়ে শরয়ী বিধান ঃ----১৯৫
❦ যে সব ওজরে নামাযরত ব্যক্তি নামায ভঙ্গ করা জায়েয:----১৯৬
❦ ইমামতের বয়ান:----১৯৭
❦ জমা'আত এর বয়ান:----১৯৮
❦ নামাযে মুকাববির নিযুক্তির বিধান: ----২০১
❦ মুক্তাদী ক্বিরাত পাঠ সংক্রান্ত মওদূদী মতবাদ ও কতিপয় জরুরী মাসায়েল:----২০৩
❦ মুসাফিরের নামাযের বয়ান:----২০৫
❦ ওয়াত্ন' অর্থাৎ বাসস্থান দুই প্রকার:----২০৬
❦ মুসাফিরের সুন্নাত নামাযের বিধান:----২০৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

- মুসাফিরের নামায সম্পর্কে মওদুদী মতবাদঃ---------------------------------------২০৮
- নৌকা ও রেলগাড়ীতে নামাযঃ---------------------------------------২০৯
- কাযা নামাযের ব্যাপারে সতর্কতাঃ---------------------------------------২১০
- রুগ্ন ব্যক্তির নামায প্রসঙ্গেঃ---------------------------------------২১০
- রুগ্ন ব্যক্তির নামায পড়ার নিয়মঃ---------------------------------------২১১
- শুয়ে নামায পড়ার দুইটি নিয়ম :---------------------------------------২১১

জুমআর বয়ান

- জুমআর দিনের ফযীলত ঃ---------------------------------------২১২
- জুমআর দিনের ফযীলত সমূহ ঃ---------------------------------------২১৩
- জুমআর দিনের বিধান সমূহ ঃ---------------------------------------২১৬
- জুমআর আদব সমূহ ঃ---------------------------------------২১৯
- খতীবগণের প্রতি ঃ---------------------------------------২২১
- জুমার নামাযের বিবরণঃ---------------------------------------২২২
- জুমার নামায ফরয হওয়ার শর্ত সমূহঃ---------------------------------------২২৩
- জুমার নামায সংক্রান্ত জ্ঞাতব্যঃ---------------------------------------২২৪
- জুমআর ছানী আযান কোথায় দিবে? ---------------------------------------২২৭
- লা-মাযহাবীদের দলীল খণ্ডণঃ ---------------------------------------২৩১
- বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ---------------------------------------২৩২
- জুমআ ও ঈদের খুতবা আরবীতেই দিতে হবেঃ ---------------------------------------২৩৩

মসজিদের বিবরণ

- মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা ঃ---------------------------------------২৩৭
- মসজিদ আবাদ করার ফজিলতঃ---------------------------------------২৩৮
- মসজিদের জন্য অমুসলিমের দানের বিধানঃ---------------------------------------২৩৯
- মসজিদ সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় বিধানাবলীঃ---------------------------------------২৪০
- মসজিদ স্থানান্তর সম্পর্কে জরুরী মাসআলাঃ ---------------------------------------২৪৫
- ই'তিকাফের বিবরণঃ---------------------------------------২৪৬
- মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধানঃ---------------------------------------২৪৯
- দুই ঈদের নামাযের বয়ানঃ---------------------------------------২৪৯
- যেভাবে সালাতে ঈদ আদায় করতে হয়ঃ---------------------------------------২৫০
- আইয়্যামে তাশরীকঃ---------------------------------------২৫২
- তকবীরে তশরীকঃ---------------------------------------২৫৩
- তারাবীহ্ নামাযের বয়ানঃ---------------------------------------২৫৩
- কিয়ামুল লাইল নামক বিদআতঃ---------------------------------------২৫৯

- সেজদায়ে তেলাওয়াতের বয়ানঃ---------------------------------------২৬০
- হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আয়াতে সিজদা সমূহঃ ---------------------------------------২৬১
- একটি গোমরাহী ফতোয়ার অপনোদন ও আয়াতে সেজদা সংক্রান্ত আলোচনাঃ---------------------------------------২৬৩
- সেজদায়ে শোকরের বয়ানঃ---------------------------------------২৬৭
- কাযা নামাযের বিবরণঃ---------------------------------------২৬৭
- কাযা নামাযের তারতীব সংক্রান্ত জ্ঞাতব্যঃ---------------------------------------২৭১
- ওমরী কাযা নামাযের বিবরণ ঃ---------------------------------------২৭২
- ওমরী কাযার নিয়তঃ---------------------------------------২৭৪
- মসজিদ সংক্রান্ত কিছু মাসায়েলঃ---------------------------------------২৭৫
- সালাতে জানাযার নিয়ম---------------------------------------২৭৭
- যাদের জানাযা পড়া যাবে নাঃ---------------------------------------২৮০
- বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ---------------------------------------২৮০
- একই ব্যক্তির একাধিক জানাযা পড়ার বিধানঃ---------------------------------------২৮১
- বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ---------------------------------------১৮২
- কবর স্থানান্তরিত করার বিধানঃ---------------------------------------২৮৩
- পুরাতন কবরের মধ্যে পুণরায় কবরস্থ করার বিধানঃ---------------------------------------২৮৪
- সালাতে জানাযা সম্পর্কিত বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ---------------------------------------২৮৫
- সালাতে জানাযা সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন ঃ---------------------------------------২৮৭
- সালাতে জানাযা সম্পর্কে ফোকাহাদের অভিমতঃ---------------------------------------২৯০
- সালাতে জানাযা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ---------------------------------------৩০৩
- গায়েবানা জানাযাঃ শরয়ী বিধানঃ---------------------------------------৩০৪
- জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ---------------------------------------৩০৬
- বাদাশা নাজ্জাশীর জানাযাঃ---------------------------------------৩০৯
- মুয়াবিয়া ইবনু মুয়াবিয়ার জানাযাঃ---------------------------------------৩১১
- মসজিদে জানাযার নামায পড়ার বিধান ঃ---------------------------------------৩২০
- জানাযা নিয়ে চল্লিশ কদম চলার বয়ানঃ---------------------------------------৩২২
- মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা সম্পর্কেঃ---------------------------------------৩২৫
- কবর তালক্বীন প্রসঙ্গেঃ---------------------------------------৩২৬
- কবর যেয়ারতের নিয়মঃ---------------------------------------৩১১
- মহিলাদের কবর যিয়ারতের বিধানঃ---------------------------------------৩৩৩
- পাদটীকাঃ---------------------------------------৩৩৫
- নামায রোজার কাফফারার বয়ানঃ---------------------------------------৩৩৫
- কাফ্ফারা আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ---------------------------------------৩৩৭
- কাফ্ফারা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ঃ---------------------------------------৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ফাতেহা খানী ও ঈসালে সওয়াব: ---- ৩৩৮
- আউলিয়ায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস: ---- ৩৩৯
- পুণশ্চ: ---- ৩৪৩
- তাহাজ্জুদের নামায: ---- ৩৪৪
- সালাতুত্ তাসবীহ: ---- ৩৪৫
- সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়ার নিয়ম: ---- ৩৪৫
- এস্তেখারার নামায: ---- ৩৪৬
- এস্তেখারার দোয়া: ---- ৩৪৬
- সেজদায়ে সাহ্ আদায়ের নিয়ম: ---- ৩৪৭
- জ্ঞাতব্য: ---- ৩৪৭
- নামাযের দো'আ ও নিয়ত সমূহ ঃ ---- ৩৫০
- ফযরের দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নিয়ত: ---- ৩৫০
- দো'আয়ে সানা নিম্নরূপ: ---- ৩৫০
- ফজরের দু'রাকাত ফরযের নিয়ত: ---- ৩৫১
- যোহরের বার রাকাত নামাযে প্রথম চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নিয়ত: ---- ৩৫১
- যোহরের চারি রাকাত ফরযের নিয়ত: ---- ৩৫১
- অতঃপর যোহরের দু'রাকাত সুন্নাতের (মুয়াক্কাদা) নিয়ত: ---- ৩৫১
- যোহর, মাগবির ও এশার দু দুই রাকাত সালাতে নফলের নিয়ত: ---- ৩৫১
- আসরের চার রাকাত (ফরযের পূর্বে) সুন্নাতের (জায়েদা) নিয়ত: ---- ৩৫২
- আসরের চার রাকাত ফরযের নিয়ত: ---- ৩৫২
- মাগরিবের তিন রাকাত ফরযের নিয়ত: ---- ৩৫২
- মাগরিবের ফরয আদায়ের পর দু'রাকাত সুন্নাতের (মুয়াক্কাদা) নিয়ত: ---- ৩৫৩
- এশার (চার রাকাত ফরযের পূর্বে) চার রাকাত সুন্নাতের নিয়ত: ---- ৩৫৩
- এশার চার রাকাত ফরযের নিয়ত: ---- ৩৫৩
- তিন রাকাত বিতিরের (ওয়াজিব নামাযের) নিয়ত: ---- ৩৫৩
- শাফেয়াল বিতর এর নিয়ত: ---- ৩৫৩

জুমার নামাযের নিয়তসমূহ

- প্রথমতঃ দু'রাকাত তাহ্ইয়াতুল অযুর নিয়ত: ---- ৩৫৪
- তাহ্ইয়াতুল মসজিদের নিয়ত: ---- ৩৫৪
- চার রাকাত কাব্‌লাল জুমার (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) নিয়ত: ---- ৩৫৪
- জুমার দু'রাকাত ফরযের নিয়ত: ---- ৩৫৫
- চার রাকাত বাদাল জুমার (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) নিয়ত: ---- ৩৫৫
- দু'রাকাত 'সুন্নাতুল ওয়াক্তে'র নিয়ত: ---- ৩৫৫
- নামাযে তারাবীর নিয়ত: ---- ৩৫৫

- দুই ঈদের নামাযের নিয়ত: ---- ৩৫৫
- তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত: ---- ৩৫৬
- সালাতু-ত-তাসবীহের নিয়ত: ---- ৩৫৬
- বিশেষ জ্ঞাতব্য: ---- ৩৫৭
- নিয়তের পর যেভাবে নামায আদায় করতে হয়: ---- ৩৫৮
- তাআউয ---- ৩৫৮
- তাসমিয়াহ্: ---- ৩৫৯
- ফাতেহা: ---- ৩৫৯
- যাম্মে সূরা: ---- ৩৫৯
- একটি জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ: ---- ৩৫৯
- তাসমীয়া: ---- ৩৬০
- তাহ্মীদ: ---- ৩৬১
- তাসবীহ: ---- ৩৬১
- তাশাহুদ: ---- ৩৬১
- দুরূদে ইব্‌রাহীমি: ---- ৩৬২
- দোয়ায়ে মাসুরা: ---- ৩৬২
- তাসলীম বা সালাম: ---- ৩৬২

বিশেষ নামাযের বিশেষভাবে পড়তে হয় দো'আ সমূহ ও পদ্ধতি

- দো'আয়ে কুনুত: ---- ৩৬৩
- তারাবীর নামাযের প্রতি দু'রাকাত শেষ করে দাঁড়ানোর সময় পড়বে: ---- ৩৬৩
- তারাবীর নামাযে প্রত্যেক চার রাকাতের পর মুনাজাতের পূবের দো'আ: ---- ৩৬৪
- যাদের উপরোক্ত দো'আ মুখস্ত না থাকে তারা: ---- ৩৬৫
- আশুরার দিন পড়ার দো'আ: ---- ৩৬৫
- বৎসরের প্রথম দিনে পড়ার দো'আ: ---- ৩৬৬
- বৎসরের শেষ দিনে পড়ার দো'আ: ---- ৩৬৬
- শবে বরাতের রাত্রিতে পড়ার দো'আ: ---- ৩৬৭
- খতমে কুরআনের দোয়া ঃ ---- ৩৬৯

তৃতীয় অধ্যায়
বিবাহ প্রসঙ্গ

- ইসলামী শরীয়তে বিবাহের গুরুত্ব ঃ ---- ৩৭৫
- বিবাহের তাৎপর্য ঃ ---- ৩৭৬
- বিবাহের খোতবা ঃ ---- ৩৭৭
- বিবাহে অভিভাবকের গুরুত্ব ঃ ---- ৩৭৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

- বিবাহ পূর্ব করণীয় ঃ----৩৭৮
- ইস্তিখারা করা :----৩৭৮
- পরামর্শ করা:----৩৭৯
- পাত্রী নির্বাচন:----৩৮০
- বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ:----৩৮১
- পাত্রী দেখা:----৩৮১
- ছবি বা ফটো বিনিময়:----৩৮২
- টেলিফোন/ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের বিধান :----৩৮২
- বিবাহ পূর্ব নির্জনে অবস্থান বা বাইরে বের হওয়া :----৩৮৪
- একজনের প্রস্তাবের উপর অন্যজনের প্রস্তাব দেয়া নিষিদ্ধ:----৩৮৫
- এ্যাংগেজমেন্ট করা :----৩৮৪
- উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা:----৩৮৫
- কুফু বা সমতার বিধান:----৩৮৫
- মহর এর গুরুত্ব:----৩৮৭
- দেন মহর কিভাবে পরিশোধ করবে:----৩৮৭
- মহর সম্পর্কে ইসলামের বিধান:----৩৮৮
- মহরের পরিমাণ:----৩৮৮
- যৌতুকের বিধান:----৩৯০
- দাবি করাটাই যৌতুক:----৩৯১
- বর্তমান যৌতুকের অবস্থা:----৩৯১
- ওলীমা বা বৌভাত:---- ৩৯২
- গ্রন্থকার পরিচিতি:----৩৯৫

সম্পাদকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি স্বীয় বান্দা মু'মিন মুসলমানদের দান করেছেন মহামূল্যবান ঈমান। অতঃপর তাঁরই হাদিয়া হিসাবে সবচেয়ে পছন্দনীয় ও সর্বোত্তম ইবাদত "সালাত" তথা "নামায" দান করে উভয় জগতে সর্বকালের সমগ্র জাতির উপর অনন্য মর্যাদা দিয়ে মু'মিন ও কাফির এর মধ্যে পার্থক্যের এক মজবুত প্রাচীর স্থাপন করেছেন। আর উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী রসূল শ্রেষ্ঠ আল্লাহর হাবিব সাইয়্যেদুনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আওলাদ আসহাবগণের উপর যাঁর বদৌলতে নামায নামক মহান নেয়ামত পেয়ে আমরা "মি'রাজুল মুমিনীন" খ্যাত নামায নামক অমূল্য নেয়ামতের গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের যত প্রকারের ইবাদত বন্দেগী রয়েছে তম্মধ্যে সালাত বা নামায হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ট ইবাদত। রোজ কেয়ামতে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে আমাদের নামাযের। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَاتُهُ صَلَحَ عَمَلُهُ، وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَمْ يَصْلُحْ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ»

অর্থাৎ "কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস (হিসাব) করা হবে। তার নামাযের যদি যথাযথ হিসাব দিতে পারে তাহলে তার অন্যান্য আমল দেখা হবে। আর যদি তার নামাযের হিসাবে ভেজাল বা গণ্ডগোল থাকে তাহলে তার অন্যান্য কোন আমল কাজে আসবেনা।[১]

উল্লেখ্য যে, নামাযকে আল্লাহর যিকর বা স্মরণের জন্য ঘোষণা করা হলেও নামাযের মধ্যে সরদারে দু'জাহান আ'কা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম ও দরূদ পেশ করার নির্দেশ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন একথাই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর হাবীবের স্মরন ও যিকর ছাড়া আমাদের কোন ইবাদত তাঁর

[১]. হিলয়াতুল আউলিয়া-৩/৬৭, আল-মু'জামুল আওসাত-৩৭৮২, আত-তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ'মাল-৪৪, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৭৭৭২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরবারে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক করে দিয়েছেন। ফলে হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম কোন বিষয়ে 'হ্যাঁ' বললে হালাল আর 'না' বললে হারাম হয়ে যায়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যেয়ারতের

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অর্থাৎ "যারা উম্মী নবীর অনুসরণ করে যাঁর আলোচনা তারা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পেয়েছে, তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন, আর তাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিষগুলো হালাল করেন এবং নাপাক ও অপবিত্র জিনিষগুলো হারাম করেন"।[১]

উল্লেখিত আয়াতে করীমায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামকে হালাল ও হারামকারী হিসেবে 'মুখতারে কুল' বা সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে নামাযের বাস্তব রূপ তথা ক্বিয়াম, কুউদ, রুকু, সিজদা ইত্যাদির তিনিই হচ্ছেন একক প্রণেতা ও অনন্য নমূনা। নয়তো পবিত্র কুরআন করীমে এমন কোন আয়াতে করীমা আছে কি যাতে 'তরীক্বায়ে সালাত' তথা নামায আদায়ের পদ্ধতি রুকু, সিজদা, কিয়াম, কুউদ ইত্যাদির নিয়ম পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে? সালাতের মধ্যকার আদায়িয়া, সাতবীহাতের কোন বর্ণনা কি কুরাআনের কোন আয়াতে বিবৃত আছে?

মুহসিনে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক আমল প্রতক্ষ্য করে বা তাঁর পবিত্র বাণী শুনে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর সেই বাণী, কাজ ও স্বীকৃতিকে একত্র করেছেন আর ফুক্বহায়ে ইযাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) সেগুলো নিয়ে কঠোর সাধনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে যাবতীয়

[১]. সূরা আল-আরাফ-১৫৭।

বিধানাবলীকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব হিসেবে স্তর বিন্যাস করেছেন।

কথিত আহলে হাদীস নামক লা মাযহাবী ভাইদের কাছে কি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের বিষয়ে কোন দলীল আছে? মূলত, তারা আকাবেরে উম্মত ফুকহায়ে কেরামকে (রাহিমাহুমুল্লাহ) অস্বীকার করে আমাদের এই দ্বীনকে পশ্চিমা নগ্ন সভ্যতার আদলে গড়তে চায়। তাদের এই অনুধাবনের শক্তি নাই যে, আমাদের এই দ্বীনের মূল শিখড় কোথায় গিয়ে প্রোথিত। আল্লামা ইকবাল (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাষায় বলতে হয়

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں
اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুকরিয়া জানাচ্ছি পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদে মুকাররাম ওস্তাজুল ওলামা, ইমামে আহলে সুন্নাত পীরে তরীক্বত শায়খুল হাদীস ওয়াল ফিকহ্ আল্লামা হাশেমী সাহেব মুদ্দা জিল্লুহুল আলী কেবলার খেদমতে, যিনি "মি'রাজুল মুমিনীন" নামক পুস্তকখানি লিখে ইবাদত বিমুখ মুসলিম জাতিকে ইবাদত মুখী হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের অজানা থাকার কথা নয় যে, ইতিপূর্বে নামায এবং অন্যান্য ইবাদত বিষয়ে অনেক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় মাসয়ালা ও দো'আ ইত্যাদি বাদ পড়ায় জনসাধারণ সার্বিকভাবে উপকৃত হতে পারছেন না। আল্লাহর রহমতে এ পুস্তক খানায় মাননীয় লেখক নামায সম্পর্কীয় অনেক বাদপড়া ও অজানা মাসয়ালা লিখে মুমিন জাতিকে অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দিয়েছেন।

মূলতঃ নামায-ই হচ্ছে বান্দার জন্য আল্লাহ ও তার হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এর প্রীতির উৎকৃষ্ট নমূনা। আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযান হচ্ছে তারানা বা সঙ্গীতের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার হাবীব প্রীতির প্রতি আহবান, সর্বোপরি নামায-ই হল আল্লাহ দর্শনের অনন্য মাধ্যম।

কবির ভাষায় বলি-

ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری — کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

ازاں ازل سے ترے عشق کا ترانہ بنی — نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ بنی

পাঠক সমাজ গ্রন্থখানা পড়ে বিমুগ্ধ হবেন এবং নামাযের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় ভাজনে সক্ষম হবেন বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। কেননা ইসলাম ধর্মের সর্ব প্রাথমিক এবং মৌলিক বিষয়াদি হতে আরম্ভ করে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত একজন সত্যিকার মুসলমানের জীবনে যা প্রয়োজন সব কিছু উচ্চারণসহ পরিপূর্ণরূপে লিখক মহোদয় এই বইতে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাই প্রত্যেক মুমিনেরই চাই তিনি সুফী হউন বা প্রচারক, ব্যবসায়ী অথবা চাষী-মজদুর কিংবা মালিক, পুরুষ হউন অথবা নারী, ছেলে হউন কিংবা যুবক বা বৃদ্ধ, রাষ্ট্র প্রধান হউন কিংবা মন্ত্রী, শসস্ত্র সৈনিক হউন কিংবা পুলিশ প্রত্যেকেরই প্রয়োজন।

সুপ্রিয় পাঠক এই বইতে বাতিল ও বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর বিভ্রান্তিকর বিষয়াবলীর যৌক্তিক ও প্রমাণসহ খণ্ডন করা হয়েছে। যা যে কোন মুসলমানের জন্য আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে নিত্যসঙ্গী হবে বলে মনে করি।

ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দিতে কতটুকু সফলকাম হয়েছি, সে ফয়সালা পাঠক মহোদয়গণই করবেন। তবে দো'আ করবেন যেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আমাদের সকলকে এই বইয়ে লিখিত সকল বিষয়ে আমল করার তৌফিক দান করুন-আমীন! বিহুরমতে সাইয়্যাদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম।

বিনয়াবনত

সম্পাদক

কাযী আবুল বয়ান হাশেমী

গ্রন্থকারের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلِيِّ التَّوْفِيْقِ وَ مُهْدِيْ مَنِ اسْتَهْدَاهُ لِأَقْوَمِ الطَّرِيْقِ. وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِيْنَ وَ إِمَامِ الْهَادِيْنَ. وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْنَ وَ آلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. وَ بَعْدُ

চিন্তাশীল পাঠক অবশ্যই অবগত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিন বান্দাদের চিত্ত জগতের পরিশুদ্ধি আর প্রগতি তরক্কী-উন্নয়ন সাধনে অনুকম্পা হিসাবে 'সালাত' বা নামায দান করেছেন। ঈমানের পর সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট এবাদত হল নামায। আল্লাহ পাক নামাযের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ বা মাবূদ নাই, অতএব, আমারই এবাদত কর আর আমার স্মরণে নামায কায়েম কর"।[৩]

উল্লেখিত আয়াতে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ট এবাদত নামাযকে শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে বলা হলেও নামাযের মধ্যে হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাত-সালাম ও দরূদ আবশ্যক করে দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন একথাই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর হাবীবের স্মরণ বা দরূদ ছাড়া কোন এবাদতই তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের যাবতীয় আমল ইবাদতের পূর্বশর্তই হল রেযায়ে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর ইচ্ছা, কামনা ও চাহিদা মুতাবেকই আল্লাহ পাক আমাদের উপর বিভিন্ন ইবাদত ফরয করেছেন। যেমন তিনি নামায পড়তে ভালবাসতেন বলেই আল্লাহ পাক আমাদের উপর নামায ফরয করেছেন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই মসজিদে আকসার পরিবর্তে মসজিদে হারামকে কেবলা করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, রেযায়ে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ইবাদতের উপর অগ্রগণ্য।

নামায সহ আমাদের যাবতীয় ইবাদত বন্দেগী মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মকবুল তথা গ্রহনযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহর

---

[৩]. সূরা ত্বাহা-১৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাবীবের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ তথা হুযুরে কুলব ও খুশু খুযুর সাথে নিজেকে পেশ করা। নচেৎ আমাদের সব আমলই বৃথা।

কবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেন,

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب

অর্থাৎ- রাসূলপ্রেম যদি আমাদের নামাযের মূল না হয়, তাহলে আমার কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহ যাবতীয় আমলই বৃথা।

বাস্তব ঈমান গ্রহণের পর সর্ব প্রথম নামাযকেই ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন স্বয়ং হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যদি আপনি সামর্থবান হওয়ার পরে নামাযের মাধ্যমে সৎ ও পংকিলতা মুক্ত জীবন গঠন করতে না পারেন, আপনার চরিত্রে যদি পশুত্ব বিরাজমান থাকে. তাহলে জীবনটাই বৃথা। আর আপনি যদি আত্মিক জগতে খোদায়ী ফজিলতের শ্রেষ্ঠত্বে সমাসিন হতে চান, স্রষ্টার শক্তি-নূরে আপনার যাহের, বাতেন, দুনিয়া আখেরাতে সৌন্দর্য্যতা দিতে চান, আপনি যদি 'মুফলিহ' 'মুহসিন' 'লা ইয়াহজানুন' চরিত্রের অধিকারী হতে চান তাহলে যা আপনাকে রাহবুরি করে স্ব স্থানে পৌঁছাবে তা হলো 'নামায'।

জনকল্যাণের গরজে অত্র বইয়ে ঈমান বিষয়ের সবিস্তারে আলোচনা সহ 'তিহারত' তথা পাক-পবিত্রতা ও 'নামায' সংক্রান্ত প্রায় সকল মাসয়ালা যা পাঠক বিশ্ব মুসলিম মানবতার জীবন কাঠি, সার্বজনীন মুক্তির দিশারী মু'মেনিনদের ইহ-পরকালীন উন্নয়নে ও খোদা প্রাপ্তির অন্যতম সোপান হিসাবে 'মি'রাজুল মু'মিনীন' বইটি প্রাতঃ সূর্যের মত উদিত হবে বলে মনে করি।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপলব্ধি করছি যে, নানা ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারণে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলার জনসংখ্যার ৯৫% ভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও সৎ নাগরিক হওয়ার কারণে ইসলাম ধর্ম ও উহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যকরূপে ওয়াকেফহাল হতে এবং ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক নিজকে পরিচালিত, নিজের জীবন পদ্ধতিকে সাজাতে অত্যন্ত উৎসুক উদগ্রীব বটে. কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, দু'টি কারণে বৃহৎ জনগুষ্ঠির ঐ উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণার পথে বাঁধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে আসছে।

প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম গ্রন্থ এবং দ্বীনিয়াত সংক্রান্ত যাবতীয় কিতাবাদী আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষীরা তা থেকে গ্রহণ করতে কিংবা শিখতে পারছেন না।

দ্বিতীয়তঃ দ্বীনিয়াত সংক্রান্ত বিষয়াদির মধ্যে ভ্রান্ত মতাবলম্বী তথা নবী-রাসূল বিদ্বেষী ও আরবী ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী নয় যেমন মওদুদী, ওহাবী, তাবলীগী, শিয়া, লা-মাযহাবী কথিত আহলে হাদীস ইত্যাদি বাতিল ফেরকার ভণ্ড মৌংদের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে ইসলামী শরীয়ার মধ্যে নিজের মনোবৃত্তির স্থান ও অসৎ পথে পরিচালিত ভণ্ড মোল্লাদের কর্ম তৎপরতাকে ইসলামী করণের ফলে সর্ব সাধারণ বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা মূল ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব- তামাদ্দুন হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এ পুস্তকে মাযহাবের গুরুত্ব, তাকলীদের অপরিহার্যতা ও চার বরহক মাযহাবের শ্রেষ্টতম হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ঈমান, তাহারত ও নামায সংক্রান্ত প্রায় সকল সমস্যার সমাধান প্রয়োজনীয় রেফারেন্স ও দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে ভ্রান্ত মতাবলম্বি যথা কথিত আহলে হাদীস নামক লা-মাযহাবী, কওমী, ওহাবী ও মওদুদী ইত্যাদি কর্তৃক ইসলামী শরীয়া আইনের মধ্যে বিকৃত অনেকগুলো বিষয় হতে দু-চারটি রেফারেন্স ও তুলনামূলক আলোচনা এবং নামাযের বিভিন্ন আহকামের হাকীকত আলোচনা করা হয়েছে।

পাশাপাশি নব্য ধর্ম সন্ত্রাসী কথিত আহলে হাদীস, গাইরে মুকাল্লেদ, লা মাযহাবীদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। নজদী ওহাবী মওদূদীদের পদলেহনকারী এসব ভণ্ডরা আহলে হাদীস ও সালাফী নামের অন্তরালে উম্মতে মুসলিমার চিকিৎসক ফুকাহায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ অপকর্মের জবাবে বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাদ্দিস হযরত সুলাইমান আল-আ'মাশ (রাহিমাহুল্লাহ) এর চির স্মরণীয় উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য।

ইমামে আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-আ'মাশকে দেখতে যান তখন ইমামে আযম দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী দু'পুত্রের জন্য সম্পদের অসিয়ত করছেন। ইমামে আযম (র.) তা দেখে বলে উঠলেন, আরে আপনি এটা কি করছেন? এটা তো নাজায়েয কাজ। শুনে মুহাদ্দিস সাহেব জিজ্ঞেস

pdf By Syed Mostafa Sakib

করলেন, নাজায়েয কেন? উত্তরে ইমামে আযম (র.) বললেন, আপনারাই তো হাদীস বর্ণনা করেছেন, «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» অর্থাৎ "ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত নেই"। শুনে হযরত সুলাইমান আল-আ'মাশ (রহ.) বলে উঠলেন,

يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ

অর্থাৎ "হে ফুক্বাহায়ে কেরাম! আপনারা হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহর চিকিৎসক আর আমরা মুহাদ্দিসগণ হচ্ছি ফার্মাসিষ্ট"।[৪]

অতএব, মুহাদ্দিসীনে কেরামের ডিউটি হচ্ছে মানবীয় রোগের ঔষধ হিসেবে হাদীস একত্র করা আর ফুক্বাহায়ে এযামের কাজ হচ্ছে স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী রোগের পর্যায় ও প্রয়োজন অনুপাতে সেই ঔষধ তথা হাদীস প্রয়োগ করা। কথিত আহলে হাদীস নামক নব্য জাহেলদের ফুক্বাহায়ে কেরামকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে ডাক্তার বা চিকিৎসক বাদ দিয়ে শুধু ফার্মেসী দ্বারা রোগের চিকিৎসা করা। যা সামান্য বিবেকবোধ সম্পন্ন কোন মানুষও সমর্থন করতে পারেনা।

মহান মুনিবের সুমহান দরবারে আশা করছি যে, তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় ইসলাম পরিচিতি বুনিয়াদি বিষয়াদি সম্বলিত অত্র "মি'রাজুল মু'মিনীন" গ্রন্থখানা একান্ত তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কবুল করেন। তাঁরই একান্ত দয়া ও তাওফীক যদি শামেলে হাল হয়, পরবর্তীতে রোযা, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি বিষয়াদির উপর এরকম বই প্রণয়নের প্রয়াস চালাব ইন-শা আল্লাহ।

পাঠক যদি এই গ্রন্থখানা সাদরে গ্রহণ ও লিখিত নির্দেশিত পথে নিজেকে গঠন করতে পারেন তবে নিজকে স্বার্থক ও ধন্য মনে করব। আল্লাহ্ হাফেজ।

বিঃ দ্রঃ বক্তব্যে অসংগতি, ভিত্তিহীন, ধর্মমত পরিপন্থি এবং মুদ্রণ প্রমাদ লিখিতভাবে জানালে প্রীত হব। ধন্যবাদ।

দোয়াজো
কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

---

৪. তাফসীরে রূহুল বয়ান-৭/৪০৭, বাদায়েউস সানায়ে'-৭/৩৩৭, আল-ফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ লিল-খতীবিল বুগদাদী-২/১৬৩, মুসনাদে আবী হানীফা-১/২২।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পেশ কালাম:

যাবতীয় প্রশংসা রাব্বুল ইয্যাত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্যে, তিনি অফুরন্ত রহমত ও কৃপা বিতরণে আপন হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মতদেরকে নিজ নৈকট্য লাভের সোপান স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায দান করেছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম রাহমাতুল লিল আলামীন, শাফীউল মুযনিবীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর নূরানী দরবারে, যিনি ক্বিয়ামতের ময়দানে শাফায়াত বা সুপারিশের জন্য নামাযকে স্বীয় উম্মতের পরিচয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আর নামাযকে অন্তরের শান্তি ও চোখের জ্যোতিঃ রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরই আওলাদ, আসহাব, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, আউলিয়ায়ে কেরাম ও ওলামায়ে এজাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)-এর পবিত্র দরবারে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবিরাম রহমত বর্ষিত হোক, যাঁরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে নামাযের সঠিক পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

[প্রথম অধ্যায়]
ঈমান ও পবিত্রতা

ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ:

কালেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব-এ পাঁচটি ভিত্তির উপরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

«كَلِمَةٌ» কালেমা

কালেমা না জেনে ও তা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ও স্বীকার না করে কেউ মুসলমান বা ঈমানদার হতে পারেনা। নিম্নোক্ত কালেমাগুলো মুখে উচ্চারণ করে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বপ্রথম ফরয।

এক ॥ «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» কালেমা-ই-তৈয়্যিবাহ ঃ

'কালেমা' মানে 'বাক্য' আর 'তৈয়্যাবাহ্' মানে পবিত্র। মানুষ এ কালেমা মুখে পাঠ করে তা অন্তরে বিশ্বাস করার মাধ্যমে বে-দ্বীনি বা কুফরীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপবিত্রতাকে দূরীভূত করে পবিত্রতা অর্জন করে বলেই একে কালেমা-ই-তৈয়্যেবাহ্ বলা হয়।

«كَلِمَةُ طَيِّبَةٌ» কালেমা-ই-তৈয়্যিবাহ নিম্নরূপ ঃ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর (প্রেরিত নবী) রাসূল।

দুই ॥ «كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ» কালেমা-ই-শাহাদাত (সাক্ষ্য-বাক্য)

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শরীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত রসূল"।

তিন ॥ «كَلِمَةُ التَّمْجِيْدِ» কালেমা-ই-তামজীদ (মহত্ব ঘোষণা-বাক্য)

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লা-হি ওয়াল-হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত পাপমুক্ত হবার এবং সৎ কার্য্যাদি করার ক্ষমতা কারো নেই।

চার ॥ «كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ» কালেমা-ই-তাওহীদ (একত্ববাদ ঘোষণা-বাক্য)

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ذُوْ الْجَلاَلِ وَ الاِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহ্দাহু লা-শরীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইয়ূহ্য়ী ওয়া ইয়ূমীতু, ওয়াহুয়া হাইয়ূন লা-ইয়ামুতু আবাদান্ আবাদা, যুল-জ্বালালি ওয়াল-ইকরামি বিয়াদিহিল খায়রু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন্ ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনিই বিশ্ব জগতের অধিশ্বর। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে। জন্ম-মৃত্যু তাঁরই হাতে। তিনিই অমর, অনন্তও চিরঞ্জীব। তিনি মহান, পরম সম্মানের ও মর্যাদার অধিকারী। সব মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি সব কিছু করতে পারেন।

পাঁচ ॥ «كَلِمَةُ رَدِّ الْكُفْرِ» কালেমা-ই-রদ্দে কুফ্র (কুফরী খন্ডন-বাক্য)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ اَنْ اَعْلَمَ بِهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ وَ الْمَعَاصِيْ كُلِّهَا وَ اَسْلَمْتُ وَ آمَنْتُ وَ اَقُوْلُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা, মিন্ আন্ উশরিকা বিকা শাইআন, ওয়া আনা আ'লামু বিহী, ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লিমা লা-আ'লামু বিহী, তুবতু আনহু ওয়া তাবাররা'তু মিনাল কুফ্রি ওয়াশ্ শির্কি ওয়াল মা'আসী কুল্লিহা, ওয়া আস্লামতু ওয়া আ-মান্তু ওয়া আক্লু লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ [৭]।

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যে, আমি যেন স্বজ্ঞানে কাউকে আপনার সাথে শরীক না করি। অজানা বশতঃ যে পাপ করেছি তজ্জন্য

[৭]. আল-আদাবুল মুফরাদ লিল-বুখারী-৭১৬, মুসনাদে আবি ইয়া'লা-৫৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তা থেকে তওবা করছি। কুফ্‌র, শির্‌ক এবং সমস্ত পাপকাজে অসন্তোষ প্রকাশ করছি। আমি দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং ঈমান এনেছি। আর স্বীকারোক্তি দিচ্ছি এ মর্মে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।

الإِيمَانُ ঈমান

'ঈমান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথা তার বিশ্বস্থতার নিরীখে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। এ জন্যই অনুভূতি গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুকে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। বলা যেতে পারে যে, যেমন কেউ কোন বস্তুকে কালো বা সাদা বলল। অপরজন তা সত্য বলে গ্রহণ করলে তাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা এতে বক্তার প্রভাব বা দখল নেই, পক্ষান্তরে কোন সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিবৃত বলেই কেবল মাত্র তাকে শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। ঈমানের আধার হলো অন্তর, তাই বলেই অভিধান মতে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনই ঈমান। তাই অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছালে গ্রহণযোগ্য হয় না।

আক্ষরিক দিক থেকে ঈমান হলো আন্তরীক বিশ্বাস, বা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস। তাই গ্রহণযোগ্যতার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হচ্ছে উপরোক্ত ও নিম্নোক্ত কালেমাগুলো মুখে উচ্চারণ করা এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম-'ঈমান'। যার 'ঈমান' আছে তাকে 'মু'মিন (বিশ্বাসী) নামে আখ্যায়িত করা হয়। অন্ততঃ 'কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ্' না জানলে এবং তাতে দৃঢ়ভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউ মু'মিন হতে পারে না।

'ঈমান' বাক্য দু'ভাগে উচ্চারণ করা যেতে পারে:

এক ॥ «الإِيمَانُ الْمُجْمَلُ» ঈমানে মুজমাল (সংক্ষেপে ঈমান-বাক্য উচ্চারণ করে বিশ্বাস স্থাপন করা)ঃ তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَ أَرْكَانِهِ-

উচ্চারণ ঃ আ-মান্‌তু বিল্লাহি কামা হুয়া বি আস্‌মাইহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ আহ্‌কামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ: আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর, যেমনিভাবে ঈমান আনতে হয়, তাঁরই সমস্ত নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং তাঁর সমস্ত প্রকার বিধানকে গ্রহণ করেছি।

দুই ॥ «الإِيمَانُ الْمُفَصَّلُ» ঈমানে মুফাস্‌সাল (বিস্তারিত ঈমান-বাক্য উচ্চারণ পূর্বক বিশ্বাস স্থাপন করা) তা নিম্নরূপঃ

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

উচ্চারণ: আ-মান্‌তু বিল্লাহি, ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াউমিল আ-খিরি, ওয়াল ক্বাদ্‌রি খায়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'চি বা'দাল মাউতি।

অর্থ: আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবাদি তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ, এবং শেষ বিচারের দিনের উপর। (আমি ঈমান এনেছি) তাক্‌দীর তথা অদৃষ্টের উপর; এর ভাল ও মন্দ আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট থেকে; এবং (ঈমান এনেছি) মৃত্যুর পর পুণরায় জীবিত হবার উপর।

ঈমানের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তরিক বিশ্বাসই ঈমান। কেননা, ঈমানের আধার হলো অন্তর। অতএব, অন্তরে বিশ্বাসের প্রতি অনুগত হয়ে মুখের স্বীকৃতিসহ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা তথা অনুসরণ-তাবেদারী প্রকাশকে 'ইসলাম' বলে। যার কারণে ঈমান বিহীন ইসলাম, এবং ইসলাম বিহীন ঈমান অর্থগত পার্থক্যেরই প্রেক্ষিতে কুরআন-হাদীস দ্বারা অনুমোদিত নয়। সেই জন্য প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরে বিশ্বাস না থাকে, কুরআনের ভাষায় তাকে 'নেফাক্ব' বা মুনাফেকী বলে। আর ওই নেফাক্বকে 'কুফর' হতে বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ "মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্ব্ব নিম্নস্তরে, আর তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।" [৬]

অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি, নির্দেশনা ও বিধি বিধানের তাবেদারী তথা আনুগত্য অনুপস্থিত হয়, কুরআনের ভাষায় একে 'কুফরি' বলা হয়। আর অন্তরে বিশ্বাস আছে মুখের স্বীকারও করে কিন্তু বিধি-বিধানের আনুগত্য-তাবেদারী তথা কর্মসম্পাদন না করা হয় তাকে 'ফাসেক' বলে। ইমামে আযম আবু হানীফা (র.) ঈমানকে بسيط বা একক হিসেবে শুধু تصديق قلبي বা অন্তরে বিশ্বাসকে ঈমান বলেছেন পাশাপাশি إقرار باللسان বা মুখের স্বীকৃরি ও عمل بالأركان বা কর্মে বাস্তবায়নকে ঈমানের জন্য শর্ত বলেছেন। আর অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে এযাম ঈমানকে যৌগিক হিসেবে অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কর্মে বাস্তবায়নকে 'ঈমান' বলেছেন। বাহ্যিকভাবে ইমামে আযম আবু হানিফা (র.) ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসীনে এযামের মধ্যে বাহ্যিকভাবে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলেও এটা নিছক শাব্দিক ও ভাষাগত মতবিরোধ, মৌলিক কোন বিরোধ নয়। কেননা মুখের স্বীকৃতি আর কর্মে বাস্তবায়ন ঈমানের আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে সকলেই একমত।

এতে স্পষ্ট যে, শুধু জানার নাম 'ঈমান' নয়। কেননা খোদ ইবলিস শয়তান এবং অনেক কাফেরও রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নবুওয়াতে আন্তরিক ছিল, কিন্তু না মানার কারণে তারা মু'মিনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

অতএব, যাদের ঈমানও পূর্ণাঙ্গ, আমলও পূর্ণাঙ্গ, তারাই মু'মিন এবং দুয়ের সমন্বয়েই 'ইসলাম'। প্রকারান্তে এভাবে বলা যেতে পারে যে, 'ঈমান' যেমন অন্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তেমনিভাবে 'ইসলাম' ও প্রকাশ্য আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে।

[৬]. সূরা নিসা-১৪৫।

এক নজরে ঈমানের শাখা সমূহঃ

ইবনে হিব্বান (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত ঈমানের শাখাগুলো তিন প্রকার। [7] যথা:

(১) অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।
(২) জবানের সাথে সম্পৃক্ত এবং
(৩) শরীরের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রথমতঃ অন্তরের কাজসমূহ

নিয়ত ও বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের কাজ। ঈমানের যেসমস্ত শাখা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তার সংখ্যা ২৪টি। নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর যাত (স্বত্তা),সিফাত (গুণাবলী) এবং একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। তবে স্মরণ রাখা জরুরী যে,আল্লাহ্ স্বীয় সত্বা ও গুণাবলী কোন সৃষ্টির মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি শুনেন এবং দেখেন"। [৪]

(২) এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুই ধ্বংসশীল।
(৩) এমনিভাবে আল্লাহর ফেরেশতা
(৪) আসমানী কিতাব
(৫) নবী-রাসূল
(৬) তাকদীরের ভালমন্দ এবং
(৭) আখেরাতের প্রতি ঈমান। কবরের প্রশ্নোত্তর, পুনরুত্থান, হিসাব, আমলনামা প্রদান,মীযান (দাঁড়িপাল্লা),পুলসিরাত,জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়ন করাও অন্তরের কাজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

[৭]. ফাতহুল বারী লিল-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)।
[৮]. সূরা শুরা-১১

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) আল্লাহকে ভালবাসা,আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসা,আল্লাহর জন্যেই কাউকে ঘৃণা করা,

(৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান করাও অন্তরের কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর দরূদ পাঠ ও তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন তার অন্তর্ভূক্ত।

(১০) তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা

(১১) একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর এবাদত করা আবশ্যক-এর প্রতি ঈমান আনয়নও অন্তরের কাজের অন্তর্ভূক্ত। রিয়া তথা লোক দেখানো আমল ও মুনাফেকী পরিহার করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(১২) তাওবা করা

(১৩) আল্লাহকে ভয় করা

(১৪) আল্লাহর রহমতের আশা রাখা

(১৫) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা

(১৬) ওয়াদা অঙ্গিকার পূর্ণ করা

(১৭) ধৈর্য ধারণ করা

(১৮) তাকদীরের লিখনের উপর সন্তুষ্ট থাকা

(১৯) আল্লাহর উপর ভরসা করা

(২০) বিনয়-নম্রতা প্রদর্শ করা,বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করাও এর অন্তর্ভূক্ত

(২১) অহঙ্কার ও তাকাব্বরী বর্জন করা

(২২) হিংসা বর্জন করা

(২৩) কাউকে ঘৃণা না করা এবং

(২৪) ক্রোধ বর্জন করা।

দ্বিতীয়তঃ জবানের কাজসমূহ

ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক জবানের সাথে তথা জবান দ্বারা উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যসমূহ তার সংখ্যা হল সাতটি। যথা:

(১) তাওহীদের বাক্য অর্থাৎ মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করা

(২) কুরআন তেলাওয়াত করা

(৩) ইলম শিক্ষা করা

(৪) অপরকে ইলম শিক্ষা দেয়া

(৫) দু'আ করা

(৬) যিকির করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাও এর অন্তর্ভূক্ত

(৭) অযথা কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয়তঃ শরীরের কাজসমূহ

ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক শরীরের সাথে,তার সংখ্যা হল ৩৮টি। এ শাখাগুলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:

(ক) কতিপয় শাখা ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা পনেরটি। যথা:

(১) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করা

(২) মিসকীন ও অসহায়কে খাদ্য দান করা

(৩) মেহমানের সম্মান করা

(৪) ফরজ রোজা পালন করা

(৫) নফল রোযা পালন করা

(৬) ইতেকাফ করা

(৭) লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা

(৮) হজ্জ পালন করা

(৯) উমরা পালন করা

(১০) কাবা ঘরের তাওয়াফ করা

(১১) দ্বীন ও ঈমান নিয়ে টিকে থাকার জন্যে দেশ ত্যাগ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১২) দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্যে কাফের রাষ্ট্র ত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে চলে যাওয়া

(১৩) মানত পূর্ণ করা

(১৪) ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করা ও

(১৫) কাফ্ফারা আদায় করা।

(খ) কতিপয় শাখা আছে,যা ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা মোট ৬টি। যথা:

(১) বিবাহের মাধ্যমে চরিত্র পবিত্র রাখা

(৬) পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা

(৩) পিতা-মাতার সেবা করা,তাদের অবাধ্য না হওয়া

(৪) সন্তান প্রতিপালন করা

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

(৬) মনিবের প্রতি অনুগত থাকা ও অধীনস্তদের সাথে নরম ব্যবহার করা।

গ) এমন কতিপয় শাখা রয়েছে,যা সকল মুসলমানের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ১৭টি। যথা:

(১) ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা

(২) মুসলিম জামাআতের অনুসরণ করা,

(৩) শাসকদের আনুগত্য করা

(৪) মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত

(৫) সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করা,সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজের নিষেধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত

(৬) দণ্ডবিধি কায়েম করা

(৭) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়াও জেহাদের অন্তর্ভূক্ত

(৮) আমানত আদায় করা এবং গণীমতের মালের পাঁচভাগের একভাগ আদায় করাও এর অন্তর্ভূক্ত

(৯) ঋণ পরিশোধ করা

(১০) প্রতিবেশীর সম্মান করা

(১১) মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা

(১২) হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করা এবং বৈধ পন্থায় তা খরচ করা এবং অপচয় না করা

(১৩) সালামের উত্তর দেয়া

(১৪) হাঁচি দানকারীর উত্তর প্রদান করা

(১৫) মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা

(১৬) খেলা-তামাশা থেকে বিরত থাকা ও

(১৭) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দেয়া।

এই হল ঈমানের ৬৯টি শাখা। কতিপয় শাখাকে অন্য শাখার সাথে একত্রিত গণনা না করে আলাদাভাবে হিসাব করলে ৭৭টি হবে।

আল্লাহ ও তার হাবীব-ই ভাল জানেন।

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে মাযহাব (ধর্মমত) অনুশীলনের গুরুত্ব প্রসঙ্গ:

সুহৃদ মুসলিম জনগোষ্ঠি এ বিষয়ে অবগত যে, ঈমানের পর নামাযই হচ্ছে তার প্রথম ও প্রধান করণীয় কাজ এবং প্রধান ইবাদত। শুধু নামায কেন ঈমানদারের প্রত্যেক কর্মই ইবাদত তথা পূণ্যময়। তবে মু'মিনের জন্য শর্ত হচ্ছে ঈমানদার ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণকারী বালেগ হওয়ার সাথে সাথে বা কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ৪ বরহক মাযহাব হতে যে কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করা। অন্যথায় পূণ্য আশা করা আহমকী। কেননা মানবগোষ্ঠিকে আল্লাহ ভাল্লা শানুহু শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। এর সাক্ষ্য বহন করে যে, মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইন-কানুন, ইত্যাদির পরিপন্থি চলে না, আর যখনই কোন ব্যতিক্রম ঘটে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই ব্যতিক্রমের শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাকে সামাজিকভাবে একঘরে হতে হয়, ঘৃণিত হিসাবে চিহ্নিত হয়, পিতা-মাতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্র তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে সাব্যস্ত করে।

কাজেই ধর্ম নয় শুধু, সমাজে-পরিবারে-রাষ্ট্রে মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করতে চাইলে তাকে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলী নির্দেশাবলী, সংবিধান, হ্যা-না ইত্যাদি মোতাবেক তার জীবনকে পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় সে চতুষ্পদ জন্তুতুল্য হবে বৈকি।

তবে হ্যাঁ! উপরোক্ত আলোচনা মোতাবেক যদি মানুষ নিজ জীবন গড়ে পরিচালনা করে তাহলে সে আক্ষরিক অর্থে মানুষ হবে বটে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে ইহ, পরকালীন সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস সমৃদ্ধ দুনিয়া আখেরাতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ পরিচয়ে পরিচিতি থাকার জন্য মনন কর্ম বিশ্বাস সমন্বয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত একটি জীবন ব্যবস্থা বা নিযামে হায়াত যা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন; যার নাম 'ইসলাম'; যা তাকে মেনে চলতে হবে এবং ফরযও বটে। তবেই সে মানুষ ও মু'মিন মুসলমান। (যেহেতু মানবের জন্ম বা সৃষ্টিগতভাবে ইসলামে হয়েছে।

মাতা-পিতা বা রাষ্ট্রের তাহজিব-তামাদ্দুনের কারণে এবং ব্যক্তিগতভাবে শয়তান তার হৃদয়ে-মননে আসন পেতে থাকার কারণে শয়তান পূজায় ব্যস্ত হয়ে হক পুরস্তি ছেড়ে বসে তাই বলেই সে অমুসলিম বিধর্মী) পবিত্র কুরআনুল করিম সেই মুসলিমও ইসলামের আইন কানুন সীমা-পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আপন কথন-কর্ম দ্বারা তার ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। ফলে হাবিবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণ অনুসরণ ইতায়াত ও তার তুরীক্বা মতে চলা আমাদের উপর ফরয বলে কুরআন করিম উম্মতে মুসলিমার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, প্রত্যেক মুসলিম বলতেই রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল নির্দেশ ও তাঁর যাবতীয় জীবনক্রমকে জাগতিক হউক বা ধর্মীয় প্রত্যেক ব্যাপারে ওহিয়ে ইলাহী হিসাবে বিনা বাক্যে স্বীকার ও গণ্য করতে হবে। যার প্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট নজির হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণ। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যা শুনতেন এবং তাঁকে যা যেভাবে করতে দেখেছেন, বিনা বাক্যে স্ব স্ব

জীবন যাপন পরিচালনা করে দুনিয়ার ইতিহাসে তাঁরা সোনার মানুষ হিসাবে খ্যাতি লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

মূলতঃ জামানায়ে রিসালাতে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহকামে শরীয়তের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ, মুস্তাহাব, মুবাহ্ ইত্যাদির প্রকারভেদের তেমন উদ্ভব হয়নি। কারণ একটাই, যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে অযু করতে দেখেছেন ঠিক সেভাবে অযু করেছেন। অযুতে কয়টি ফরয, কতটুকু সুন্নাত, কয়টি মুস্তাহাব তাও তাঁরা জানার প্রয়োজন মনে করেন নি। অল্প মাসাইলই জেনেছেন। তাও ঘটনা ঘটলে বা প্রয়োজন হয়ে পড়লে। তবে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। মানব জাতির হেদায়তের জন্য ক্বিয়ামত অবধি যা যা প্রয়োজন মহান আল্লাহ্ তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে তা করায়ে বা বর্ণনা করায়ে দিয়েছেন।

এভাবে জামানায়ে রিসালতের প্রায় পুরো অংশ অতিবাহিত হল। অপরদিকে ইসলামের বিজয় পরিসীমাও বাড়তে চলল। নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহেরও উদ্ভব হতে লাগল এবং কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে শরীয়তের সিদ্ধান্ত রচনার ও প্রয়োজন দেখা দিল। উল্লেখ্য যে, শরীয়তের মাস'আলা বের করা অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসের মৌলিক ও সার সংক্ষেপ নীতিমালা বের করাকে ইসলামের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলে। আর যিনি স্পষ্ট আয়াতের বা হাদিসের অর্থ দ্বারা অথবা ঐ আয়াত বা হাদিসের বর্ণনার আলোকে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টির জন্য কেয়াস বা অনুমান করে মাস'আলা বের করতেন তাকে 'মুজতাহিদ' বলে। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে পাঠক খেদমতে একটি বিশুদ্ধ হাদিস পেশ করব যে-

হুযুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর্দা করার মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১০ম হিজরীতে হযরত মা'আজ ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত পূর্বক পাঠানোর প্রাক্কালে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বিচারকার্য কিভাবে সমাধা করবে?" হযরত মা'আজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মহান আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করব। আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে যদি তুমি না পাও? হযরত মাআজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ্ মোতাবেক ফায়সালা করব। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তাতেও যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

না থাকে তবে? উত্তর করলেন আমি তা গবেষণা করে আমার রায় মোতাবেক ফায়সালা করব। হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুশি হলেন। [৯]

এছাড়াও হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিজস্ব প্রতিনিধি হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে নিজ প্রেরিত এক দিকনির্দেশনা পত্রে বা ফরমানে লিখেছিলেন, ভাল করে বুঝে শুনে ফায়সালা করবে। বিশেষ করে যে সকল মাস'আলা কুরআন সুন্নাহ্ হতে স্পষ্ট নির্দেশাবলী দ্বারা বের করতে সক্ষম না হবে। তা হলে বর্ণিত আয়াতে কুরআন করীম এবং রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ্ নিসৃত মাস'আলার উপর ব্যাপক জ্ঞান রাখে ঐ লোকদের সমন্বয়ে একে অন্যের সাথে সরাসরি সাদৃশ্য মাসা'য়েল অনুসন্ধান করবে। অতঃপর সর্ব সমন্বয়ে আল্লাহ্ ও তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দনীয় এবং সত্য ও ন্যায়ের অধিক নিকটতম মাস'আলাকে ক্বিয়াস হিসাবে ইখতিয়ার করবে [১০]।

অতএব, উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে এক কথায় বলা যেতে পারে যে, কুরআন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলে এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান ফিক্বাহ শাস্ত্র জ্ঞানে-গুণে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর সমন্বয়ে প্রদত্ত সমাধান যাঁরা দেবেন তাঁরা 'মুজতাহিদ'; এবং উদ্ভাবিত মাস'আলা উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে সর্ব সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর সমন্বিত মতামত বা উদ্ভাবিত মাস'আলার উপর ঐকমত্যকে ইজমা-ই সাহাবা বলা হয়। তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিতে পারি যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগেই ফিক্বাহ শাস্ত্রের মাস'আলা রচনার মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ চার মূলনীতি কুরআন, সুন্নাহ্, ক্বিয়াস ও ইজমায়ে সাহাবা তখন থেকে প্রচলিত ছিল।

সার সংক্ষেপে বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জমানায় এ গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজটি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেছেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর্দা করার কিছুকাল পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর একটি দল তাও হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফয়েজ প্রাপ্ত ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে বা মদিনাতেই বসে তাও আবার সকল সাহাবায়ে

[৯]. আবু দাউদ ৩৫৯২, তিরমিজী ১৩২৭।
[১০]. সুনানু দারকুতনী -৪৪৭১, সুনানে কুবরা বায়হাকী- ২০৪৬০।

কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম নহেন। শুধুমাত্র যাঁরা মুজতাহিদ, প্রজ্ঞা সম্পন্ন ফিক্বহ-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন; তাঁরাই ঐ ফতোয়া দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হতেন। তারপরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মুফ্তি সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন যে, উদ্ভাবিত ঘটনার ফায়সালা-ফতোয়া কি নিয়ম কানুনের মাধ্যমে দিবে।

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা করার পর খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য মুফতি মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণ এ পবিত্র খেদমত নিরলসভাবে আনজাম দিয়ে গেছেন। এভাবে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুজতাহিদ ও ফতোয়া দেয়ার কাজ আনজাম দিয়েছিলেন এবং ফতোয়া ও রক্ষিত ছিল তারা নারী পুরুষ মিলে মাত্র ১৪৯ জন ছিলেন।

ফিক্বহ শাস্ত্র ইতিহাস বেত্তারা তাঁদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- প্রথম শ্রেণীর মুফ্তি, মুজতাহিদ, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁদের সংখ্যা মোট সাতজন, যথাক্রমে (১) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (২) চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৩) উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, (৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৬) হযরত যায়েদ ইবনুস সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও (৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ।

এভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র মধ্যে ২য় শ্রেণী তথা মধ্যম সংখ্যক ফতোয়া দাতা মুফ্তি মুজতাহিদ এর সংখ্যাক্রম প্রায় ১৩ জন, আর তাঁরা হলেন যথাক্রমে (১) খলীফাতুর রাসূল হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (২) উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, (৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৪) তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৫) হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৬) হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৭) হযরত আবু মূসা আল-আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৮) হযরত সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (৯) হযরত সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (১০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (১১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, (১২) হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং (১৩) হযরত মুআয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

আর তৃতীয় স্তর তথা স্বল্প সংখ্যক মাসায়েলের ফতোয়াদাতা (সাহাবায়ে কিরাম) মুফ্‌তি মুজতাহিদের সংখ্যাক্রম প্রায় একশত বাইশের অধিক এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে হাবিবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ [১১]।

উপরিউক্ত তিন স্তর বিশিষ্ট বর্ণিত হিসাবে মুফ্‌তি, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও লাখো লাখো সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম উদ্ভাবিত ঘটনা প্রবাহের আলোকে কুরআন সুন্নাহ্'র দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছ বিশ্লেষণ নিজ নিজ দেশে সমাজে ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বা শরীয়তে ইসলামির হুকুম আহকাম প্রদান করে তথাকার সত্য অনুসন্ধানীদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে আনতে চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্তভাবে মুজতাহিদ সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও তাঁদের অনুসারী তাবেইন দ্বারা জামানায়ে রিসালাত পরবর্তী সময়ে স্ব স্ব সমাজে-দেশে শরীয়তে ইসলামী তথা ফিক্বহ ইসলামীর কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে নিজ সমাজ পরিচালনা করে আসছিলেন। এ ধারাবাহিকতা হিজরী সনের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রায় প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে ঐ সময়কাল পর্যন্ত কোন ধর্মমত বা মাযহাবের সূচনা না হলেও উপরিউক্ত বর্ণনার নিয়ম মোতাবেক শরীয়তে ইসলামীর অনুশীলন চলে আসছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ ও এরপর হতে দুনিয়ার দিকে-দিকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনেক প্রসার ঘটে। সহজ সরল সিরাতে মুস্তাকিম ইসলামের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কালচার-কৃষ্টির শিক্ষার সাথে সংমিশ্রণ ও ভাবের বিনিময়ের ফলে নতুন নতুন সমস্যা অবস্থা ও মাস'আলা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে থাকে। স্বয়ং মুসলিম সমাজেও ইসলামী নীতি নির্ধারণী চিন্তাধারা যুক্তি-দর্শনের বিশৃঙ্খল মতভেদ দিন দিন প্রকট হচ্ছিল। ঐ দুর্দিনে ও পরিবর্তিত অবস্থায়

[১১] আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম লিইবনুল হাযম-৫/৯২।

সাহাবায়ে কেরামগণের ঐ ইজতেহাদি ফতোয়ার অনবদ্য ফতোয়া স্মারক সমূহ অবলম্বনে তৎসময়ের প্রখ্যাত তাবেঈনগণ বিশেষ করে ইমামুল মুজতাহেদিন, ইমামে আযম আবু হানিফা নু'মান ইবনু সাবিত আলফারেসী আলকুফি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুই সর্বপ্রথম ইসলামী ফিক্বহ সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন এবং তার সাথে জ্ঞান প্রজ্ঞায় মেধায় বুদ্ধি যুক্তিতে বিশেষতঃ কুরআন, হাদিস সুনানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জ্ঞানে সমৃদ্ধ একদল আলেমে দ্বীন যাঁরা মুজতাহিদের উপযুক্ত স্তরের ছিলেন, তাঁদের নিয়ে ফিক্বহে ইসলামী সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেন।

যেমনিভাবে প্রখ্যাত তাবেয়ী উমাইয়া খিলাফতের অষ্টম খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তৎসময়ের প্রেক্ষাপট পরিস্থিতি বিবেচনা করে বা-কায়েদা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকলন ও সম্পাদনার হুকুম জারি করে বর্তমান পর্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস প্রাপ্তিতে সহায়তা ও উম্মতে মুসলিমাকে কৃতার্থ ও ঋণী করেছিলেন। অনুরূপ ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

আসলে ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জন্মেছিলেন রেশমি কাপড় ব্যবসায়ী ৪৫ বৎসর বয়সী পিতা সাবিতের সংসারে হিজরী সনের ৮০'তে কূফা নগরীতে। মূলতঃ কুফা নগর ইসলামের আলো বিকিরণে তখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন। কারণ ঐ শহর আবাদ হয়েছিল হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নির্দেশে। এরচেয়ে বড় আনন্দদায়ক দিক কুফা নগরীতে প্রায় পনের শতের অধিক সাহাবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণ এর বসবাস ছিল। আবার তাঁর মধ্যে চব্বিশজন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ 'বদরে' অংশগ্রহণকারী সাহাবাও ছিলেন। উপরন্তু ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে কুফার মুয়াল্লিম নিযুক্ত করে প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত কুফাবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষায় ধন্য করেছেন। ফলে ঘরে ঘরে ফিক্বহী মাসায়েলও ইলমে হাদীসের চর্চা ছিল নজরে পড়ার মত।

আবার ৪র্থ খলিফা বাবুল ইল্‌ম খ্যাত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফাকেই ৩৫ হিজরী সন হতে ৪০ হি. পর্যন্ততাঁর দারুল খিলাফত বা মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন। ফলে এত অধিক সাহাবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বসবাসেরও পদচারণার বিশেষতঃ উপরিউক্ত দুই শিক্ষাগুরুর ছাত্রের ছাত্র এবং তাদের ইজতেহাদি ফতোয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

অত্যাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করল এবং কুফায় মুজতাহিদ তাবেয়ীনদের সংখ্যাও অনেক বাড়ল। তন্মধ্যে উপরিউক্ত দুই মহাত্মার কুরআন হাদিস সম্পর্কিত জ্ঞান বা ফিক্বহ -ফতোয়া ইত্যাদি বিলওয়াসেতা (দুদমহাত্মার মাধ্যমে) হযরত ইব্রাহীম নখ্য়ীর নিকট পৌঁছেছিল সর্ব্বাধিক। উল্লেখ্য যে, ইসলাম যদিও বা মদিনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব থেকে বিকাশ প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু কুফা নগরীটি ছিল আরব অনারবের সঙ্গমস্থল ও বিভিন্ন জাতির মিলনস্থল হওয়ার কারণে নতুন নতুন মাস'আলা সমূহের পর্যালোচনা ও তাহকীক হত কুফাতেই বেশী।

ফলশ্রুতিতে ইমাম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফার অধিবাসী হওয়ার সুবাদে যদিও বার কি তের বছর বয়সে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক গৃহে একনাগাড়ে দশ বছর খেদমত করার সৌভাগ্যবান সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েও তৎসময়ের কুফা নগরীর প্রথা মুখালিফ হাদিস শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হননি। সতের বছর বয়সেই ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং প্রথম তিনি ইল্‌মে কালাম, আকায়েদ ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতঃ ইল্‌মে তাফসীরেও বেশ গভীর জ্ঞানলাভে সক্ষম হন। অতঃপর যখন দেখলেন যে, বাস্তব জীবনে ফিক্বহ্-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, কারণ সরকার প্রজা সাধারণ সকলেরই এই ইল্‌মের প্রয়োজন এবং ইহ পরকালের কল্যাণ অকল্যাণ এই ইল্‌মের উপর নির্ভরশীল। তখন তিনি পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ তথা অষ্টম উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (৬১-১০১) রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি'র সময়কালেই ফিক্বহের সম্পাদনা ও ইজতিহাদে মনোযোগ দিলেন। বিশেষকরে তাঁর ওস্তাদে মোহ্‌তারাম হযরত হাম্মাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ইন্‌তিকালের পর ফিক্বহে হানাফি সম্পাদনায় পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেছিলেন।

স্মর্তব্য যে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে তাবেঈন, আইম্মা-ই মুজতাহেদীন অনুসৃত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত সমর্থিত 'হানাফী মাযহাব' ছাড়াও আরো তিনটি মাযহাব যেগুলো বিশ্বের দেশে দেশে এখনো আছে। অর্থাৎ হানাফী ফিক্বহের পর ইসলামী সাম্রাজ্যে আরো বহু মাযহাবের সম্পাদন হয়েছিল। তন্মধ্যে ইমামু দারুল হিজরত হযরত মালেক বিন আনাস বিন মালেক বিন আবি আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফিক্বহে মালেকী। হযরত আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস বিন

ওসমান শাফে আসশাফেয়ী আলমত্তালবী (তাঁর নবম পুরুষ আবদুল মোনাফ যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৪র্থ পূর্ব পুরুষ ছিলেন। মাতার দিক থেকে উম্মুল হাসান মুজতাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন) এর ফিক্বহ শাফেয়ী এবং হযরত আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ ইবনু হাম্বল ইবনু হেলাল মিহলী আল মরুমী আল বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ফিক্বহে হাম্বলি; এই চার মাযহাবই সম্পাদনা ও ইজতেহাদের যুগে সম্পাদিত ফিক্বহ শাস্ত্র আল-হামদু লিল্লাহ্ এখনো পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে।

এছাড়া সম্পাদনার যুগে অন্যান্য আরো মাযহাবের সম্পাদন, প্রচলন ও অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তীতে ভ্রান্তিমনগড়া মতবাদ সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে তা বিলুপ্ত বর্তমান অনুসরণ অবৈধ। যেমন সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগে জায়েদিয়া মাযহাব, ইমামিয়া, ইসমাঈলিয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, ফিক্বহ শাস্ত্র সম্পাদনা বা শরীয়তে ইসলামী সম্পাদন সংকলন সংবিধিবদ্ধকরণে ঐ চার মনীষী যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা নোমান ইবনু সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (জন্মঃ ৮০-ওফাত ১৫০ হিজরী), ইমাম মালেক ইবনু আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (জন্মঃ ৯৩-ওফাত ১৭৯ হিজরী), ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (জন্মঃ ১৫০-ওফাত ২০৪ হিজরী) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (জন্মঃ ১৬৪-ওফাত ২৪১হিজরী) এবং তাঁদের পরবর্তী প্রত্যেক ইমামেরই যোগ্য মুজতাহিদ বিচারক জ্ঞান-প্রজ্ঞতা সম্পন্ন ছাত্র ও তাঁদের শিষ্যগণের মাধ্যমে ফিক্বাহে ইসলামী সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ সুসম্পন্ন হয়।

মোদ্দাকথা হল তাঁদের ছাত্রগণ সবাই ইল্‌মে হাদিস তাফসীরে বিশেষতঃ ইল্‌মে ফিক্বহে মুজতাহিদ ও মাযহাবের ইমাম হবার যোগ্যতা রাখতেন। তথাপিও তাঁরা নিজ নামে কোন মাযহাব প্রচলন বা উদ্ভাবন করেননি। যদি করতেন তাহলে আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র যোগ্য প্রজ্ঞাবান হাজারো ছাত্রদের মাঝে বিশেষ করে মাযহাবে ইউসুফ, মাযহাবে মুহাম্মদ, মাযহাবে তাহাবী নামক সৃষ্ট মাযহাব দেখতাম। কিন্তু না তাঁরা সকলেই আপন ওস্তাদের তাকলিদ বা অনুসরণ করেছেন। এছাড়া অপর তিন মাযহাবের ইমামগণের ছাত্রদের বেলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

প্রকাশ থাকে যে, ফিক্বাহ শাস্ত্রের দ্বিতীয় হলো তাক্‌লিদ সম্পাদনা পূর্ণতার যুগঃ ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর শুরু হতে ৭ম হিজরী শতাব্দী পর্যন্তাকলিদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও পূর্ণতার যুগ। ওই যুগে ইজতিহাদ বা ফিক্বাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পাদনা প্রায় বন্ধ বা নিষ্প্রয়োজন এর পর্যায়ে ছিল। বিজ্ঞ ফকিহ্ আলেম সমাজ আম জনসাধারণের ন্যায় বিশেষ একজন ফকীহ মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ অকপটে পালন শুরু করেছিলেন বটে এবং স্ব স্ব ইমামের সম্পাদিত নীতিমালা অনুসরণ করে নতুন মাস'আলা ইজতিহাদ ও ফতোয়া বিচারকার্য ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং স্ব ইমাম নির্মিত মাযহাবের মাস'আলাসমূহ সঠিকতা প্রয়োগ ব্যবহারে সাব্যস্তে ব্যপৃত হলেন। অবশেষে ইমাম চতুষ্টয় এর সম্পাদিত ইসলামী শারীয়াহ্র নীতিমালাই সত্যনিষ্ঠ এবং ঐ চার ইমামের মাযহাবই বরহক্ব ও কুরআন, সুন্নাহ্ যুক্তি ইত্যাদির সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ একথা সর্বজন স্বীকৃত হয়।

ফলে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামা, জনসাধারণ ও ফিকৃহ শাস্ত্রে বিজ্ঞজনরা এজমা হয়ে গিয়েছিল। অথচ যখন ইমাম চতুষ্টয়ের উপর এজমা হচ্ছিল তখনো মুজতাহিদ জ্ঞান দ্বারা ও কুরআন সুন্নাহ্র ইল্মে নিজস্ব মাযহাব সম্পাদন করতে পারে এমন অনেক আলেমে দ্বীন ফকিহ্ তখনো বর্তমান ছিল এবং তাঁরাই ঐক্যমত্যে সিদ্ধান্তনিলেন যে, শরয়ী মাস'আলায় ইমাম চতুষ্টয়ের সম্পাদিত মাযহাব হতে যে কোন একটির 'তাকলিদ' বা অনুকরণ আনুগত্য ওয়াজিব এ কথার উপর সবাই ইজমা হলেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাব বা ধর্মমত হতে যে কোন নির্দিষ্ট একজন ইমামের গবেষণা লব্ধ মাসায়েল ও নীতিসমূহকে শিখে তাকে শরীয়ত বলে স্বীকার করা এবং সে মতে আমল করা অর্থাৎ নিজের ইবাদত বন্দেগী ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করা এবং উক্ত ইমামের নীতির বিপরীত-ব্যতিক্রম করাকে অবৈধ বলে অন্তর ও কর্মে স্বীকার করার নাম 'তাকলিদ'।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রবীণতম তাবেঈনদের যুগ হতে ইসলামী ফিকৃহ সম্পাদনের যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক সময়েই মুজতাহিদ যেমন ছিলেন মুকাল্লিদ বা তাকলীদও ছিল। অর্থাৎ উভয় প্রকারেই প্রজ্ঞাবান ফোক্বাহায়ে কেরামগণ মুকাল্লিদদের মাঝে বর্তমান ছিলেন। তাঁরা ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা রাখা সত্বেও নিজেদেরকে মুজতাহিদের আসনে না রেখে চার ইমামের মুকাল্লিদ হওয়াকে আবশ্যক হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ।

স্মর্তব্য যে, সামগ্রিকভাবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামী ফিকৃহের মূল উৎস হচ্ছে দু'টি, প্রথমতঃ কুরআনে হাকীম আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে

সুন্নাতে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মানে হচ্ছে কুরআনে হাকীমে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত মানব ও দানবের কর্ম কৌশল বিধান ও মূলনীতি সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপক অর্থে সাড়ম্বরতার সাথে সংকীর্ণতাহীন মৌলিক বিষয়সমূহের কর্মধারা আলোচিত হয়েছে। পাশপাশি ব্যাকরণিক শব্দ শৈল্পতা হলেও পর্যায়ক্রমিতা, পূর্ববর্তী ধর্মনীতি রহিত বা বলবৎ করণের আদেশ এবং হিকমত, ইল্লত, প্রেক্ষাপট ও আর্থ সামাজিক অবস্থাকে সর্বকালে সার্বজনীনতা বিঘোষিত হয় এমন আলোচনায় ভরপুর হচ্ছে পবিত্র কুরআন মজীদ।

এক কথায় কুরআন হচ্ছে নকশা মাত্র। আর সুনানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে নকশানুযায়ী নির্মিত ইমারত। তাই ফকিহ্ সাহাবায়ে কেরাম ও প্রবীণ তাবেঈনদের যুগ হতে মাযহাব সম্পাদনের যুগ পর্যন্ত(রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) উপরোক্ত দু'টি দিককে সামনে রেখে জনকল্যাণের বিধান উদ্ভাবনে এবং ব্যবহারিক প্রচলন, রেওয়াজ, দেশজ আইন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুকরণ সর্বোপরি সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিদের মত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি বিষয় হতে দলিলের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দলিলের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঐক্যমতে পৌঁছে আমাদের সামাজিক পারিবারিক রাষ্ট্রীক ও পরলৌকিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত করতে যে নীতিমালা তৈরি করেছেন তা হচ্ছে ফিকৃহে ইসলামী বা ইসলামী শরীয়ত।

বস্তুত ফিকৃহে ইসলামী এমন এক ধর্মনীতি-মত, যাতে শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠির কল্যাণ নয় বরং বাস্তবজীবন ব্যবস্থাপনায় বিধর্মী প্রজাদের দাবী দাওয়া অত্যন্ত সদয় ও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। আর যাঁরা উপরোক্ত কতিপয় মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমে ফিকৃহে ইসলামী সম্পাদনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন মুজতাহিদ।

এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই যে- কুরআন সুন্নাহ্ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনায় মত ভিন্নতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব। অথবা এভাবেও বলা যেতে যারে যে, দলিলের আশ্রয়গ্রহণ, জনকল্যাণ বিবেচনায় বা ব্যবহারিক প্রচলনের ক্ষেত্র বিবেচনায় মত পার্থক্যতার কারণে মাযহাবের সৃষ্টি। তবে একথা অবশ্যই গ্রহণ করে নিতে হবে যে, উভয় প্রকারের মত পার্থক্যতায়, মানব তথা মুসলিম জনপদে সৃষ্টি করেনি কোন বিভেদ, সৃষ্টিও হয়নি কোন বিপর্যয়। কারণ ইজমায় অংশগ্রহণকারী ইমাম মুজতাহিদগণ ছিলেন নেহায়েত মুত্তাকী, জ্ঞান, প্রজ্ঞায়, মেধায় পরিণামদর্শিতায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা ছিলেন অতুলনীয়। অর্থাৎ তাঁরা স্বার্থান্ধতা এবং সম্পূর্ণভাবে বিরোধ প্রবণতামুক্ত মহামানব ছিলেন; সর্ব শ্রেণীর মানবের জন্য।

উপরন্তু তাঁদের মতানৈক্যতা গবেষণার জোয়ারে ফিক্বহে ইসলামীশাস্ত্র সাহিত্যসমুদ্র হতে মহাসমুদ্রের আয়তন লাভ করেছিল। কেননা উভয় শ্রেণীর মুজতাহিদগণের মধ্যে ঐকমত্য বা ইজমার ভিত্তিতে ঐ মাস'আলা বা ফতোয়া প্রণিত হত এবং তাঁদের যুক্তি প্রয়োগের বিধান বা 'ক্বিয়াস' কুরআন সুন্নাহ্ সাদৃশ্য ছিল।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সামগ্রীকভাবে কুরআন সুন্নাহ্ ফিক্বহে ইসলামীর মূল দুই উৎস হলেও সমষ্টিগতভাবে ক্বিয়াস, ইজমা ও ফিক্বহে ইসলামীর অন্যতম আরো দুটি মূল উৎস। অতএব ফিক্বহে ইসলামীর মূল উৎস চারটি। তবে ইস্‌তিস্‌লাহ্, রাষ্ট্র তাআম্মুল, ইস্‌তিদ্‌লাল, উরফ, দেশজ আইন ইসতিহ্‌সান ইত্যাদি ও ফিক্বহে ইসলামীর উৎস এর উপকরণের পর্যায়ভুক্ত। তাই উসুলে ফিক্বহের সংজ্ঞা হচ্ছে, যে শাস্ত্র দ্বারা ঐ উপায়, উপকরণ ও স্থানসমূহের আলোচনা যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিধি-বিধান উদ্ভাবন পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করা যায়। তাই হচ্ছে 'উসুলে ফিক্বহ'।

কুরআন-সুন্নাহ থাকতে মাযহাব কেন ঃ একটি সরল মূল্যায়ন ঃ

আসলেও মাযহাব কি কুরআন সুন্নাহ বিরুধী? 'যারা মাযহাব মানে তারা সহীহ হাদসি মানে না' এই ধারণা কি ঠিক? যারা মাযহাবকে বিতর্কিত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর মুখোমুখি দাড় করিয়েছে তাদের কথা কতটুকু সত্য?

মনে করুন আজ এই মুহূতে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কিংবা আপনি জন্মগতভাবেই মুসলিম, এই মুহূর্তে আপনি ইসলামের কোন বিধান পালন করতে চান, তো আপনাকে আলেম উলামা বা ইসলাম সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতেই হবে। প্রতিটি নওমুসলিমই ঈমান, অযু-গোসল, সালাত-যাকাত, রোযা-হজ্ব ও হালাল-হারাম ইত্যাদির প্রথম ধারণা লাভ করবেন তার ইসলাম গ্রহণের প্রথম মাধ্যম ব্যক্তিটির কাছ থেকে এবং বহু কিছু তিনি শিখে নেবেন মুসলিম সমাজের দ্বীনি কার্যক্রম ও কালচার থেকে।

বাংলাদেশের মুসলমানরা ইসলামী বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ইবাদত-বন্দেগী, সুন্নাত-বিদআত, হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয ইত্যাদি যা কিছুই

জানেন এর প্রায় সব কিছুই সমাজ-পরিবেশ, গৃহশিক্ষক, মসজিদের ইমাম, ওয়ায়েয, মক্তবের উস্তাদ, বাবা-মা, দাদা-দাদী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ থেকে শেখা।

কেবল বই-পুস্তক পড়ে একটা কাজ শেখা আর একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। কোন খেলা, ব্যায়াম, সাইকেল চালনা, সাতার কাটা কোনটাই শুধু বই-পুস্তক পড়ে বা মিডিয়ায় ছবি দেখে পূর্ণরূপে শিখে নেয়া সহজ নয়। একজন উস্তাদের সাথে থেকে তার নির্দেশনা মেনে বিষয়টি শিখলে এবং হাতে-কলমে অনুশীলন করলে ভাষাজ্ঞান বা ব্যাকরণ ততটা না জানলেও কাঙ্খিত কার্যক্রমটুকু শিখে নেয়া সম্ভব। গভীর তত্ত্ব আলোচনা ও সামগ্রিক জ্ঞান অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জন্য জরুরী হলেও বিশ্বাস, দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার সাধারণ অনুসারীর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ওই প্রশিক্ষক, উস্তাদ, পীর, মর্শিদ, আলেম, ইমাম বা প্রচারকের সান্নিধ্য কোনটাই একান্ত অপরিহার্য।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম ও আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রচার তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক পর্যায়েই বেশি অগ্রসর হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর সকল অঞ্চলের সকল যোগ্যতার মানুষে তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দিতে চাইলে কোন কঠিন ও জটিল পন্থা অবলম্বন করা চলবে না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (র.) এর সরল ও সনাতন পন্থায়ই করতে হবে।

হযরত ছরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জীবনের প্রতিটি বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, কোন বই-পুস্তক ধরিয়ে দিয়ে গবেষণা করে বুঝে নিতে বলেই দায়িত্ব শেষ করেননি। পৃথিবীর অপরাপর এলাকায় বসবাসরত সমকালীন মানুষ এবং পরবর্তী সকল যুগের অনাগত বিশ্বমানব মণ্ডলীর কাছে নিজের দাওয়াত পৌছে দিতেও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির আশ্রয় নেননি। তিনি তাঁর সাহাবাগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড় এবং আদর্শের "একটি বাণী হলেও পূর্ব-পশ্চিমে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছে দাও" [১২]

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বলতেন,

---

[১২] সহীহ বুখারী-৩৪৬১, জামে' তিরমিযী-২৬৬৯, মুসনাদে আহমদ-৬৪৮৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়" [১০]

ইসলামের প্রতিটি বিধানই প্রাথমিকভাবে এর ধারকবাহকদের মাধ্যমে - ব্যবহারিক তথা প্রায়োগিকভাবেই বিস্তৃত ও প্রচলিত হয়েছে। আর ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বা এর অন্তর্নিহিত শক্তিও এখানেই যে, এটি ধারণ বা পালন না করে বহন করা যায় না। আর একে ভালো না বেসে ধারণও করা যায় না। যারা একে ভালবাসেন ও নিজেরা ধারণ করেন, তারাই কেবল একে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এর আনুষ্ঠানিক প্রচারের তুলনায় এর ধারক ও সেবকদের আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমেই ইসলাম অধিক, ব্যাপক, গভীর আর টেকসই পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। দেড় হাজার বছরের ইতিহাসই এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এখন ইসলামের একজন অনুসারী হিসেবে আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তা করি। ইসলামের একজন প্রচারক যখন আমার কাছে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরবেন, সে সময়টা যদি হয় আরও ২,৪,৫,৭ শ বছর আগের, তখন কি তার পক্ষে সম্ভব আমার হাতে এক কপি কুরআন বা সহীহ হাদীসের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন তুলে দেওয়া? বাংলাভাষী হওয়ায় আমার পক্ষে কী আরবী ভাষায় তা পাঠ করাও সম্ভব? শুধু আরবী ভাষা বলেই কথা নয়, আমার পক্ষে কি তাত্ত্বিক এ দুটো উৎসবিদ্যার বিষয়গত ভাব উদ্ধার করাও সম্ভব-? এখানে আমার জ্ঞান-সামাজিক অবস্থা-গরিমার পাশাপাশি আর্থ, বোধবিবেকের পরিমাণও একটি - সুন্-প্রশ্ন। এরপর বহু সাধনা করে কুরআননাহর ভান্ডার হাতে পেয়ে গবেষণা করে এর সারনির্যাস হাসিল করে নিজে ঈমান, আমল ও আখলাক চর্চা শুরু করতে আমার কত মাস, বছর বা যুগ লাগবে সেটাও কি কম বড় প্রশ্ন ? এতটা পরিশ্রম করে যদি ইসলাম পালন আমি শুরু করি, তাহলেও তো ভালো। কিন্তু এ কাজটুকু ক'জন মানুষের পক্ষে সহজ বা সম্ভব? তদুপরি প্রশ্ন দেখা দেবে যে, কুরআনআমল-সুন্নাহ গবেষণা করে ঈমান-, নামাযরোযা-, হজ্বযাকাত-,

[১০]. সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৩৮৫৬, মুসনাদে শাফেয়ী-২৯৪ ।

বিয়েশাদি-, ব্যবসাবাণিজ্য-, ঋণউৎপাদন-, দানখয়রাত-, জীবনমৃত্যু-, জানাযা-উত্তরাধিকার ইত্যাদি শুরু করার আগ পর্যন্ত আমার মুসলমানিত্বের এ দীর্ঘ বন্দেগী-সময়ের নামাযও কাজকর্মের কী হবে?

আমার তো মনে হয়, কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর ঈমান ও আমলের জন্য, ইসলামী জীবনবোধ ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য প্রথম দিনই কুরআন ও সুন্নাহ গবেষণা শুরু করার পদ্ধতি ইসলামের স্বাভাবিক রীতি নয়। যদি এই না হবে তাহলে আমার সন্তানকে আমি ঈমান শেখাব কী করে? তাকে নামায, যিকর, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ও আদবআখলাক আমি কোন অধিকারে শিক্ষা দেব-? যদি সে প্রশ্ন তোলে, আববুতুমি আমাকে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাও কেন !? কুরআনসুন্নাহ থেকে আমিই আমার জীবন- বিধান খুঁজে নেব। তুমি এর মধ্যে এসো না। তুমি তোমার প্রায়োগিক আচরণ ও পর্যবেক্ষণ আমার ওপর চাপাতে চেষ্টা করো না। আমি তোমার বা তোমাদের মাযহাব মানি না। আমার দায়িত্ব তো কুরআনসুন্নাহর ওপর দখল -সুন্নাহর ওপর আমল করা। অতএব কুরআন-স্থাপন করার সময় আমাকে দাও। এরপরই আমি শরীয়তের ওপর আমল শুরু করব। পুত্রের এসব যুক্তির পর আমার বলার কি কিছু থাকবে?

পুত্রের এ বক্তব্য যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে ভিত্তিই আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাকে যে সনাতন ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রচলিত ও বিস্তৃত করেছেন, এর সম্পূর্ণ অনুরূপ হচ্ছে আমার এ উদ্যোগ।

আমার পুত্রকে ইসলামী জীবন বিধান- শিক্ষা দেওয়া আমার ওপর শরীয়তের নির্দেশ। আমি তাকে আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর শক্তি, প্রীতি, ভীতি ও ভালবাসা শেখাব। তাকে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহত্ত্ব-, অবস্থান ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে ধারণা দেব। তাকে নামায শেখাব। খাওয়াপরা-, ঘুমবিশ্রাম-, প্রস্রাবপায়খানা-, প্রবেশপ্রস্থান-, মসজিদে যাতায়াত, আযানের জবাব, হাঁটাচলা-, সালাম, মোসাফাহা ইত্যাদির ইসলামী নিয়ম শিক্ষা দেব। আমি নিজেও অযুগোসল-, রোযানামায-, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, হজ্ব-কুরবানী প্রভৃতি যথাযথ নিয়মে পালন -

pdf By Syed Mostafa Sakib

করব। অথচ আমি কুরআন বা হাদীস পড়ার বা বুঝার মতো যোগ্যতা রাখি না। জ্ঞানের এ দুই মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান হস্তগত করে আমল করার মতো শিক্ষা-, মেধা, মানসিক যোগ্যতা বা সামগ্রিক অবস্থা আমার নেই, এমতাবস্থায় আমার কী করণীয়?

এখানে আমার ও আমার পুত্রের একই ধরনের করণীয়, যা ইসলামের ১৫০ কোটি সমসাময়িক অনুসারীর প্রত্যেকেরই করণীয়। আর তা হল, কুরআনকিয়াস থেকে গৃহীত ইসলামী বিধিবিধানের প্রায়োগিক -সুন্নাহ ও ইজমা-রূপ ফিকহের অনুসরণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন,

«فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ»

"একজন ফকীহ শয়তানের মোকাবেলায় এক হাজার আবেদেরও চেয়েও শক্তিশালী"।[১৪]

এর কারণ সম্ভবত এটিও যে, এক হাজার সাধারণ মুসলিমকে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে সংশয় উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেওয়া শয়তানের জন্য যত না কঠিন একজনমাত্র শরীয়ত ফকীহ আলেমকে বিভ্রান্ত করা বিশেষজ্ঞ-এরচেয়ে বেশি কঠিন। কেননা, এই ব্যক্তির কাছে কুরআন ও সুন্নাহর শক্তিশালী সম্পদ রয়েছে। রয়েছে ইলমে দ্বীনের আরও বিস্তারিত ভান্ডার।

কুরআন মজীদেও আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ইরশাদ করেছেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে একদল মানুষ যেন তাফাক্কুহ ফি-দ্দীন' তথা দ্বীনি ইলমের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। আর ফিরে এসে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে"।[১৫]

এখানেও আমরা ফকীহ বা শরীয়তের আলেমের বিধিগত অস্তিত্ব এবং তাঁর কুরআনী দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

[১৪]. সুনানু ইবনু মাজাহ-২২২, শুআবুল ঈমান- লিল-বাইহাকী-১৫৮৬।
[১৫]. সূরা আত-তাওবাহ-১২২।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মহামান্য সাহাবীগণের পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর ইসলাম যখন আরবউপদ্বীপ - লান্তিকছেড়ে একদিকে সাহারা ছুঁয়ে দূর অতস্পর্শ করছিল, অপরদিকে আসমুদ্র সাইবেরিয়া আর মহাচীনের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল তখনও কিন্তু পবিত্র কুরআন ব্যাপকভাবে হস্তলিখিত হয়ে এত বিপুল পরিমাণ অনুলিপি তৈরি হয়নি, যা প্রতিটি শিক্ষিত নওমুসলিমের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আর হাদীস শরীফ - বাছাইয়ের পর সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়েও শেষ হয়নি। তো তো তখনও যাচাই ইসলামের এ অগ্রযাত্রা, ইসলামী শরীয়তের আলোয় প্লাবিত এ নতুন পৃথিবীর বুকে কাদের মাধ্যমে কুরআন—সুন্নাহরআলো প্রতিবিম্বিত হয়েছিল? এর ছোট এক টুকরো জবাবই আছে, হাদীস শরীফে তো বলা হয়েছে, "তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় আমি রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দুটো আঁকড়ে রাখবে ততদিন পথচ্যুত হবে না। এক আল্লাহর কিতাব, দুই.আমার সুন্নাহ"।[১৬]

এ মহা দিকনির্দেশনার আরও সুসংহত রূপ হচ্ছে হযরতের অপর বাণী, যেখানে মুসলিম জাতিকে সত্যপথের দিশা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে আদর্শের উপর আমি রয়েছি আর আমার সাহাবীগণ রয়েছেন।' অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের জন্য অবধারিত করছি আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসরণ"।[১৭]

এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, ইসলামী অগ্রযাত্রা ও ইসলামী জীবনসাধনার সঠিক দিক নির্দেশের জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে মূল উৎস সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার আদর্শ ও মাপকাঠিরূপে অভিহিত করা হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরবৃন্দের অনুসৃত পথ, যা প্রধানতই ব্যবহারিক ও সান্নিধ্যগত আদর্শ। বই পুস্তক ও তত্ত্ব-প্রধান নয়। যে জন্য সাহাবায়ে কেরামের মূল সময়কালের শেষ পর্যায়ে আমরা পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত মালেক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা

[১৬]. সহীহ মুসলিম-১২১৮, সুনান আবু দাউদ-১৯০৫, জামে' তিরমিযী-৩৭৮৬, মুয়াত্তা মালেক-৩৩৩৮।
[১৭]. সুনানু আবু দাউদ-৪৬০৭, ইবনে মাজাহ-৪২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আনহুকে দেখতে পাই গোটা মুসলিম সমাজের লোকশিক্ষক ও দিকনির্দেশক হিসেবে। ইসলামের উপর আমল করার জন্য মদীনাবাসী তখন থেকেই কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা বা অনুসন্ধান শুরু না করে ফকীহ ও আলেম ইমাম মালেকের ফিকাহ বা মাযহাবের উপর, তাঁর নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণের উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করেছেন। এরও বহু আগে থেকে মক্কাবাসীরা নির্ভর করেছেন হযরত ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর উপর। এর কিছুদিন পর থেকে বৃহত্তর ইরাকবাসী ইমামে আজমের (র) ফিকহের উপর। আর এটিই কুরআন ও সুন্নাহর বিধান। আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন, "তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের । আর অনুসরণ কর তোমাদের উলুল আমর বা শরীয়তী অথরিটির"। [১৮]

তো আমার পুত্রকে দৈনন্দিন জীবনের যে শরীয়ত সম্পর্কিত শিক্ষা- ও তার উপর আমল করাও পুত্রের দীক্ষা আমি দেব তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা উপর শরীয়তেরইনির্দেশ। এখানে আমাদের মধ্যকার এ আদানপ্রদান - সুন্নাহ বিবর্জিত বা বিরোধী নয়।-কিছুতেই কুরআন

কুরআনসুন্নাহর ভেতর মানবজীবনের উদ্ভূত যে কোনো সমস্যার - সমাধান পেয়ে গেলে এ থেকেই আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কুরআনসুন্নাহর আলোকে সমাধানে পৌঁছার জন্য নিজের জ্ঞানসু-, অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার আশ্রয় নিতে হবে। এটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আদর্শ। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (র)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় তার মুখ থেকে এ কথা শুনতে পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে আল্লাহর শোকর গোযারি করেছিলেন। [১৯]

ইসলাম পৃথিবীর সর্বকালের সকল মানুষের জন্য চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থারূপে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস প্রভৃতির মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মাধ্যমে ব্যবহারিক বিধানরূপে, সমস্যার

[১৮] . সূরা আন-নিসা-৫৯।
[১৯] . আবু দাউদ-৩৫৯২, তিরমিযী-১৩২৭, মুসনাদে আহমদ-২২০৬১।

সমাধানরূপে, বিচারালয়ে ফয়সালারূপে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে অতুলনীয় ব্যবস্থারূপে তার ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করতে থাকে। ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের নানা বিধানে কিছু বৈচিত্র ইসলামের বিশালত্ব ব্যাপ্তি ও কালজয়ী গুণেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রায়োগিক বিধানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তথা বিস্তারিত ফিকহ রচনার সময়ও মুজতাহিদ আলেমগণের পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি ও নির্বাচন এ ধরনের বৈচিত্র ফুটে ওঠে। শরীয়তে চিন্তার এ বৈচিত্রকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে কুরআন মজীদ, সুন্নাহ, প্রথম যুগের প্রচলন, সাহাবীদের ঐকমত্য আর পূর্ববর্তী নজির অনুসরণ। এসব মূলনীতি বিশ্লেষণ করেই আপেক্ষিক বিষয়ের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর এ ইজতিহাদী তত্ত্বের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে ইসলামের চার মাযহাব সম্বলিত ব্যবহারিক ফিকহ।

সাহাবায়ে কেরামের মতবৈচিত্রপূর্ণ কোনো বিষয় কিংবা সাহাবীদের যুগের পরবর্তী কোনো নতুন সমস্যার সমাধান নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। ফলে অসংখ্য মত ও মাযহাবের বৈচিত্র ছিল খুবই স্বাভাবিক, যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের সাথে মুসলিম জনসাধারণ সমধিক পরিচিত। এসব মাযহাবের কোনোটিই কুরআনসুন্নাহ - নোটিই এমন নয়বহির্ভূত নয় এবং কো, যার অনুসরণ করলে আমরা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী বলে গণ্য হব না। এমনকি একটি মাযহাবের ইমাম অপর মাযহাবের ইমামের এলাকায় বেড়াতে গিয়ে তার ফিকহ অনুসারেই আমল করেছেন এমন উদাহরণও ইমামদের জীবনে দেখা যায়। যেন আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে, মাযহাব কেবলই নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণের বিষয়।

কুরআনসুন্নাহ-, ইজমা ও কিয়াসের সমন্বয়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের বহুমাত্রিকতা থেকে একটি অবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম তারজীহ। আর এ প্রাধান্যপ্রাপ্ত সমাধানগুলোই হচ্ছে মাযহাবের বৈচিত্রপূর্ণ অংশ। অতএব মাযহাব মানা আর কুরআন কোনোই ফারাক খাসুন্নাহ মান্নার মধ্যে-কার কথা নয়। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানের পক্ষে মাযহাব অনুসরণ ছাড়া শরীয়তের উপর আমল করাও প্রায় অসম্ভব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি কোনো ব্যক্তি নিজেই শরীয়তের সকল শর্ত পূরণ করা একজন মুজতাহিদ হন তাহলে তিনি কোনো ইমামের মাযহাব অনুসরণ না করে নিজেই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করতে পারেন। তবে কুরআন হাদীসের অনেক মাণ্যবর পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদও এ ধরণের ঝুঁকি নেননি। এমন কি হাদীসের ইমামগণও যোগ্যতা থাকা সত্বেও নিজেরা একটি মাযহাব প্রবর্তন না করে তাঁরাও চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণ করেছেন। কেননা বিষয়টি শরীয়তের এক বা দুই শাস্ত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত মৌলিক সকল শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয়ে নবদীগন্তের দ্বার উন্মোচন করা চারটিখানি কথা নয়।

অতএব নির্দ্বিধায় আমরা স্বীকৃত মাযহাবগুলোর উপর আমল করতে পারি। কর্মসূচিগত ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য যেকোনো একটি মাযহাবকে বেছে নেওয়া জরুরি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মাযহাব অনুসরণ করলে প্রকৃতপক্ষে আমি কুরআনসুন্নাহই অনুসরণ - করলাম। আমি তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। আমি তখন আহলে কুরআন, আহলে হাদীস। আমিই তখন পূর্ববর্তী মুরব্বীদের অনুসারী। কেননা, এসব পথের মূল প্রেরণা আর মাযহাব সংকলনের প্রেরণায় কোনোই বিরোধ নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বোধ ও উপলব্ধি দান করুন, আমীন।

তাকলীদ করা ওয়াজিব কেন?

তাকলীদ যে ওয়াজিব, এটা কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীছ, উম্মতের কর্মপন্থা ও তাফসীরকারকদের উক্তি সমূহ থেকে প্রমাণিত। সাধারণ তাকলীদ হোক বা মুজতাহিদের তাকলীদ হোক উভয়ের প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। নিম্নে এর কিয়দাংশ উপস্থাপন করা হল।

(১) اِهْدِ نَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত কর। ওনাদের পথে যাঁদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ । [২০]

এখানে সোজা পথ বলতে ওই পথকে বোঝানো হয়েছে, যে পথে আল্লাহর নেক বান্দাগণ চলেছেন। সমস্ত তাফসীর কারক, মুহাদ্দিছ, ফিকহবিদ ওলীউল্লাহ গাউছ কুতুব ও আবদাল হচ্ছেন আল্লাহর নেক বান্দা। তারা সকলেই মুকাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন। সুতরাং তাকলীদই হলো সোজা পথ। কোন মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও ওলী লামাযহাবী হলো ঐ -মাযহাবী ছিলেন না। লা-ব্যক্তি যে মুজতাহিদ না হয়েও কারো অনুসারী নয়।

(২) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ তা'আলা কারো উপর ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পন করেন না"[২১]

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল,আল্লাহ তা'আলা কারো উপর সাধ্যাতীত কার্যভার চাপিয়ে দেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করতে পারে না, কুরআন থেকে মাসাইল বের করতে পারে না, তার দ্বারা তাকলীদ না করিয়ে প্রয়োজনী সমস্যার সমাধান বের করানো তার উপর ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যভার চাপানোর নামান্তর। যখন গরীবের উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয নয়, তখন অজ্ঞ লোকের মাসাইল বের করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে কি?

(৩) وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

"যে সকল মুহাজির এবং আনসার অগ্রগামি যারা প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা সৎ উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীদের অনুগামী হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"[২২]

---

[২০]. সূরা আল-ফাতিহা-৫,৬।
[২১]. সূরা আল-বাক্বারাহ-২৮৬।
[২২]. সূরা আত-তাওবাহ-১০০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বোঝা গেল যে, যারা মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণ বা তাকলীদ করেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট। এখানেও তাকলীদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৪) أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানকারী রয়েছে তাদেরও।" [23]

এ আয়াতে তিনটি সত্তার আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যথা- (১) আল্লাহর (কুরআনের) আনুগত্য, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (সুন্নাহর) আনুগত্য এবং (৩) ফিকাহবিদ মুজতাহিদ আলিমগণের আনুগত্য। লক্ষণীয় যে, উল্লেখিত আয়াতে করীমায় أطيعوا (আনুগত্য কর) শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। মহান আল্লাহর জন্য একবার আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আদেশ প্রদানকারীগণের (মুজতাহিদ ফিকাহবিদ) জন্য একবার। এর রহস্য হল আল্লাহ যা হুকুম করবেন তাই কেবল পালন করতে হবে। আল্লাহর আমল বা নীরবতার ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবেনা। তিনি কাফিরদেরকে আহার দেন, কখনও কখনও তাদেরকে বাহ্যিকভাবে যুদ্ধে জয়ী করান। তারা কুফরী করলেও সাথে সাথে শাস্তি দেন না। এ সব ব্যাপারে আমরা আল্লাহকে অনুসরণ করতে পারি না। কেননা এতে কাফিরদেরকে সাহায্য করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুজতাহিদ ইমামের প্রত্যেকটি হুকুমে, প্রত্যেকটি কাজে, এমন কি যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করেন, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তাদের আনুগত্য করতে হয়। এ পার্থক্যের জন্য أَطِيْعُوا শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। যদি কেউ বলে যে, উলুল আমর দ্বারা ইসলামী শাসন কর্তাকে বুঝানো হয়েছে। এতেও উপরোক্ত বক্তব্যে কোন রূপ তারতম্য ঘটবেনা। কেননা শুধু শরীয়ত সম্মত নির্দেশাবলীতেই শাসনকর্তার আনুগত্য করা হবে, শরীয়ত বিরোধী নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে আনুগত্য করা হবে না। ইসলামী শাসনকর্তা হচ্ছেন কেবল হুকুম

[23]. সূরা আন-নিসা-৫৯।

প্রয়োগকারী। তাঁকে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম মুজতাহিদ আলিমগণের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। দেখা যাচ্ছে, আসল আদেশ প্রদানকারী হচ্ছেন ফিকহবিদ। ইসলামী সুলতান ফিকহবিদ আলিমের বর্ণিত অনুশাসন জারী করেন মাত্র। সমস্ত প্রজাদের হাকিম বাদশাহ হলেও বাদশাহের হাকিম হচ্ছেন মুজতাহিদ আলিম। শেষ পর্যন্ত হলেন মুজতাহিদ (ল আমরউলি) أُولِى الْأَمْرِ বলতে যদি কেবল ইসলামী বাদ (উলীল আমর) أُولِى الْأَمْرِ আলিমগণই শাহ ধরে নেয়া হয়, তাতেও তাকলীদ প্রমাণিত হয়। আলিমের না হলেও অন্ততঃ বাদশাহের তাকলীদতো প্রমাণিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াতে আনুগত্য বলতে শরীয়তের আনুগত্য বোঝানো হয়েছে।

(৫) فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"হে লোক সকল তোমাদের যদি জ্ঞান না থাকে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" [24]

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, যে বিষয়ে অবহিত নয়, সে যেন সে বিষয়ে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নেয়। যে সব গবেষণালব্ধ মাসাইল বের করার ক্ষমতা আমাদের নেই, ঐগুলো মুজতাহিদগনের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। সুতরাং যে বিষয়ে আমরা জানি না, সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা একান্ত প্রয়োজন।

(৬) وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ

"যিনি আমার দিকে রুজু করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরন (আল্লাহর দিকে) কর।" [25]

এ আয়াত থেকে এও জানা গেল, আল্লাহর দিকে ধাবিত ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ করা আবশ্যক। এ হুকুমটাও ব্যাপক (তাকলীদ), কেননা আয়াতের মধ্যে বিশেষত্ব জ্ঞাপক কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

[24]. সূরা আল-আম্বিয়া-৭।
[25]. সূরা লুকমান-১৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৭) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"এবং তাঁরা আরয করেনআমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের !হে আমাদের প্রভু - দ্বারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের ইমাম বানিয়ে দাও।"[২৬]

তাফসীরে মাআলিমুত তানযীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। فَنَقْتَدِىْ بِالْمُتَّقِيْنَ وَيَقْتَدِى بِنَا الْمُتَّقُوْنَ অর্থাৎ যাতে আমরা পারহেযগারদের অনুসরণ করতে পারি, আর পারহেযগারগণও আমাদের অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করতে পারেন। এ আয়াত থেকেও বোঝা গেল যে, আল্লাহ ওয়ালাদের অনুসরণ বা তাকলীদ করা একান্ত আবশ্যক।

(৮) فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

"সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে তাদের প্রত্যেক গোত্র হতে একটি দল ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বের হয়ে পড়তো এবং ফিরে এসে নিজ গোত্রকে ভীতি প্রদর্শন করতো। যাতে গোত্রের অন্যান্য লোকগণ মন্দ, পাপ কার্যাবলী থেকে দুরে সরে থাকতে পারে।"[২৭]

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল প্রত্যেকের মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সবার এ যোগ্যতাও নাই। কেউ কেউ ফিকহবিদ হবেন, অন্যরা কথায় ও কর্মে তাঁদের অনুসরন করবে।

(৯) وَلَوْرَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ

"এবং যদি এ ক্ষেত্রে তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আদেশদানকারী যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি রুজু করতো তাহলে নিশ্চয় তাদের মাঝে

[২৬]. সূরা আল-ফুরক্বান-২৫।
[২৭]. সূরা তাওবাহ-১২২।

যারা সমস্যার সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখেন, তাঁরা এর গুঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন।"[২৮]

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হাদীছ, ঘটলাবলীর খবর ও কুরআনের আয়াত সমূহকে প্রথমে মুজতাহিদ আলিমদের কাছে পেশ করতে হবে। এরপর তাঁরা যে রকম বলবেন, সে ভাবে আমল করতে হবে। শ্রুত খবর থেকে কুরআনহাদীছের- স্থান অনেক উর্ধে। সুতরাং উহাকে মুজতাহিদের কাছে পেশ করা দরকার।

(১০) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

"যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ ইমাম সহকারে ডাকবো" ।[২৯]

তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে-

اَوْ مُقَدَّمٍ فِى الدِّيْنِ فَيُقَالُ يَا حَنَفِىُّ يَا شَافِعِىُّ

"কিংবা ইমাম হচ্ছেন ধর্মীয় পথের দিশারী, তাই কিয়ামতের দিন লোকদিগকে "হে হানাফী, ওহে শাফেয়ী" বলে ডাকা হবে।"[৩০]

এ থেকে বোঝা গেল, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইমামের সাথে ডাকা হবে। এখন প্রশ্ন হলো, যে ইমাম মানেনি, তাকে কার সাথে ডাকা হবে? এ সম্পর্কে সুফীয়ানে কিরাম বলেন যে, যার ইমাম নেই, তার ইমাম হলো শয়তান।[৩১]

(১১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ

"এবং যখন তাদেরকে বলা হয় -'তোমরা ঈমান আন, যেরূপ সত্যিকার বিশুদ্ধ চিত্ত মু'মিনগণ ঈমান এনেছেন। তখন তারা বলেআমরা কি বোকা ও - বেওকুফ লোকদের মত বিশ্বাস স্থাপন করব? "[৩২]

[২৮]. সূরা আন-নিসা-৮৩।
[২৯]. সূরা বনি ইসরাঈল-৭১।
[৩০]. তাফসীরে কুরতুবী-১০/২৯৭, তাফসীরে রূহুল বয়ান-৫/১৮৭।
[৩১]. তা'য়ীদুল হাকিকাতিল উলিয়া লিস-সুয়ূতী।
[৩২]. সূরা আল-বাকারাহ-১৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বোঝা গেল যে, ঐ ধরনের ঈমানই গ্রহনযোগ্য, যে ঈমান নেক বান্দাগণ পোষণ করেন। অনুরূপ, মাযহাব ওটাই যেটার অনুসারী হচ্ছে নেক বান্দাগণ। উহাই হলো তাকলীদ।

চার মাযহাবের কারণঃ

সুহৃদ পাঠক সমাজ ইতিপূর্ব আলোচনা দ্বারা মাযহাবের সৃষ্টি ও তাকলীদ সংক্রান্ত বিষয়ে অবশ্যই অবগত হয়েছেন। এ পর্যায়ে চার মাযহাব সৃষ্টির কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করব যে, অবস্থার প্রেক্ষাপট ও উদ্ভাবিত সমস্যার আলোকে কুরআন হাকিম যেহেতু সমস্ত মৌলিক ও ব্যাপক নীতি সম্বলিত তেইশ বছর নবুয়্যাতি জিন্দেগীতে হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নাযিল হয়েছিল, যার প্রত্যেক আয়াতই সার্বজনীনতা সর্বকালীনতা ও ব্যাপকতা ঘোষণা করে। পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৬৩ বছর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও অবিসংবাদিত বাক্য, কর্ম, গ্রহণ, বর্জন, মৌনতা ইত্যাদি কুরআনী সমমর্যাদায় বিবেচিত।

সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর অস্তিত্ব, সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ, একথা প্রকাশের প্রধান উৎস ও সূত্র হচ্ছেন- নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ বিশেষ করে হুযুর সৈয়দুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের প্রত্যেককেই স্বজাতি পরিচালন নীতিমালা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যুগে যুগে সময়ের প্রেক্ষাপটে কোন জাতির মাঝে তাদেরকে আল্লাহর পথে আনয়নে একজন নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামকে অনন্য প্রকৌশলী (নবী রাসূল আলাইহুমস সালাম) হিসাবে গণমানুষের হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন; কিতাব সহিফা প্রদান করে। মানব জাতির হিদায়তে সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হয়েছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। পবিত্র কুরআনে র ভাষায় শেষ রাসূল হচ্ছেন হাবীবে দোজাঁহা সরওয়ারে আলম জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; অর্থাৎ হিদায়তের সিলসিলা বা ধারার শেষ হচ্ছেন হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অতএব প্রমাণিত যে, কুরআনে হাকীম হচ্ছে নকশা আর প্রকৌশলী হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁর সুন্নাহসমূহ (কথন-কর্ম-মৌনতা) হলো নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই নুবুয়্যাত-রিসালতের ধারা তথা আল্লাহর আইন নীতিমালা পাঠাবার ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতঃপর

চারশত হিজরী সনের পরে এসে আজকে কেউ যদি যুগের চাহিদার অজুহাতের কথা বলে শরীয়তে ইসলামী বা ফিকৃহে ইসলামীকে নিজের মনের মত রচনা করতে চায় তাহলে তা' বাতুলতা ছাড়া বৈকি। যেহেতু নুবুয়্যাত বা রাসূল প্রেরণের ধারার পরিসমাপ্তি ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ সনের এপ্রিলের প্রথমেই হয়ে গিয়েছে।

উপরোক্ত নীতিমালা বা বক্তব্য আমার নিজের বানানো নয়; স্বয়ং কথিত নক্শা বা কুরআন হাকিমই ঘোষণা করছে যে, "ঐ প্রকৌশলী রাসূলের একনিষ্ঠ সহচর (আনসার ও মুহাজির) বৃন্দ যাঁরা অগ্রগামী, সর্বপ্রথম ঈমানের ছায়াতলে যাঁরা আসেন এবং যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করেছেন"। [৩৩]

এই আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও "দু'টি দলের' কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রথম দলটি ইসলামী ফিকৃহের মূল দুই উৎস কুরআন ও সুন্নাতে নববীর ক্ষেত্র ও স্থান নির্ধারণ করতঃ ঐ দুইটি উৎসের আলোকে আইন রচনা করেছেন মুহাজির ও আনসারদের প্রথম শ্রেণী ছিলেন এই দলের কেন্দ্রীয় শ্রেণী। অতঃপর দ্বিতীয় দলটির স্থান। যাঁরা নিষ্ঠা ও সততার সাথে প্রথম দলের এমনভাবে অনুসরণ করেছেন যা প্রথম দল কর্তৃক স্থির করে দিয়েছেন তাকে দ্বিতীয় দল সনদ হিসাবে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রথম দলের স্থিরকৃতকে দলিল হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। আল্লাহু আকবর! এ দু শ্রেণীর প্রশংসা একই আয়াতে কালামে রাব্বানিতে ইরশাদ হয়েছে যে, "তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রতি সন্তুষ্ট।" [৩৪]

মূলতঃ কুরআনে হাকিমের ভাষায় এ দু শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও বড় গ্যারান্টি। বিশেষ করে আল্লাহর ভাষায় এ দু শ্রেণী যে, "আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট" বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা তাঁদের প্রকৃতি ও আল্লাহর আইনের-প্রকৃতির মধ্যে যে চমৎকার সামঞ্জস্য ও সমতা রয়েছে; ঐ একই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত। তারই ভিত্তিতে ফকিহ্গণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহচরগণের মধ্যে ঐ শ্রেণীদ্বয়ের জীবনকে সনদ-দলীল হিসাবে বিনা বাক্যে স্বীকার করে শরয়ী আইন প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁদেরও জীবন কর্ম মৌনতাকে 'সুন্নাতের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ঐ সুন্নাতকে গ্রহণ পালন অনুশীলন সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়া কোন কোন

---

৩৩. সূরা তাওবা আয়াত ১০০।
৩৪. সূরা তাওবা আয়াত ১০০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব অভিমত এর ভিত্তিতে বললেও তা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই বলেই তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডও সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ও গ্রহণ করা ওয়াজিব। কারণ তাদের অধিকাংশ কথা-কর্ম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে শ্রুত ও দেখা।

এছাড়া তাদের ইজতিহাদ এবং রায়ও সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট। এ কারণে যে, তাঁরা কুরআনে করীমার অবিসংবাদিত বাক্যসমূহের স্থান-কারণ-কাল অবতরণ ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈমানেও তারা অগ্রবর্তী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র সহচর্য এবং তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ লাভ করে ধন্য বলেই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে পাকের ঘোষণা; তাঁর ৬৩ বৎসর সময় কাল হচ্ছে "খায়রুল কুরূণ"। অতঃপর তাঁর পরবর্তী দুই জেনারেশনের যুগ সর্বোত্তম যুগ। কাজেই ঐ দুই কুরূণের রায় যদি এমন পর্যায়ে হয় যেখানে ক্বিয়াস করার কোন অবকাশ না থাকে; সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ ওয়াজিব এবং ক্বিয়াস পরিত্যাজ্য। হ্যাঁ পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে কুরআন সুন্নাহ্ অনুসৃত ক্বিয়াস গ্রহণযোগ্য ও ইসলামী ফিক্বহেও চতুর্থ উৎস হিসাবে বিবেচিত।

তাছাড়া কুরআনে হাকীমের ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি আয়াতের মধ্য হতে মাত্র ৫০০ আয়াত এবং ইল্‌মে হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার হতে মাত্র ৩০০০ হাজার হাদিস শরীয়তে ইসলামীতে মূলনীতি হিসাবে ব্যাপক ও সর্বব্যাপী সর্বাবস্থায় ন্যায় ও তার সামাপূর্ণ নীতিমালা সমভাবে কল্যাণ ও কার্যকর। এবং যা ফিক্বহে ইসলামীর মূলনীতি হিসাবে অটল। অপরিবর্তনীয় ও অসংশোধনযোগ্য এবং পরিবর্তিত ও নব উদ্ভাবিত প্রেক্ষাপটে ঐ ৫০০ আয়াত বা ৩০০০ হাজার হাদিস যদ্বারা আহকাম সাবিত হয়। (প্রকাশ থাকে যে, ৫০০ শত আয়াত এবং ৩০০০ সুনানে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্রমসংখ্যার মমার্থ হচ্ছে আয়াত বা হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থগত দিক বিবেচনায় অত্যন্তস্পষ্টভাবে আহকামে ইলাহী বা সুনানের রাসুলে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত হয়েছে। নয়তো পুরো কুরআনে হাকিম ও সুনানে রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জনগোষ্ঠীর জন্য সংবিধান অনন্য পাথেয় হিসাবে বিবেচিত।

অতএব আহকামের সংখ্যা ক্রম নির্ণয়ের বিষয়টি পাঠককুলে স্পষ্ট) ওইগুলোর উপর মুজতাহিদ সাহাবা তাবেয়ীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম গণের 'ক্বিয়াস' এবং এর উপর অপর জ্ঞান প্রজ্ঞা সম্পন্ন মুজতাহিদগণের তৎসময়ে

'ইজমা' বা ঐক্যমত্যই ফিক্বাহ ইসলামীর মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। তাই বলেই উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, উপরোক্তভাবে ৪০০ হিজরী সনের মধ্যে ফিক্বহে ইসলামী সম্পদনার যুগ সমাপ্ত হয়েছে। ঐ ৪০০ শত হিজরীর পর হতে মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্তশুধুমাত্র তাকলিদ ও ইজতিহাদ ফিল মাসাইল শরীয়তে ইসলামীতে গ্রহণযোগ্যতার অবকাশ রাখে। এর বিপরীতে সর্বৈব বাতুলতা জ্ঞানপাপীদের গোমরাহী মূর্খতা এবং নিজকে মূলহিদ কাফির হিসাবে গণ্য ও চিহ্নিত করারই বহিঃপ্রকাশ।

মোদ্দাকথা হলো, ইসলাম ধর্মের শরীয়াহ্ আইন তথা ফিক্বহ ইসলামী ইমাম মুজতাহিদ কর্তৃক সম্পাদনা ও ইজতিহাদ করে শরীয়তে ইসলামী কি পদ্ধতিতে অনুশীলন করবে, একজন মুসলমান তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত তার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীক জীবন কিভাবে পরিচালনা করবে বা করতে হবে এবং কিভাবে স্বীয় জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শের মূর্তপ্রতীক হবে তা মাযহাব বা ধর্মমত নামক নির্দিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ করতঃ উম্মতে মুহাম্মদীকে ক্বিয়ামত অবধি চিরকৃতার্থ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কথিত আহলে হাদীস নামক জ্ঞানপাপী লোকেরা বলে থাকে যে, হাদীসে আছে আমল করতে অসুবিধা কি? তাদেরকে বলতে চাই যে, হাদীসে অনেক কিছুই আছে যেমন উঠের পেশাব খাওয়ার কথাও হাদীসে আছে। দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথাও হাদীসে আছে। নাতিনকে কাঁধে উঠিয়ে নামায পড়ার বিষয়ও হাদীসে আছে। যেকোন চামড়া দাবাগত করলে পবিত্র হয় বলে হাদীসে আছে। নারী-পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যা হাদীসে আছে তবে হিজড়ার বিষয়ে উল্লেখ নাই। সন্তানকে দুধ পান করালে মায়ের ওযু ভাঙ্গবে কিনা এ ব্যাপারে হাদীসে কিছুই উল্লেখ না।

এমতাবস্থায় আহলে হাদীস নামক ভ্রান্তবাদীদের কাছে একান্ত জিজ্ঞাসা যে, হাদীসে আছে হেতু তারা কি উটের পেশাব খেতে রাজি আছে? দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা হাদীসে হেতু তারা কি তাদের মা-বোনদেরকে দাঁড়িয়ে পেশাব করাবে? হাদীসে আছে হেতু তারা কি নাতিনকে কাঁধে নিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে আসবে? শুকর ও ককুরের চামড়াও কি দাবাগত করলে পবিত্র হিসেবে সেগুলোর উপর নামায পড়বে? হিজড়াকে কত কাপড়ে কাফন দিতে হবে হাদীস থেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবে? সন্তানকে দুধপান করালে মায়ের ওযু সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত দিবে? বিমানে নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে কিছু বলতে পারবে? মূলতঃ কোন একজন মুজতাহিদ ফকীহ এর অনুসরণ ছাড়া সত্যিকারের মু'মিন মসলমান হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

মূলত শয়তান মুসলমানদেরকে সত্য বিমুখ করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করে। শয়তানের কৌশলের মধ্যে একটা শক্তিশালী কৌশল হলো সুন্দর নাম চয়ন করা। যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়। তন্মধ্যে শয়তানের প্রথম ষড়যন্ত্র হলো শিয়া সম্প্রদায়। আহলে বাইতের মুহাব্বতের নামে আসহাবে রাসূলকে গালী দেয়া, হযরত আলী (র.) এর ভক্তির নামে শাইখানকে লানত দেয়া, হযরত ফাতেমা যাহরার অনুসরণের নামে হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসাকে গালি দেয়া। এর পরে আরেক ষড়যন্ত্র হল আহলে কুরআন নাম দিয়ে। তাদের কাজ হলো কুরআনের অনুসরণের নাম দিয়ে হাদীসকে অস্বীকার করা। শয়তানে সর্বাধুনিক ষড়যন্ত্র হল বর্তমান যুগের লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদ। আহলে হাদীস নাম ধারণ করেছে ফিকহ ও ফুকহায়ে কেরামের বিরুধীতা করার জন্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রকাশ থাকে যে, সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন বা আইম্মাহ্ মুজতাহিদিন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক স্বীকৃত-অনুসৃত ইসলাম ধর্মে 'মাযহাব' বা ধর্মমত নামক নির্দিষ্ট অবকাঠামো সম্পাদনা ও ইজতিহাদ প্রেক্ষিতে কিয়ামত পর্যন্ত নতুনভাবে ইজতিহাদ বা নতুন মাসআলা সম্পাদনা বা নতুনভাবে মুজতাহিদ হওয়ার স্বপ্ন বন্ধ ও ভঙ্গ এবং অবৈধ ও পরিত্যাজ্য। শুধুমাত্র কোন এক মাযহাবের তাকলিদই ওয়াজিব যুক্তিসঙ্গত কারণ এই লিখাতে উপরে বর্ণিত হয়েছে।

তারপরেও প্রসঙ্গত কুরআনে হাকিমের সূরা নিসার আয়াত তিরাশিতে মাযহাব অস্বীকারকারীদের আল্লাহ্ জাল্লাহ্ শানুহু শয়তান ইবলিসের অনুসারী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। নিম্নে আয়াতে কারীমা এর মর্মার্থ পাঠক খেদমতে পেশ করা হলো। যাতে মাযহাব অনুসরণের গুরুত্ব তাৎপর্য এবং অস্বীকারকারীদের ভৎসনায় এরশাদ হয়েছে- 'আর যখন তাদের নিকট বিজয় কিংবা পরাজয়ের কোন সংবাদ আসতো তখনই তা' চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দায়িত্বশীল লোকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত হয়, যারা তাদের মধ্যে নিগুঢ় তথ্য উদঘাটনের যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর

অনুগ্রহ ও দয়া না হত তাহলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের অনুসারী হতে।[৩৫]

মূলতঃ দূর্বল বা ঐ বিষয়ে অবুঝ লোকেরা বিভ্রান্তির কারণ হয়: কারণ মুসলমানদের বিজয়ে কাফিরদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় আর কাফিরদের পরাজয়ের সংবাদে মুসলমানরা নিরুৎসাহিত হন। তবে হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু নিছক জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতার অভাবের কারণে হয় এবং নিসন্দেহে বলা যায় যে, এ কর্মগুলো জ্ঞান, দূর্দৃষ্টি ও বিচারবোধে শীর্ষ সাহাবীগণ দ্বারা হতো না। প্রজ্ঞায় বিচক্ষণতায় যেমন কেউ কোনদিন মেডিকেল কলেজ পর্যন্তও মাড়ায়নি সে কখনো চিকিৎসা শাস্ত্রের পথ্য বিষয়ে জানতে বলতে পারবে না এবং তার কথামত কেউ ঔষধ সেবন করলে রোগী অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে) তখন তারা প্রচার করে বেড়াতো বা রটিয়ে দিত যদি সেক্ষেত্রে তারা সেটা প্রচার না করে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নিজেদের প্রজ্ঞাবান সুপণ্ডিত পরিণামদর্শী বিচারবোধে ক্ষমতা সম্পন্ন সাহাবীগণের গোচরে আনত এবং দুর্বলতাবশতঃ নিজেরা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি না খাটায়ে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের শরণাপন্ন হলে তবে নিশ্চয়ই তাদের নিকট হতে সেটার বাস্তবতা জানতে পারতো, (জ্ঞান-প্রজ্ঞা বা আয়াতে করিমার অবতরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে অবগতির কারণে তাঁরা ক্বিয়াস করে আবর্তিত আয়াতের হুকুম তৎসময়ের জন্য না তৎপরবর্তী কোন্ যুগের জন্য।

কেননা কুরআন হাকীমের প্রত্যেকটা আয়াতই সার্বজনীনতা সর্বকালীনতা ঘোষণা করে। এ ছাড়া অন্যতম কারণ এইযে, ঐ সকল মুজতাহিদ সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সকল ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীক জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলেন। ফলে তাঁরা অনুসন্ধান করে সমতাপূর্ণ আবর্তিত আয়াতের রহস্য কি, প্রচারে উত্তম হবে, না চুপ থাকা শ্রেয় হবে। তা কুরআন হাদীস অনুসৃত এবং তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা অনুমান তথা ক্বিয়াস করে বলে দিতেন) যারা পরবর্তী প্রচেষ্টা চালায় এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত না হতেন) এবং তাঁর দয়া না হত: (কুরআনে হাকীম অবতীর্ণ না হত) তবে অবশ্যই তোমরা শয়তানের অনুসরণ আরম্ভ করতে। অর্থাৎ কুফর ও ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে থাকতে। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা তোমাদের উপর

---

[৩৫]. সূরা আন-নিসা-৮৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ শুরু করতে।

মূলতঃ ফিক্বহে ইসলামী সম্পাদনার যুগ ৪০০ শত হিজরীর ভিতরে সীমাবদ্ধ হলেও উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার আলোকে ঐ চারশত হিজরীর মধ্যে মাযহাবের ইমামদের স্তরের মত যোগ্যতা সম্পন্ন ইমাম মুজতাহিদগণ ঐ সময়েও এর পরবর্তী হিজরীগুলোতে ছিলেন। কিন্তু নিজস্ব কোন মাযহাব সৃষ্টি না করে ঐ ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবের তাকলিদ বা অনুসরণ করেছিলেন বেশি সংখ্যক আলেমে দ্বীন, হাদীস ফিক্বাহ বিশারদগণ; এবং তা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল ঐ আয়াতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও করুণা এর চাদরে আবৃত থাকার কারণে। মহান আল্লাহ্ আমাদের ইমাম চতুষ্ঠেয় মাযহাব হতে যে কোন একটির অনুসরণের তৌফিক দিন। আমিন। মাযহাব কি ও কেন ও অনুশীলন প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে স্ববিস্তার আলোচনা সম্বলিত পৃস্তক বেরাদরানে ইসলামের খেদমতে অচিরেই পেশ করার আশা করছি। ইন্-শা আল্লাহ।

গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী সালাফীরা এ উম্মতের মহা ফেতনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে ইংরেজদের শাসনকাল পর্যন্ত কোন গায়রে মুকাল্লিদ ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জমানায় কোন গায়রে মুকাল্লিদ ছিলনা। হয়ত মুজতাহিদ নতুবা মুকাল্লিদ। তেমনি সাহাবাদের আমলে কোন গায়রে মুকাল্লিদ ছিলনা। হয়ত মুজতাহিদ নতুবা মুকাল্লিদ ছিলেন। এমনিভাবে তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী এমন কি ব্রিটিশদের ভারত শাসন পর্যন্ত কোন গায়রে মুকাল্লিদ ছিলনা। পূর্ববর্তীদের মাঝে ছিল দু'টি দল। একদল ছিল মুজতাহিদ। বাকিরা সকলেই ছিলেন মুকাল্লিদ। কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশ দখল করার পর আমাদের উপমহাদেশে ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টির নিমিত্তে যেই সকল কথিত ধর্মীয় ফিরক্বা সৃষ্টি করেছে তাদের মাঝে অন্যতম হল এই গায়রে মুকাল্লিদ বা কথিত আহলে হাদিস দল। যাদের মূল কাজই হল মানুষের মাঝে ধর্মীয় বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশাল হাদিস ভান্ডারকে অস্বিকার করার জন্য কেবল বুখারী মুসলিম আর ক্ষেত্র বিশেষে

কেবল সিহাহ সিত্তার হাদিস মানা। এই দাবির মাধ্যমে মুয়াত্তা মালিকের মত স্বীকৃত সহীহ হাদিসের কিতাবসহ অসংখ্য হাদিসের কিতাবের সহীহ হাদিসকে অস্বিকার করার এক ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছে এই দলটি।

চার বরহক মাযহাবকে কলুষিত করার এক নীল নকশা নিয়ে মাঠে নেমেছে এই দল। বিশেষ করে ফিক্বহে হানাফীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা তাদের মূল টার্গেট। নানাভাবে ইমাম আবু হানীফা কুফী (র.)-কে এবং ফিক্বহে হানাফীর কুৎসা রটাতে তারা সীদ্ধহস্ত।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল-কুফাবাসীর সমালোচনাকারীরা বুখারী শরীফের একটি পৃষ্ঠাও দেখাতে পারবেনা,যাতে কুফী বর্ণনাকারী নাই। আমরা গোটা গায়রে মুকাল্লিদ গোষ্ঠিকে চ্যালেঞ্জ করে বলি, আমাদের সামনে স্রেফ এক রাকাত নামায তাকবীরে তাহরীমা থেকে নিয়ে সালাম পর্যন্ত প্রতিটি রুকন পড়ে দেখাও যার প্রতিটি সূরত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

এই উম্মতের বর্ধিত বাতিল ফিরক্বা হল কথিত আহলে হাদীস গ্রুপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

অর্থাৎ "তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আর এই উম্মতে মুসলিমা অচিরেই তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। বাহাত্তর ফিরক্বা হল জাহান্নামী আর একটি ফিরক্বা হল জান্নাতী। জান্নাতী সেই একমাত্র দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।[৩৬]

আর উম্মতে মুহাম্মদীতে বাহাত্তর ফিরক্বাতো পূর্ব থেকেই আছে। যাতে একাত্তর ফিরক্বা হল জাহান্নামী আর এক ফিরক্বা হল জান্নাতী। সুতরাং জান্নাতী ফিরক্বা পূর্ব থেকেই আছে আর ৭১ জাহান্নামী ফিরক্বাও পূর্ব থেকেই আছে। সুতরাং কেবল জাহান্নামী একটি ফিরক্বা উম্মতে মুহাম্মদীতে বাড়বে। যেটা পূর্বে

[৩৬]. সুনান আবু দাউদ-৪৫৯৭, ইবনু মাজাহ-৩৯৯৩, মুসনাদে আহমদ-১২৪৭৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিলনা। এই দলটা কারা? আল্লামা কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরে কুরতুবীতে লিখেন-

هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّتِيْ زَادَتْ فِيْ فِرَقِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُمْ قَوْمٌ يُعَادُوْنَ الْعُلَمَاءَ وَ يُبْغِضُوْنَ الْفُقَهَاءَ ، وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَطُّ فِي الْأُمَمِ السَّالِفَةِ.

অর্থাৎ- উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে বর্ধিত সেই তিয়াত্তর নম্বর ফিরকা হল তারাই, যারা উলামায়ে কেরামগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে আর ফুকাহায়ে এযামগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এই দলটি পুর্ববর্তী উম্মত সমূহে ছিল না ![৩৭]

আল্লাহ তায়ালা কতটা মর্যাদা দিয়েছেন ফুক্বাহায়ে কিরামকে, হাদীস কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা দেখলেই তা আমাদের বুঝে আসে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

হযরত আমর ইবনুল আস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বিশেষজ্ঞ হুকুম দেন, আর তাতে সে ইজতেহাদ করে তার পর সেটা সঠিক হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে, তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব।[৩৮]

ফুক্বাহা কাকে বলে? দ্বীনের বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বলে ফক্বীহ। ফুক্বাহাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার এতটাই মোহাব্বত যে, তাদের মাসআলা যদি ভুলও হয়, তবু তাদের গোনাহ হয়না, বরং তাদের একটি সওয়াব হয়। আর যদি মাসআলা সহীহ হয়, তাহলে সওয়াব হয় ডাবল। এটাই হল পন্থা। হয়ত এক নেকি। নতুবা দুই নেকি। গোনাহ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ইমাম আবু হানীফা রহ ১২ লাখ ৯০ হাজার মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁর ইস্তিম্বাতকৃত সব মাসআলাই ভুল। তাহলেও তাঁর ১২ লাখ

[৩৭]. তাফসীরে কুরতুবী-৭/১৪১।

[৩৮]. সহীহ বুখারী-৭৩৫২, সুনান আবু দাউদ-৩৫৭৪, জামে' তিরমিযী-১৩২৬, নাসায়ী-৫৩৮১, মুসনাদে আহমদ-৬৭৫৫।

৯০ হাজার সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর ইস্তিম্বাতকৃত একটি মাসআলাও ভুল নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-"একজন ফক্বীহ শয়তানের উপর একশত আবেদের চেয়ে বেশি কষ্টকর"![৩৯]

এই এই ফুক্বাহাদের সমালোচনা করে বেড়ায় গায়রে মুকাল্লিদরা ঠিক কার কাজটা করছে?

ফিক্বহ আক্বলকে বলে,সুতরাং ফিক্বহের যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ তায়ালা তার থেকে আক্বলকে ছিনিয়ে নেন। আল্লাপহ তায়ালা ফুক্বাহাদের উপর সন্তুষ্ট আর শয়তান রাগান্বিত।

শয়তান কেন নারাজ? কারণ হল দ্বীনের মাঝে তিনটি বিষয় ছিল। যাতে শয়তান হস্তক্ষেপ করার জন্য উদগ্রিব ছিল। যখন ওসব পথ বন্ধ করে দেয়া হল, তখন যারা বন্ধ করে দিল তাদের প্রতি শয়তান রেগে গেল।

প্রথম নাম্বার হল হাদীস সংরক্ষণের বিষয়। শয়তান চেয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসকে গড়বড় করে মিথ্যা হাদীসকে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে। তখন মুহাদ্দিসীনদের এক জামাত দাঁড়িয়ে গেল। যারা মেহনত করে হাদীস যাচাই বাছাই করার জন্য এমন কিছু মূলনীতি সাব্যস্ত করলেন, এবং তা সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা করলেন যে, সহীহ হাদীস বাতিল হাদীস থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এই কারণে শয়তান মুহাদ্দিসীনদের উপর রাগান্বিত।

আর দ্বিতীয় বিষয় হল-হাদীসের মূল অর্থকে সংরক্ষণ করা। আরবীতে এক শব্দের একাধিক অর্থ আছে। যেমন সালাত শব্দের অর্থ এক স্থানে নামায, আরেক স্থানে রহমত। আরেক স্থানে দরূদ ও সালাম। শয়তান চাইল এই সকল অর্থ মানুষ কোন স্থানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার সঠিক অর্থ মানুষ না জানলে বিভ্রান্ত হওয়া সহজ। নামাযের অর্থবোধক স্থানে বলা হবে দরূদ। দরূদের স্থানে রহমত ইত্যাদী। কিন্তু ফুক্বাহায়ে কিরাম তা হতে দেননি। তারা গবেষণা করে হাদীসের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

[৩৯]. ইবনু মাজাহ-২২২, মু'জামে কবীর-১১০৯৯, শুআবুল ঈমান-১৫৮৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় বিষয় হল একাধিক হাদীসের মাঝে বাহ্যিক যে বিরোধ রয়েছে তা নিরসন করে সঠিক অর্থ বের করা। কিন্তু শয়তান চাইল বিরোধপূর্ণ হাদীস নিজের অবস্থানে থাকলে মানুষ ভুল আমল করে বিভ্রান্ত হবে। তাই সে এটা কামণা করছিল যে, মানুষকে হাদীসের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে ফেলা হবে যে, হাদীস পরস্পর বিরোধী, সুতরাং কোন হাদীসই আমলযোগ্য নয়। কিন্তু ফুক্কাহায়ে কিরাম যখন পরস্পর বিরোধী হাদীসের মাঝে গবেষণা করে হাদীসের সঠিক অর্থ এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের মূল মাকসাদকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তখন শয়তান নারাজ হয়ে গেছে ফুক্কাহাদের উপর।

নবীজী সাঃ যখন কুরআনের ব্যাখ্যা করেন তখন তা হয় হাদীস। আর সাহাবায়ে কিরাম ও আয়িম্মায়ে দ্বীন যখন কুরআন সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করেন গবেষণা করে সেটা হয় ফিক্বহ।

সুতরাং যেহেতো শয়তানের একটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন মুহাদ্দিসীনরা। আর ফুক্কাহারা শয়তানের ২টি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাই শয়তান ফুক্কাহাদের উপর এতটা ক্ষ্যাপা। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদরা কেন ফক্বীহদের উপর এতটা রাগান্বিত শয়তানের মত?

সীরাতে মুস্তাকীমের অনুসারী কারা?

এক হাদিসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রেখা আঁকলেন। এক দাগ আঁকলেন সোজা। আর চারিদিকে কয়েকটি বাঁকা দাগ টানলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর ইরশাদ করলেন- "সোজা রাস্তায় যারা চলবে তারা হবে সফলকাম। আর যারা বাকি আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলবে তারা হবে ধ্বংস" । [৮৫]

গায়রে মুকাল্লিদরা বলে থাকে-সোজা রাস্তা হল কুরআন ও সুন্নাহ আর বাকি রাস্তা হল ইমামদের রাস্তা। আসলে এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। আমরা বলি- মূলত সোজা রাস্তাটি হল শরীয়তের চার দলিল মান্যকারীদের রাস্তা। অর্থাৎ

[৮৫] . ইবনু মাজাহ-১১, মুসনাদে আহমদ-৪১৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান-৬, সুনানে দারেমী-২০৮, মুসনাদে বাযযার-১৬৭৭।

যারা কুরআনও মানে। হাদিসও মানে। ইজমায়ে উম্মত ও মানে। আবার কিয়াসে শরয়ীও মানে। আর বাকি রাস্তাগুলি হল এগুলির অস্বিকারকারীদের রাস্তা। এক রাস্তা হল যারা কুরআন অস্বিকার করে। আরেক রাস্তা হল যারা হাদিস অস্বিকার করে। আরেক রাস্তা হল ইজমা অস্বিকার করে। আরেক রাস্তা হল যারা কিয়াসে শরয়ী অস্বিকার করে। সুতরাং এই সকল অস্বিকারকারীরা হল ঐ আঁকা বাঁকা পথের যাত্রী। চারটি বিষয়কেই যারা মানে তারা নয়।

আসলে তাক্বলীদ কাকে বলে?

আহলে হাদীসরা মিথ্যা প্রপাগান্ডা করে বেড়ায় যে, তাক্বলীদ বলা হয় "কুরআন হাদীস ছেড়ে দিয়ে আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর অনুসরণ করাকে বলা হয় তাক্বলীদ"। এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অপবাদ। মূলত তাক্বলীদ বলা হয় "শরীয়তের মাসায়েলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পথপ্রদর্শনে শরীয়ত অনুসরণ করাকে বলে"। আমাদের সংজ্ঞাটাই মূল সংজ্ঞা, গায়রে মুকাল্লিদেরটা নয়। নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায আদায় করলে কি নামায বা রুকু-সিজদা ইমামকে করা হয়? তাদের মতে তো ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায পড়লেও শিরক হয়ে যাবে। মূলতঃ কোনও ব্যক্তি নামাযকে অস্বিকার করলে সেতো নামাযের সংজ্ঞা বিকৃত করে করবেই। আর যে নামায পড়ে সে নামাযের সংজ্ঞা সঠিক করে করবে। তেমনি আমরা তাক্বলীদকে মানি। আর গায়রে মুকাল্লিদরা তাক্বলীদ অস্বিকার করে। তাই তাদের তাক্বলীদের সংজ্ঞা বিকৃত। সঠিক নয়।

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাক্বলীদ মানে হল-"শরীয়তের প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পথপ্রদর্শনে শরীয়তের অনুসরণ করা"। যেমন ইমাম এর পিছনে মুক্তাদীরা ইক্তিদা করে। ইমাম যখন তাক্বীর বাঁধে মুক্তাদিরাও বাঁধে। সকল রুকন পালনের ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করে। এখানে যেমন ইমামও আল্লাহর অনুসরণ করে ইবাদত করে,তেমন মুসল্লিও আল্লাহর অনুসরণ করে ইমামের অনুসরণ এর মাধ্যমে। ইবাদত মূলত আল্লাহর। কিন্তু বাহ্যিক অনুসরণ ইমামের। তেমনি আমরা ইবাদত করি আল্লাহর। কিন্তু বাহ্যিক অনুসরণ দেখা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায় ইমামে আজম আবু হানীফা রঃ। মূলত শরীয়তের জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ইমামে আযম আবু হানীফা রহঃ এর পথ প্রদর্শনে আমরা শরীয়তের অনুসরণ করি। মৌলিক অনুসরণ ইমামের নয়, শরীয়তের।

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- « أَمَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় তার ক্ষেত্রে আমার আশংকা হয় আল্লাহ তায়ালা তার মাথাকে গাধার মাথায় রুপান্তরিত করে দিবেন। [৪১]

কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামের অনুসরণ না করে আগে পরে রুকু সেজদা করে তাকে নবীজী সাঃ গাধা বলেছেন। সুতরাং ৫ বা ১০ মিনিটের ইমামের অনুসরণ ছেড়ে দিলে যেহেতো গাধা হয় তাহলে পূর্ণ শরীয়তের বিধানের অনুসরণে যারা ইমামে আযমের বিরোধিতা করে তারা হল বড় গাধা।

গাইরে মুকাল্লিদরা মূলত আহলে হাদীস নাম দিয়ে সুবিধাবাদের ধর্ম অনুসরণ করে। মুশরিকরা যেমন এক আল্লাহর তাওহীদের বিরুধীতা করতে গিয়ে অনেক কিছুকেই ইলাহ মনে করে গাইরে মুকাল্লিদরাও এক ইমামের অনুসরণের বিরুধীতা করে বহুজনকে অনুসরণ করে ফেলে। তারা তাদের সুবিধামত বিভিন্ন মাসআলায় বিভিন্ন মতের অনুরণ করে। ফলে দ্বীনকে তারা মনমত খেলনা বানিয়ে ফেলে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গায়রে মুকাল্লিদদের ফিতনাবাজী থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

বালেগ হওয়ার সময় ঃ

মানুষ পুরুষ বা নারী যখনই বালেগ হয়, তখনই তার উপর নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয হয়। নারী কমপক্ষে নয় বৎসর বয়সে, বেশীতে পনের বৎসর

[৪১]. সহীহ বুখারী-৬৯১, সহীহ মুসলিম-৪২৭, আবু দাউদ-৬২৩, তিরমিযী-৫৮২।

বয়সে বালেগ হয়। পুরুষ কমপক্ষে বার বৎসর বয়সে, বেশীতে পনের বৎসর বয়সে বালেগ হয়। শরীয়তের মধ্যে নর-নারী উভয়কে পনর বৎসর বয়সে বালেগ সাব্যস্ত করা হয়। বালেগ পরিচয় পাওয়া যাক বা না যাক। [৪২]

اَلْفَرْضُ ফরয:

কুরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলীল বা শরীয়তের নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা যা অবশ্য করণীয় ও অপরিহার্য্য বলে প্রমাণিত, যা করলে সাওয়াব পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু শরিয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয়া 'গুনাহে কবীরাহ্' (মহাপাপ) এবং অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা কুফ্‌রী তাই ফরয।

ফরয দু'প্রকার:

এক ॥ فَرْضُ عَيْنٍ .'ফরয-ই-আঈন'

দুই ॥ فَرْضُ كِفَايَةٍ ফরয্-ই-কিফায়া'।

ফরয-ই-আঈন: যা প্রত্যেকের উপর অবশ্য করণীয়। নিজে ব্যক্তিগতভাবে আদায় না করলে অন্য কারো দ্বারা তা সম্পন্ন করানো হলে নিজে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না। যেমন-নামায, রোযা।

ফরয-ই-কেফায়া: যা প্রত্যেকের উপর ফরয বটে; কিন্তু যে কারো দ্বারা তা সম্পাদিত হয়ে গেলে সমাজের সকলেই তা আদায় থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। যেমন নামাযে জানাযা, জিহাদ ইত্যাদি।

এক নজরে ১৩০ ফরযঃ

অধিকাংশ ওলামায়েকেরামের মতামতের ভিতিতে ১৩০ ফরযের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

ইসলামের পাঁচ রোকনে ৫ ফরয :

১। কালেমা।

[৪২]. আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া-৯/২৭৫, আল-বাহরুর রায়েক-৮/৯৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। নামায।
৩। রোযা।
৪। হজ্জ ও
৫। যাকাত।

চার কুরসীতে ৪ ফরয :
১। আব্দুল মানাফের পুত্র হাশেম।
২। হাশেমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিব।
৩। আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ ও
৪। আব্দুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চার মাযহাবে ৪ ফরয :
১। হানাফী মাযহাব।
২। শাফেয়ী মাযহাব।
৩। হাম্বলী মাযহাব ও
৪। মালেকী মাযহাব।

পাচ ওয়াক্ত নামজের নিয়তে ৫ ফরয :
১। ফজর।
২। যোহর।
৩। আসর।
৪। মাগরিব ও
৫। এশা।

পাচ ওয়াক্ত নামাজের সতেরো রাকআতে ১৭ ফরয :
১। ফজরের ২ রাকআত।
২। যোহরের ৪ রাকআত।

৩। আসরের ৪ রাকআত।
৪। মাগরিবের ৩ রাকআত ও
৫। এশার ৪ রাকআত।

ঈমানের ৭ ফরজ :
১। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।
২। তার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।
৩। আল্লাহর ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।
৪। আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা।
৫। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা।
৬। মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনা ও
৭। কিয়ামতের ওপর ঈমান আনা।

অজুতে ৪ ফরজ :
১। সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।
২। উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।
৩। মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ও
৪। উভয় পায়ের গিরাসহ ধৌত করা।

গোসলে ৩ ফরয :
১। কুলি করা।
২। নাকের ছিদ্রের ভিতরে পানি পৌছানো।
৩। সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করা।

পাচ কালিমায় ৫ ফরয :
১। কালিমায়ে তাইয়েবা।
২। কালিমায়ে শাহাদাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। কালিমায়ে তামজীদ।
৪। কালিমায়ে তাওহীদ ও
৫। কালিমায়ে রদ্দে কুফর।

তায়াম্মুমে ৩ ফরয :
১। নিয়ত করা।
২। সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা ও
৩। উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

নামাযের পূর্বে ৭ ফরয :
১। জায়গা পাক।
২। শরীর পাক।
৩। পোশাক পাক।
৪। সতর ঢাকা।
৫। সময় হওয়া।
৬। কেবলামুখি হয়ে দাড়ানো ও
৭। নিয়ত করা।

নামাজের ভিতর ৬ফরয :
১। তাকবীরে তাহরীমা ।
২। দাঁড়িয়ে নামায পড়া।
৩। নামাযের ভিতর কেরাত পাঠ করা।
৪। রুকুতে যাওয়া।
৫। সিজদা করা।
৬। আত্তাহিয়াতু পাঠ করার সময় বসা ও

ত্রিশ রোযায় ৬০ ফরজ :
ত্রিশ রোযায় ৩০ ফরয এবং
ত্রিশ রোযার নিয়তে ৩০ ফরয।

পবিত্রতার অধ্যায়:

বর্তমান সময়ে শরীর এবং স্থানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যে গুরুত্ব, রীতিমত গোটা বিশ্বে তার প্রতিফলনে দুষনমুক্ত পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে সরকারীভাবে অধিদপ্তর গঠন এবং তদারকীর জন্যে সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে পর্যন্তও ব্যস্ত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। সর্বোপরি বিশ্বের আনাচে কানাচে তার প্রতিপালনতার জন্যে 'বিশ্ব সংঘ' কর্তৃক বাৎসরিক পরিবেশ দিবসও বেশ ঝাকজমকের সাথে পালন করা হচ্ছে এসবের এক মাত্র উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজকে নিজের ও পারিপার্শ্বিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিয়ভাবে পরিচ্ছন্নতা-পরিবেশ দুষণতা ইত্যাদি হতে রক্ষা করা। হৃদয়-মন-মনন ও অবয়বকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কার্যকরী সচেতন করে তোলাই সব মহলের দিবস পালনের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু কিছু মহল মনে করে যে এ সমস্ত পরিচ্ছন্নতা পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব প্রাচ্য দেশে দূর অতীতে কখনো ছিলনা। বর্তমানে যা পরিচ্ছন্ন সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা পশ্চিমা সভ্যতা দেশেরই করুণা-অবদান। আসলে কিন্তু এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন। বাস্তবে পশ্চিমা দেশসমূহ এমন স্তরে পৌঁছতে পারেনি পারবেও না' যে স্তরে "ইসলাম" তার অনুসারীদের পৌঁছিয়েছে।

আমরা পরিচ্ছন্নতার অংশ কম বেশী প্রত্যেক ধর্মে (মনগড়া) দেখতে পাই। তাছাড়া প্রত্যেক গোত্রের ছোট বড় সকলেরই কাছে পরিচ্ছন্ন সচেতনতা বিদ্যমান। তবে হ্যাঁ দারিদ্রক্লিষ্ট ও অসভ্য জাতিদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা কম পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মান, আমেরিকান ইত্যাদি জাতি স্বঘোষিত সভ্য হিসাবে পরিচ্ছন্ন জাতি বলে মনে করা হয়। এবং নিজেও ঘর বাড়ি শহর ইত্যাদিকে কতই পরিচ্ছন্ন রাখে, কিন্তু শূকর কুকুর তো বটেই, এবং যেমন সর্ব নিকৃষ্ট অপবিত্র প্রাণী, যে প্রাণীর থাকা ও খাওয়া, লালন পালন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি অপবিত্র অবৈধ ও মহাপাপ; তারপরেও ওই নাপাক প্রাণীর গোশত ইত্যাদি ভক্ষনের ব্যাপারে কথা নেই বরং ঐ শ্রেণীর কাছে আভিজাত খাদ্য হিসাবে বিবেচিত। যেমন নেলসন ম্যান্ডেলার রাষ্ট্রপতি হিসাবে অভিষেক অনুষ্ঠানের ভোজনের পরিসংখ্যান বাংলাদেশের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাদের অপর নাপাক প্রাণী কুকুরের কথা বলার অবকাশ রাখেনা। এছাড়া ইয়াহুদী পাদ্রীদের অতীত ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, তারা এমনও পৃথিবীতে এসেছিল আবার বিদায়ও নিয়েছে যে, জীবনে একবারও গোসল পর্যন্তকরেনি।

সর্বোপরি হিন্দু সমাজের শাস্ত্র মত; না নিজস্ব মত জানিনা যে, গরুর গোবর দিয়ে খাবার ঘর না হলেও মুলঘর হলেও প্রত্যহ লেপন করে থাকে এ হচ্ছে বর্তমান সভ্য সমাজের সভ্য জাতির পরিচ্ছন্ন রীতিনীতি। তার পরেও পানি ব্যবহারের সামর্থ থাকতেও কাগজ দিয়ে মলমুত্র পরিস্কার, দাঁড়ায়ে প্রস্রাব পায়খানা ইত্যাদি পশ্চিমা সভ্যতার বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু এই সচেতনতা সৃষ্টির মুল অবদান ইসলামেরই। 'ইসলাম' মানবের জন্য এ ব্যাপারে প্রত্যেক ক্ষেত্র বিশ্লেষণপূর্বক কঠোর থেকে কঠোরতর এবং অতি সহজ সরল; নির্দেশ ও বিধানাবলী প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করেছে। অপবিত্রতার সামান্যতম ফাঁক ও ইসলাম রাখেনি। সবকিছু সম্পর্কে 'ইসলাম' পথ নির্দেশনা দিয়েছে এবং মানব সমাজকে পবিত্রতা সম্পর্কিত পরিচ্ছন্নতার উপকারীতা অপকারীতার হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরাধামে আসতেই ঘোষণা করলেন- 'ইসলামের ভিত্তি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপরই"। অতঃপর ঘোষণা হলো 'পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক'। [৪৩]

এভাবে অনেক জায়গায় ঈমানের ইসলামের পরিপূর্ণতা পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতাকেই ঘোষণা করেছে। সর্বোপরি কোরআনে হাকিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'পবিত্রানুরাগী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন মানবকে তিনি ভালবাসেন'। [৪৪]

পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এর চেয়ে বেশী আরো অধিক কিভাবে কোথাও কোন ধর্মপ্রবর্তক এভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে সুনানুল ফিতরাত বা প্রকৃতিগত সুন্নাত বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রকৃতিগত দশটি স্বভাব ঃ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ،

[৪৩]. সহীহ মুসলি-২২৩।
[৪৪]. সূরা তাওবা-১০৮।

وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষের দশটি প্রকৃতিগত স্বভাব, যথা ১. মোচ কর্তন করা, ২. দাঁড়ি বড় হতে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া, ৩. মেসওয়াক করা, ৪. নাকের ভিতর শ্বাসের সাথে পানি নেয়া, ৫. নখ কাটা, ৬. আঙুলের গিরা ধৌত করা, ৭. বগলের পশম উপড়ানো, ৮. নাভির নিম্নদেশে ক্ষৌরকর্ম করা, ৯. পায়খানা বা পেশাবের পর পানি ব্যবহার করা, ১০. (সম্ভবত) কুলি করা"। [৪৫]

হাদিসের শব্দ الْفِطْرَةِ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ শব্দটির নানা অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। খাত্তাবী বলেছেন, অধিকাংশ ওলামাদের মতে, এর অর্থ (মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন সুস্থ মানুষের) স্বভাব বা আভিধানিক সুন্নত। অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, الفطرة অর্থ নবীগণের সুন্নত। আর কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ দ্বীন বা ধর্ম।

জ্ঞাতব্য যে, হাদিসে বর্ণিত সবগুলো স্বভাব ওলামাদের মতে ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য নয়। কয়েকটির ব্যাপারে ওয়াজিব হওয়া না-হওয়া নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন-খতনা করা, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

قَصُّ الشَّارِبِ : মোচ কর্তন করা বা ছোট করা ; যাতে ঠোঁটের উপরের অংশ বের হয়ে যায়। ব্লেড বা ক্ষুর জাতীয় জিনিসের মাধ্যমে মোচ কর্তন করা বা চাছাকে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।

اللِّحْيَةِ : উভয় গাল ও থুতনিতে গজানো লোমকে দাড়ি বলে।

السِّوَاكِ : লাকড়ি বা লাকড়ি জাতীয় কোন জিনিসকে মুখ ও দাঁতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করা।

وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ : নাকের ভিতর শ্বাসের সাথে পানি টেনে নেয়া।

الْبَرَاجِمِ : হাতের আঙুলের পৃষ্ঠদেশের গিরা।

[৪৫]. সহীহ মুসলিম-২৬১, সুনানে আবু দাউদ-৫৩, জামে' তিরমিযী-২৭৫৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْعَانَةِ : ঐ সমস্ত লোম যা পুরুষাঙ্গের উপর ও তার দু'পাশে গজায়। তদ্রুপ নারীর যোনি বা গুপ্তাঙ্গের দু'পাশে যে লোম গজায়।

انْتِقَاصُ الْمَاءِ : প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

হাদিসের তাৎপর্য ও শিক্ষা :

১. ইসলাম পবিত্রতার ধর্ম। বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতার ধর্ম। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত স্বভাবসমূহ সুন্নত বা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর কিছু আছে ওয়াজিব-অবশ্য পালনীয়। আর কিছু আছে মোস্তাহাব- যা করলে সওয়াব হবে।

২. মোচ কাটা বা ছাটা এবং দাড়িকে যত্ন করা ও লম্বা করা বা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। এর মাধ্যমে মুসলমান অন্যদের থেকে স্বতন্ত্রতা লাভ করে, যার প্রমাণ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদিস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»

অর্থাৎ- "মুশরিকদের বিরোধিতা করো : দাড়ি লম্বা কর, মোচ ছোট কর"।[৪৬]

তাই, দাড়ি চাছা বা ছোট করা হারাম। মোচ মূল হতে উপড়ানো বা সেভ করা মাকরূহ।

৩. মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও অবশ্য কর্তব্য সুন্নত হলো মেসওয়াক করা। অর্থাৎ লাকড়ি বা এ জাতীয় অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য দাঁত ঘর্ষণ করা। অনেক হাদিসের ভিতর এ জন্য উৎসাহ প্রধান করা হয়েছে। যেমনঃআবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

অর্থাৎ- "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো, আমি প্রতি নামাজের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। অন্য বর্ণনায় আছে, প্রতি ওজুর সময়"[৪৭]।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

[৪৬]. সহীহ বুখারী-৫৪২২, সহীহ মুসলিম-২৫৯।
[৪৭]. সহীহ মুসলিম-২৫২, সুনানে আবু দাউদ-৪৭, জামে' তিরমিযী-২২।

«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»

অর্থাৎ- "মেসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও আলাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম"।[৪৮]

যে সমস্ত জিনিসের মাধ্যমে মেসওয়াকের কাজ আদায় হয়, তা এর অন্তর্ভুক্ত। কিছু কিছু সময় মেসওয়াক করা অতীব জরুরি। বিশেষ করে ওজুর সময়, নামাজের সময়, বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, কোরআন তিলাওয়াত করার সময়, ঘুম হতে উঠার পর, মুখের স্বাদ বিকৃত হলেইত্যাদি।

৪. অত্র হাদিসে নাকে পানি দেয়াকে সুন্নত উল্লেখ করা হয়েছে। ওজু-গোসলে তা ওয়াজিব, কারণ নাক চেহারার অন্তর্ভুক্ত। অপর দিকে যারাই রাসূল সা. এর ওজু বর্ণনা করেছেন, নাকে পানি দেয়াকে উল্লেখ করেছেন।

৫. নখ ছোট করা বা কাটা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে ময়লা জমে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হয়ে যায়। কখনো এমন পর্যায়ে পৌছে যে, ওজুতে পানি পৌছানো আবশ্যক এমন অংশে পানি পৌছোতে বাধার সৃষ্টি করে। আবার আমরা সবাই বাঁ হাতকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করি, সে ক্ষেত্রে নখ বড় থাকলে ময়লা লেগে হাত নষ্ট হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে।

৬. মানুষের শরীরে এমন কিছু অংশ আছে যেগুলো যত্ন সহকারে পরিষ্কার রাখতে হয়। যেমন হাতের পৃষ্ঠদেশে আঙুলের গিরা, সেখানে ময়লা জমে থাকার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এগুলোকে ভাল করে ধৌত করা ও পরিষ্কার করা জরুরি।

৭. আরো পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত : নাভির নীচের পশম মুন্ডানো ও বগলের নীচের পশম উপড়ানো। এর ভিতর হিকমত হলো এর দুর্গন্ধ হতে সৃষ্ট অনুভূতিগুলো নিঃশেষ করা বা হালকা করা। যাতে মুসলমানদের শরীরের ঘ্রাণ তার স্বভাবের মত পবিত্র তাকে। এখানে জেনে রাখা ভাল, বগলের পশম উপড়ানো জরুরি নয় বরং যে কোন জিনিসের মাধ্যমে দূর করাই যথেষ্ট।

৮. মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য পানির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। যাতে মলদ্বার ও পেশাবের স্থানে কোন ধরনের ময়লা না থাকে। কারণ পরিষ্কার ব্যতীত রেখে দিলে শরীর নাপাক হতে পারে। যার ফলে তার নামাজ বিশুদ্ধ না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

[৪৮]. সহীহ বুখারী-১৯৩৪,সুনানে নাসায়ী-৫, মুসনাদে আহমদ-৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. ইসলামি শিষ্টচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অপরকে সম্মান করা, ইজ্জত দেয়া, দুর্গন্ধের মাধ্যমে তাদের কষ্ট না দেয়া। সুতরাং, মুসলমানদের উচিত শরীরের ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করা। শরীর পরিষ্কার রাখা। তদুপরি শরীরকে দুর্গন্ধের মত বিরক্তিকর জিনিস হতে সংরক্ষণ করা বন্ধু-বান্ধব ও সাথি-সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবহারের শামিল। এ জন্য ইসলাম এ স্বভাবগুলোকে প্রকৃতিগত সুন্নতের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

১০. মুসলমান স্বীয় অবয়ব, বাহ্যিক পোশাক-আশাক এবং ভিতরে-বাহিরে এক অনন্য স্বতন্ত্রতা লালন করে। যেমন সে বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামকে পারঙ্গমতার সাথে অনুসরণকারী, তদ্রুপ সে বাহ্যিক শ্মশ্রুধারী, পরিমিত মোচ বিশিষ্ট ইসলামি আদর্শ বহনকারী। এর ভিত্তিতেই সে ইহুদি-নাসারা ও অগ্নিপূজকদের আদর্শের বিরুদ্ধবাদী তথা প্রতিবাদী ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে।

১১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾

অর্থাৎ- "তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি"। [৪৯]

আলাহ তাআলা মানুষকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, সে যেন এতে বিকৃতি আরোপ করে কুৎসিত না করে এবং এর সৌন্দর্য রক্ষায় যত্নবান হয়। বস্তুত এগুলো রক্ষা করা রুচিবোধের পরিচয়। কারণ, মানুষ যখন মার্জিত বেশ ভূষায় আত্মপ্রকাশ করে, অন্যান্য সকলে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত ও প্রফুল্ল থাকে। তার কথা গ্রহণ করে। এর বিপরীত হলে ফলাফলও বিপরীত হবে।

১২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ডান দিক প্রাধান্য দেয়া সুন্নত। সুতরাং নখ কাটার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে। মোচ ছোট করার সময় ডান পাশকে প্রাধান্য দেবে। এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করবে।

১৩. ওলামায়ে কেরাম উলেখ করেছেন, প্রয়োজন মোতাবেক নখ কাটবে, মোচ ছোট করে ছাঁটবে, নাভির নিচের পশম মুন্ডাবে ও বগলের পশম ওপড়াবে। নখ, মোচ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রেখে দিবে না-যাতে লম্বা হতেই থাকে। কেউ কেউ প্রতি জুমআতে এ সমস্ত আমল সম্পাদন করা মোস্তাহাব বলেছেন।

[৪৯]. সূরা আত-তাগাবুন-৩

কারণ, জুমআর দিন গোসল করা ও পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। তাছাড়া ইমাম সুয়ূতী (রহ.) লিখেছেন যে, শনি, রবি ও বুধবার হেজামত করলে শ্বেত রোগ হয়। অতএব, বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

তাছাড়া শুধু বাহ্যিক দিকের পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতার রীতিনীতি বিধানের কথা বলে 'ইসলাম' ক্ষান্ত হয়নি। মহান রাব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী রিয়াজাত মুশাহেদা ও সাধারণভাবে চলন-শয়ন-আহার-নিদ্রা ইত্যাদিতে হৃদয় মনের দিক দিয়ে বিমলতা-নির্মলতা পবিত্রতা একান্তভাবে অপরিহার্য্য বলে ঘোষণা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বর্ণনা করা গেল।

শরীর পাক করার বিবরণ:

শরীর নাপাক বা অপবিত্র হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হাদস' বলা হয়। হাদস দু'প্রকার। যথা–

(এক) 'হাদস-ই-আসগর' (ক্ষীণ অপবিত্রতা) এবং

(দুই) 'হাদস-ই-আকবর (বৃহৎ অপবিত্রতা)।

'হাদস-ই-আসগর:

সাধারণতঃ মানুষের শরীর হতে যে অপবিত্র বস্তু, যেমন–রক্ত, পুঁজ, মল, মুত্র, বমি, মলমুত্রের রাস্তা দিয়ে-বায়ূ ইত্যাদি বের হলেই 'হাদসে আসগর' হয়। এ ধরণের অপবিত্রতা থেকে ওযু দ্বারাই পবিত্র হওয়া যায়। অন্য ভাষায়, এসব অবস্থায়, ওযু করে নিলে শরীর 'পবিত্র' বলে শরীয়ত ঘোষণা করে।

অযু সম্পর্কিত একটি হাদিসের অপব্যাখ্যা খণ্ডন ঃ

বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু বায়ু উপলব্ধি করো আর সন্দেহ করো যে, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা? এতে সে যেন মসজিদ হতে (অযু ভঙ্গ হয়েছে সন্দেহে) বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ না সে কোন শব্দ শুনে বা গন্ধ পায়"।[৫০]

[৫০]. মুসলিম শরীফ-৩৬২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ থাকে যে, যেমনঃ কোন মুসল্লি জামাত সহকারে বা একা নামাযরত; এমনই সময়ে তার পেটে বায়ু গর্জন বা পেটের ট্রাবল ধ্বনি হলো, কিন্তু মুসল্লি কোন প্রকার না গন্ধ অনুভব করল, না বায়ু বের হওয়ার নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস (স্বশব্দে হউক বা নিঃশব্দে) হলো। শুধুমাত্র পেটে বায়ু গর্জনে একটু সন্দেহ হয়েছে। তাহলে ঐ সন্দেহের প্রেক্ষিতে সে নামায ছেড়ে দিবে না; বরং নামায পড়ে নেবেন এবং ঐ ধরণের সন্দেহের উপর অনাস্থাই রাখবে। হাদিসের এবারতে (বর্ণনায়) যে আওয়াজ শুনার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, দৃঢ়তার সাথে আস্থার নিশ্চয়তা যে হ্যাঁ; অবশ্যই তার বায়ু বেরিয়েছে।

অতএব আওয়াজ (শব্দ) শোনার অর্থ এই যে, অযু থাকার নিশ্চয়তা সম্পর্কে আস্থার দৃঢ়তার প্রেক্ষিত তাই সন্দেহ (স্বশব্দে বা নিঃশব্দে) জনক অযু ভঙ্গের কারণের দ্বারা অযু নষ্ট হতে পারে না; দৃঢ় নিশ্চয়তাই অযু ভঙ্গের মুল মূখ্য কারণ পরিচয়। যেমন কোন ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আসরের নামাযের সময় যে অযু করেছিল, তা বহাল রয়েছে। শুধু একটু সন্দেহ হচ্ছে যে, মাগরিবের নামায যে পড়ছে তার অযু আছে কিনা। তবে ঐ ব্যক্তি যদি আস্থাশীল হয় যে, তার অযু নষ্ট হওয়ার কোন কারণ এই সময়ের মধ্যে ঘটেনি। তাহলে নতুন অযু করা ছাড়া ঐ আসরের নামাযের অযু দিয়ে সে সালাতে মাগরিবের নামায ও আদায় করতে শরীয়ত কর্তৃক কোন নিষেধ নেই এবং সালাতে মাগরিবের নামায পড়া বৈধ।

তাছাড়া নামাযী ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় এই গ্রন্থেই "নামায আদায়ের পদ্ধতি" শিরোনামে বর্ণিত মোতাবেক কিয়াম-কুয়ুদ (নামাযরত অবস্থায় উঠাবসা) ইত্যাদি অনুযায়ী অনুশীলন করেন এবং ঐ অবস্থায় তার পেটের ট্রাবল ধ্বনি বায়ু গর্জন যতই করুক না কেন; সে অবশ্যই বায়ু নির্গত হবার অনুভব করতে পারবে। গন্ধ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তাছাড়া পেট থেকে বায়ু স্বশব্দে যেমন বের হয় তেমনি শব্দ ছাড়াও বের হয়।

অতএব আহলে হাদিস, সলফি গাইরে মুকাল্লিদের রেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আপনার নামায ও আমল নষ্ট করবেন না। তবে হ্যাঁ আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, ফোকহাগণ এ কথার উপর একমত যে, ইচ্ছে করে কেউ বিনা অযু নামায পড়লে তা আদায় তো হবেই না, বরং এর দ্বারা ঈমানও চলে যাবার

সমূহ সম্ভাবনা [৫১]। আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দিন। নামায আদায়ের যে পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত তা পুরোপুরি অনুশীলন করার তাওফীক দিন। আমিন।

হাদস-ই-আকবরঃ

১. সজোরে 'মণি' বা বীর্যপাত হলে। (যে কোন কারণেই হোক না কেন) কিংবা নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের কারণে 'মণি' বা বীর্য বের হলে :
২. উভয় লজ্জাস্থান এভাবে মিলানো যে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অপরের যৌনাঙ্গে (লজ্জাস্থানে) গোপন (প্রবেশ করানো) হয়, যদি বীর্য্যপাত নাও হয়, এবং
৩. স্ত্রীলোকের হায়য (ঋতুস্রাব) ও নিফাস্ (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) কালে শরীর 'বৃহত্তর পর্যায়ের নাপাক' বা 'হাদস-ই-আকবর' হয়ে থাকে। এ ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা 'অর্জন করতে হলে গোসল করা একান্ত অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তির 'ওযু' আবশ্যক তাকে শরীয়তের পরিভাষায়–'মুহদিস্', আর যার উপর গোসল করা অপরিহার্য হয়, তাকে 'জুনুব' বলা হয়।

ওযু করা প্রসঙ্গেঃ

মূলতঃ শরীয়ত প্রবর্তক আমাদের জন্য ওযু নামে এক পবিত্রতা অর্জন অধ্যায় রচনা করেছেন যা দ্বারা আমাদের অজান্তে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা, অহরহ সংগঠিত পাপ, লিপিবদ্ধরত, ছোট গুণাসমূহ অপনোদনে- বিমোচনে- দুরীকরণে যে রীতি-নীতি প্রণয়ন করেছেন তাই 'ওযু'। আসলে মানব দেহের অংগগুলোর মধ্যে যে গুলো সহসা পাপের গুণাহের দিকে প্রথমত ধাবিত হয়। ওই সমস্ত অংগগুলো সাধারণত 'ওযু' করতে ধৌত বা মসেহ করতে হয়। সেজন্য ওই অংগগুলো ধোয়ার পেছনে তার হৃদয় মনের পবিত্রতার কথাও স্মরণ হয় এবং বান্দা যেন অন্তত দিনে পাঁচবার 'ওযু' দ্বারা তার ছোট গুণাহ্ সমূহের জন্য অনুতপ্ততা প্রকাশ করতে পারে–ওযু এর বিহিত ব্যবস্থা মাত্র।

তাছাড়া পবিত্র হাদিস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, "হাতসমূহ ধোয়া হয় বেহেস্তের অনুকম্পা–অনুগ্রহ নেয়ামত গ্রহণ-ভক্ষণের জন্য। কুল্লি করা এজন্য যে, বান্দা যেন আপন প্রভুর সাথে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, নাকে পানি দেয়া এজন্য যে বান্দা যেন

[৫১]. দুররে মুখতার-১/২৫৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বর্গীয় সুবাস গ্রহণ করতে পারে। মুখ মন্ডল এজন্য ধোয়া; বান্দা যেন আপন প্রভূকে দেখতে পায়। কুনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া এজন্য বান্দার হাত যেন 'হাশর' মাঠে অন্যদের হাত থেকে ঝকঝকে চকচকে হয়। মাথা মসেহ এজন্য করা হয়, বান্দা যেন তার মাথায় স্বর্গীয় পুরস্কারের মুকুট পরিধান করতে পারে। কান মসেহ এজন্য যেন বান্দা আপন কানে আল্লাহর কুদরতী কথা শুনতে পায়, আর দু'পা এজন্য ধোয়া হয় যেন ওই দু'পায়ে বান্দা বেহেস্তের পথে চলতে পারে সর্বোপরি 'ওযু' বান্দার জন্য এক মহা নেয়ামত স্বরূপ।

যে সব কাজের জন্য ওযু করা ফরযঃ

(এক) প্রত্যেক নামাযের জন্য;
(দুই) কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য;
(তিন) জানাযা নামাযের জন্য এবং
(চার) কুরআন শরীফের 'সাজ্‌দা-ই-তেলাওয়াত' আদায় করার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কোন ভ্রান্ত মতবাদী অথচ ইসলামের লেবাসধারী ব্যক্তি এক্ষেত্রে বলেছেন যে, সাজ্‌দায়ে তেলাওয়াত-এর জন্য ওযু করা, কিবলা মূখী হওয়া এবং যমীনের উপর কপাল রাখার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন- জমায়াতে ইসলামীর আমীর (প্রতিষ্ঠাতা) মওদুদী সাহেব। (তার তাফহীমুল কুরআন, রাসায়েল মাসায়েল ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) এটা ভ্রান্তি বৈ-কিছুই নয়। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করার জন্য ওযু করা ওয়াজিব।

যেসব কাজের জন্য ওযু করা সুন্নাতঃ

(এক) আযানঃ
(দুই) তাকবীর (ইকামত)
(তিন) জুমা ও ঈদের খোৎবা;
(চার) নবী করীম (দঃ)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করা;
(পাঁচ) সাফা ও মারওয়ার 'সায়ী' (প্রদক্ষিণ) করা,
(ছয়) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা,
(সাত) ফরয গোসলের পূর্বে এবং
(আট) যে ব্যক্তির উপর গোসল করা ফরয হয়েছে, তার জন্য সে অবস্থায় পানাহার ও শয়নের পূর্বে ওযু করা সুন্নাত।

যে সব কাজের জন্য ওযু করা মুস্তাহাবঃ

(এক) শয়নের পূর্বে ও
(দুই) পরে। (ঘুম থেকে জেগে উঠার পর)
(তিন) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর, (যে গোসল করায়েছে মৃতব্যক্তিকে)
(চার) জানাযা উঠানোর পর, (মৃতকে গোসলের পূর্বে যে যে ব্যক্তি ক্ষেত্র বিশেষে উঠানামা করেছেন)
(পাঁচ) স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে
(ছয়) যখন রাগ আসে
(সাত) মৌখিকভাবে ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা জন্য
(আট) হাদীস শরীফ, দ্বীনি শিক্ষাদান ও গ্রহণ করার জন্য
(নয়) জুমা ও ঈদের খোৎবা ছাড়া অন্যান্য খোৎবার জন্য
(দশ) দ্বীনি গ্রন্থাদি স্পর্শ করার জন্য
(এগার) লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পর
(বার) মিথ্যা বলার পর
(তের) গালি (অনিচ্ছাকৃত গালমন্দ করা) দেয়ার পর
(চৌদ্দ) 'ফাহিশাহ্' বা নির্লজ্জ বাক্য উচ্চারণ (অসাবধানতা বশতঃ) করার পর
(পনের) অমুসলমানের শরীর (গায়ে) স্পর্শ করলে
(ষোল) বগল স্পর্শ করার পর, যদি সেখানে দুর্গন্ধ থাকে
(সতের) গীবৎ, পরোক্ষ নিন্দা করার পর। (অনিচ্ছাকৃত)
(আটার) নামাযের বাইরে উচ্চস্বরে হাসলে
(উনিশ) অশ্লীল কথা সম্বলিত কবিতা পাঠ করার পর
(বিশ) উটের গোস্ত আহার করার পর
(একুশ) পর্দা ব্যতিরেকে কোন মেয়েলোকের (গায়ে) শরীর স্পর্শ করলে
(বাইশ) পরবর্তী নামাযের জন্য পুনরায় অযু করা
(তেইশ) সর্বদা পবিত্র অবস্থায় থাকার জন্য অযু করা
(চব্বিশ) কোন গুনাহের (অজানা বশতঃ) কাজে লিপ্ত হবার পর এবং
(পঁচিশ) মূর্তি বা প্রতিমা স্পর্শ করার পর অযু করা এবং
(ছাব্বিশ) কোন বাতিল মতবাদী যেমন ওহাবী, মওদুদী, জমাতীপন্থী, শিয়া রাফেজী, লা মাজহাবী, তাবলিগিদের স্পর্শ হলে বা হেন্ডসেক করলে অযু করা মুস্তাহাব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওযুর আহকাম প্রসঙ্গ

ওযুর ফরয সমূহ:

(এক) কপালের উপরিভাগে চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচে পর্যন্তএবং এক কর্ণমুল থেকে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।

(দুই) উভয় হস্ত কুনুইসহ ধৌত করা।

(তিন) কপালের দিক হতে মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ্ করা এবং

(চার) গোড়ালী পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা। উল্লেখ্য যে, লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদরা ওযুর আয়াতকে ভুল ব্যাখ্যা করে উভয়পাকে না ধুয়ে মসেহ করার কথা বলে থাকে। যদ্ধারা ওযু যেমন শুদ্ধ হয় না, নামায শুদ্ধ হওয়া তো অনেক দূরের কথা। আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াত করুন।

ওযুর সুন্নাত সমূহ:

(এক) পবিত্রতা অর্জন এবং নামায পড়া বৈধ হবার মানসে ওযুর নিয়ত করা,

(দুই) আল্লাহ্ তা'আলার নামে অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' বলে ওযু আরম্ভ করা।

(তিন) ওযুর প্রারম্ভে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা

(চার) তিন বার কুল্লি করা। উল্লেখ্য যে, কুল্লি করার সময় গরগরা করাই উত্তম। কিন্তু রোজাদার গরগরা করবেনা বা নিষেধ।

(পাঁচ) মিসওয়াক করা, (তবে রোজাদার টুথপেষ্ট মাজন ইত্যাদি রোজা অবস্থায় ব্যবহার করতে পারবে না)।

(ছয়) নাকে পানি দেয়া, অর্থাৎ ডান হাতে তিনবার নাকের ভিতরে পানি দিয়ে বামহাতে নাক পরিস্কার করতে করতে পানি ঝেঁড়ে ফেলা। অবশ্য রোজাদার ব্যক্তি নাকে পানি দেয়ার সময় সতর্ক থাকবেন। যেন নাকের ভিতর দিয়ে পানি গলদ গমন করতে না পারে।

(সাত) দাঁড়ি খিলাল করা (আঙ্গুল দিয়ে পানি সহকারে আঁচড়ানো), এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরার উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধেন, (মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষেধ ও অবৈধ কর্মগুলোর পর্যায়ভুক্তের মধ্যে দাঁড়ি খিলালের সময় ছিড়ে যাবার সম্ভাবনা; আর ছিড়লে "দম" জরিমানা ওয়াজিব যেহেতু ওযু করার সময় মুহরিম ব্যক্তি তাকে সুন্নাতে পরিগনিত হবে না) দাঁড়ি খিলাল করবেন না,

(আট) হাত ও পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা,

(নয়) উভয় হাতে একবার পানি স্পর্শ করে সমস্ত মাথা কর্ণদ্বয় সহ মসেহ করা,

(দশ) ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা,

(এগার) ওযুর ফরয সমূহে তারতীবের অনুসরণ করা, অর্থাৎ প্রথমে মুখ, অতঃপর হাত ধৌত করা, অতঃপর মাথা মসেহ্ করা, তারপর পদদ্বয় ধৌত করা, এবং

(বার) ওযুর অঙ্গসমূহ লাগাতার (পর পর) অর্থাৎ এক অঙ্গ ধৌত করার পর তা শুকিয়ে যাবার পূর্বেই পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা।

ওযুর মুস্তাহাব সমূহ:

১. কিবলামুখী উচ্চ স্থানে বসা
২. নামাযের সময় হবার আগেই ওযু করে নেয়া
৩. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়া কিংবা মসেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলা
৪. ডানদিক থেকে ওযু আরম্ভ করা
৫. অযু আরম্ভ করার সময় বা প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার কিংবা মসেহ করার সময় এবং অযু শেষে অর্থাৎ যথাস্থানে দো'আ সমূহ পাঠ করা, (যে গুলোর বর্ণনা পরবর্তীতে দেয়া হবে, ইন্শা'আল্লাহ্ তা'আলা)
৬. অযুর পানির পাত্র বাম পার্শ্বে রাখা
৭. অযুর পানি পবিত্র স্থানে ঢালা
৮. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পরপর হাতে মুছে ফেলা (অর্থাৎ এমনভাবে মুছা যেন প্রত্যেক পশমের গোড়ায় অযুর পানি পৌঁছে, তবে কোন গামছা বা তোয়ালে দিয়ে নয় হাতে মুছতে হবে)
৯. বাম হাতে নাক পরিস্কার করা
১০. কুল্লিতে ও নাকে পানি ডান হাতে দেয়া
১১. অজুতে পানি প্রয়োজনের বেশী অথবা কম ব্যবহার না করা
১২. ওযর ব্যতীত কারো সাহায্য ছাড়া ওযু করা
১৩. অযুর সময় অনর্থক কথাবার্তা না বলা
১৪. অযুর সময় দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা
১৫. মুখমন্ডলের উভয় পার্শ্ব একই সাথে ধৌত করা
১৬. উভয় কর্ণ একই সাথে মসেহ করা
১৭. দু'হাতের আঙ্গুলের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা গর্দান মসেহ করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮. হাতে আংটি থাকলে তা নেড়ে ভিতরের দিকে পানি প্রবেশ করানো
১৯. অযুর পাত্র মাটির হওয়া
২০. বাম হাতে পা ধৌত করা
২১. মুখমন্ডল এমনিভাবে ধৌত করা যাতে মাথা পর্যন্তপানি পৌঁছে
২২. মুখমন্ডল উভয় হাতে ধৌত করা
২৩. হাত-পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলের দিক হতে পানি ঢালা
২৪. মুখমন্ডল, হাত-পা ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থান হতে সামান্য বেশী ধোয়া
২৫. সমগ্র মাথা মসেহ করা
২৬. কানের ভিতরে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে মসেহ করা
২৭. কানের বাইরে তরজনী দ্বারা খিলাল করা
২৮. পায়ের আঙ্গুল সমূহ বাম হাতের কনিষ্ট আঙ্গুল দ্বারা মসেহ করা
২৯. আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা-ডান পায়ের কনিষ্ট আঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ট আঙ্গুলে শেষ করা
৩০. মনে মনে ওযুর নিয়ত করার সাথে সাথে মুখেও নিয়ত বাক্য উচ্চারণ করা
৩১. অযু শেষে অবশিষ্ট পানি থেকে এক আঙ্গুলী পানি আসমানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পান করা. তবে রমজানের মাসে দিনের বেলা উক্ত পানি পান না করার প্রতি খুব সতর্ক থাকা
৩২. অযু শেষে সূরায়ে 'কদর' 'ইন্না আনযালনাহু ফী লায়লাতিল কৃদর.....শেষ পর্যন্ততেলাওয়াত করা
৩৩. অযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কালেমায়ে শাহাদাত 'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু.....শেষ পর্যন্তপাঠ করা
৩৪. অযু করার পর দু'রাকাআত 'তাহিয়্যাতুল ওযু'–এর নামায পড়া.
৩৫. পরবর্তী নামাযের জন্য অযুর পানি পাত্রে ভরে রাখা
৩৬. অযুতে ব্যবহৃত পানি যাতে কাপড়ে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা
৩৭. অযুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধোয়ার পর এমনিভাবে সেগুলোর মোছন করা. যাতে ওযুর পানির তারল্য বা সামান্য চিহ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাকি থাকে।

❑ উল্লেখ্য যে, নাস্তা করা বা খানা-পিনার আগে ও পরে বিশেষ করে সকালের নাস্তার আগে পরে ওযু করা অত্যন্ত উপকারী। হাদীস শরীফে এসেছে.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ»

অর্থাৎ- হযরত আনাস (র.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক কারো গৃহে অধিক বরকত দান করুন এটা যদি কেউ চায়, তাহলে সে যেন সকালে নাস্তা উপস্থিত হলে এবং উঠিয়ে নিয়ে গেলে ওযু করে" [৫২]।

অযুর 'মাকরূহ সমূহ:
১. মুখমন্ডল ধোয়ার সময় চেহারায় পানি সজোরে নিক্ষেপ করা
২. বাম হাতে মুখে পানি দেয়া
৩. নাক ডান হাতে পরিস্কার করা
৪. তিনবারের কম বা বেশী কোন অঙ্গ ধৌত করা
৫. পানি প্রয়োজনের বেশী অথবা কম ব্যবহার করা
৬. মুখমন্ডল ধোয়ার সময় চক্ষুদ্বয় ও মুখ জোরে স্ব ইচ্ছায় বন্ধ করে রাখা
৭. অযু করার সময় সাংসারিক, রাজনৈতিক কথাবার্তা বলা
৮. এক বারের বেশী বা নুতন পানি স্পর্শ করে মাথা মসেহ করা
৯. নাপাক বা অপবিত্র স্থানে বসে ওযু করা
১০. মেয়ে লোকের গোসল বা ওযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযু করা
১১. অযুর পানি নাপাক জায়গায় ঢালা
১২. মসজিদের ভিতরে অযু করা
১৩. এক হাতে মুখ ধোয়া
১৪. গলা মসেহ করা
১৫. ইচ্ছাকৃতভাবে যে কোন সুন্নাত অযু করার মধ্যে পরিহার করা
১৬. থুথু. কফ অথবা কুল্লির পানি কেবলার দিকে ফেলা। (পানি সমূহ ডান অথবা বাম দিকে ফেলবে)
১৭. অযুর পানি ছিটকে ওযুর পানির পাত্রে পড়ে এমনি অবহেলিতভাবে অযু করা
১৮. সূর্য-পাক, দাহে-তাপে গরম; পানি দ্বারা অযু করা এবং
১৯. নিজের জন্য অযুর পানির কোন পাত্র রিজার্ভ করে রাখা

[৫২]. সুনানে ইবনু মাজাহ-৩২৬০. শুআবুল ঈমান লিল-বাইহাকী-৫৪২৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ:

১. মল মূত্রের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে, (পেশ্রাব, পায়খানা, বায়ু, ক্রিমি, পাথর, রক্ত, মুযী ইত্যাদি)।
২. শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত, পূঁজ অথবা পানি বের হলে তা সেস্থান থেকে গড়িয়ে পড়লে,
৩. রক্ত, গলধঃকৃত খাদ্যদ্রব্য, পিত্ত অথবা পানি মুখ ভরে বমি হলে,
৪. নাসিকা হতে রক্ত নির্গত হলে,
৫. থুথুর সাথে রক্ত বের হয়ে যদি রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশী হয়,
৬. চিত বা কাত হয়ে, হাঁটু উঠিয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে।
৭. মাতাল, পাগল কিংবা অচেতন হয়ে গেলে,
৮. প্রাপ্ত বয়স্ক লোক রুকু সাজদাহ সম্বলিত নামাযে উচ্চস্বরে হাস্য করলে, (নামাজরত অবস্থায় অট্টহাসি করলে)।
৯. নারী পুরুষের গুপ্ত অঙ্গদ্বয় একত্রিত হলে, এবং 'মযী' (যৌন অনুভূতির প্রারম্ভিক তারল্য) নির্গত হলে। (তা যৌন উত্তেজনার কারণে হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণে)।

অযু সম্পর্কিয় বিশেষ জ্ঞাতব্য:

এক: বর্তমানে প্রচলিত নখ-পলিশে অভ্যস্থ লোকের নখ-পলিশ সম্পূর্ণরূপে (নখ পলিস আবরণ জাতীয় তরল দ্রব্য) পরিস্কার করা ব্যতিরেকে অযু ও গোসল বিশুদ্ধ হয় না বিধায় এমতাবস্থায় তার নামায ইত্যাদি এবাদতও শুদ্ধ হবে না।

দুই: অযু অসম্পূর্ণ অবস্থায় মাঝখানে ওযু ভঙ্গের কারণ ঘটলে পুনরায় প্রথম থেকে অযু আরম্ভ করতে হবে।

তিন: সর্বপরি যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় তা কতেকভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে যথা ঃ

(১) যা দেহের ভেতর থেকে বের হয়।

(২) যা বাইরে থেকে মানুষের উপর এসে পড়ে। এছাড়া অযু নষ্টের কারণের মধ্যে

(৩) যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় সে কারণে ওযুও নষ্ট হয়। তাছাড়া আমাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নামায ও এবাদত বন্দেগী আদায়

হওয়ার জন্য অযু প্রথম শর্ত। অতএব অযু বিহীন নামাযের অবস্থা কি হবে প্রিয় পাঠক নিজেই বিবেচনা করবেন।

অযুর নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدْثِ وَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ আতাওয়াদ্বা'আ লিরাফ্ইল হাদাছি ওয়া ইস্তিবাহাতিস্ সালাতি ওয়া তাক্বারুবান ইলাল্লাহি তা'আলা।

অযু আরম্ভের দো'আ:

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَ الْكُفْرُ ظُلْمَةٌ ـ

উচ্চারণ: বিস্মিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম, ওয়াল হামদু লিল্লাহি আলা দ্বীনিল ইসলামি। আল্ ইসলামু হাক্কুন, ওয়াল কুফ্রু বাতিলুন। আল্ ইসলামু নুরুন, ওয়াল কুফরু যুলমাতুন্।

কুল্লির দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা তিলাওয়াতিল ক্বোরআনি ওয়া যিক্রিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়াহ্সনি ইবাদাতিকা।

নাকে পানি দেয়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ لَاتُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ'রিহ্নী রা-ইহাতাল জান্নাতি ওয়া লা তুরিহনী রাইহাতান্ না-রি।

মুখমণ্ডল ধোয়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বাইয়িদ্ব ওয়াজ্হী ইয়াউমা তাবইয়াদ্দু ওজুহুন্ ওয়া তাস্ওয়াদ্দু ওজুহুন্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ডানহাত ধোয়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ'তিনী কিতাবী বি-ইয়ামীনী ওয়া হাসিব্‌নী হিসাবান্ ইয়াসীরা।

বাম হাত দোয়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ لاَتُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَ لاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা-তু'তিনী কিতাবী বি-শিমালী ওয়া লা মিন্ ওয়ারা-ই যাহ্‌রী।

মাথা মসেহ করার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আযিল্লানী তাহ্‌তা যিল্লি আরশিকা ইয়াউমা লা-যিল্লা ইল্লা যিল্লা আরশিকা।

কান মসেহ করার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আল্‌নী মিনাল্লাযীনা ইয়াস্ তামিউনাল্ ক্বাউলা ফাইয়াত্তাবি-উনা আহ্‌সানাহু।

গর্দান মসেহ করার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ'তিক্ব রিক্বাবানা ওয়া রিক্বাবা আ-বা-ইনা মিনান্না-রি।

ডান পা ধোয়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামাইয়্যা আলাস্ সিরা-তি ইয়াউমা তাযিল্লুল আকদামু।

বাম পা ধোয়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَ سَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَ تِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ্'আল যামবী মাগ্‌ফুরান্ ওসা'-য়ী মাশ্‌কূরান্ ওয়া তিজারাতী লানতাবুরা।

ওযু শেষে পড়ার দো'আ:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الَّذِيْنَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ-আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ' আল্‌নী মিনাল মুতাতাহ্‌হিরীন ওয়াজআলনী মিন্ ইবাদিকাল্ লাযীনা-লা খাউফুন্ আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানুন [৫৫]।

বিশেষ জ্ঞাতব্য:

অনেক এমনও আছে, যারা এ সম্পর্কে অবগত নয় যে, ওযু করার সময় পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে হয়। তাও এভাবে যে, বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা ডান পায়ের নীচের দিক থেকে এবং ডান পায়েরই কনিষ্ঠাঙ্গুলী থেকে খিলাল আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে শেষ করতে হয়।

ওযুর স্থান সমূহের মধ্যে কোন স্থানে চুল পরিমাণও যদি শুস্ক থেকে যায় তা হলে ওযু শুদ্ধ হবে না। বলা বাহুল্য যে, ওযু শুদ্ধ না হলে নামাযও শুদ্ধ হয়না।

মাথা মসেহ্ করার নিয়ম হচ্ছে- পানিতে হাত ডুবিয়ে উভয় হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রভাগগুলো পরস্পর একত্রিত করে মাথার সম্মুখ ভাগে রাখবে বা স্থাপন করবে, তখন শাহাদাত ও তর্জনীঙ্গুলীদ্বয়সমূহও হাতের তালু মাথা হতে পৃথক রাখবে। এবার মাথার উপরিভাগ দিয়ে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলীসমূহ টেনে গর্দান পর্যন্তআনবে। তারপর হাতের

[৫৫]. জামে' তিরমিযী- ৫৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

তালু দ্বারা মাথার দু'পার্শ্বে মসেহ করতঃ সামনের দিকে আনবে। সর্বশেষে, তর্জনীঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগ ও শাহাদাত আঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কানের ভিতরের অংশ মসেহ করবে। অতপর দু'হাতের আঙ্গুলের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা গর্দান বা ঘাড় মুসেহ করবে।

গোসলের বিবরণ

যে সব কারণে গোসল করা ফরয:

স্ত্রী সঙ্গম, স্বপ্নদোষ, শাহ্ওয়াত বা যৌন উত্তেজনার কারণে 'মণি' বা বীর্যপাত হলে, স্ত্রীলোকের হায়েয (ঋতুস্রাব) বা নিফাসের (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) খুন (রক্ত) বন্ধ হলে গোসল করা ফরয।

যে সব কারণে গোসল করা ওয়াজিব:

মুর্দা বা মৃতকে গোসল দেয়ালে, নাপাক শরীরে "কাফির" মুসলমান হবার সময় গোসল করা ওয়াজিব।

যে সব কারণে গোসল করা সুন্নাত:

জুমার দিন, ঈদের দিন, আরাফাতের দিন, কাফির মুসলমান হতে চাইলে, অথচ তার শরীর পবিত্র আছে, আরাফাতের মাঠে অবস্থানের জন্য (হাজীদের বেলায়), মুয্দালিফার মাঠে অবস্থানের জন্য, হেরম শরীফ ও হুযুর পাক (দঃ)-এর রওযা শরীফে হাজিরা দেয়ার (জেয়ারতের) জন্য, শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদিতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

জ্ঞাতব্য:

(এক) 'রমজান শরীফের' রাত্রে কারণ বশতঃ গোসল করা ফরয বা ওয়াজিব হলে, 'ফজরের' আগে গোসল করে নেয়া উচিৎ, যাতে পুরো রোজাটা পবিত্রাবস্থায় আরম্ভ ও সম্পন্ন হয়। কিন্তু 'ফজরের' আগে গোসল না করলেও 'রোযার' কোন ক্ষতি হবে না বা ক্ষতি হয়েছে বলা যাবে না।

(দুই) নারী পুরুষ কিংবা শয়তানের কুপ্ররোচনায় দুইজন পুরুষ যৌন মিলনে মিলিত হলে, (এখানে বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, পুরুষে পুরুষে বলৎকারী করা 'গুনাহে কবীরাহ্' বা মহাপাপ। উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ অবধারিত) বীর্য্যপাত হোক বা না-ই হোক উভয়ের উপর গোসল করা ফরয।

(তিন) স্বপ্নদোষের কারণ স্মরণ না থাকলে, যদি বীর্যের চিহ্ন-সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়, তবে গোলস করতে হবে।

(চার) প্রস্রাবের সময় যৌন উত্তেজনা অথবা হস্তমৈথুন ইত্যাদির কারণে মণি নির্গত হলে (বির্য্যপাত), গোসল করা ফরজ।

(পাঁচ) ওযুতে যে সব অঙ্গ ধোয়া ফরয, সেখানে যদি কোন ক্ষতস্থান থাকে কিংবা আঘাত প্রাপ্ত হয়, আর তাতে পানি লাগলে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে ক্ষতস্থানের উপর লাগানো ব্যান্ডিজের উপর মসেহ্ করা বৈধ।

(ছয়) চামড়া-নির্মিত মোজা পরিহিত অবস্থায় ওযুতে মোজার উপর মসেহ্ করা জায়েয। উল্লেখ্য যে এভাবে মোজা না খুলে স্থায়ী বাসিন্দাগণ একদিন একরাত পর্যন্তএবং মুসাফিরগণ তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজার উপর মসেহ্ করে অযু সম্পন্ন করতে পারবেন। এরপর (মোজা খুলে) পুনরায় অযু করে মসেহ করতে হবে। নতুবা পূর্ববর্তী অযু দ্বারা নামায শুদ্ধ হবে না। আরো উল্লেখ্য যে, চামড়ার তৈরী মোজার উপর মসেহ্ করার মস'আলায় উপরোক্ত ঐক্যমত্যের অভিমত সমস্ত ফিক্হশাস্ত্রের ইমামগণের। এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু মাযহাবের সমস্ত ইমাম তথা সমস্ত ফকীহ্ ও মুজতাহিদের ঐক্যমতকে উপেক্ষা করে জনাব মওদুদী সাহেব নিছক মনগড়াভাবে কাপড়ের হাল্কা পাতলা মোজার উপরও মসেহ্ করা জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। (জনাব মওদুদীকৃত রসায়েল মসায়েল দ্রষ্টব্য এবং লা মাযহাবীদের মতবাদ) অথচ চামড়ার তৈরী মোজা ব্যতীত কাপড়ের মোজার উপর মসেহ্কৃত অযু যেমন শুদ্ধ নয়, সে অযুতে নামায ইত্যাদিও তেমনিভাবে শুদ্ধ ও বৈধ হবে না। বাতিল ফিরকা মু'তাযিলা সালাফি-গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট মোজা পড়াবস্থায় পায়ের তালুতে মোছেহ করাটাই হলো মোছেহে আলাল খুফ্ফাইন: অথচ মোছেহ আরম্ভ করতে হয় পায়ের আংগুলের অগ্র ভাগ হতে উপরের দিকে হাতের আংগুল চালনা করার মধ্যমে। আল্লাহ্ হেদায়ত করুন।

গোসলের ফরয:

(এক) গরগরা সহকারে উত্তমরূপে কুল্লি করা।

(দুই) পানি দ্বারা নাকের ভিতরে পরিস্কার করা, এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

(তিন) সর্বাঙ্গে লোমের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাতঃ

(এক) হস্তদ্বয় কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।
(দুই) লজ্জাস্থানে নাপাকী না থাকলেও গোসলের আগে (মর্দ্দন করতঃ) তা ধুয়ে ফেলা।
(তিন) নামাযের ওযুর মত ওযু করা।
(চার) সমস্ত শরীর ও মাথার উপর তিনবার পানি ঢালা।
(পাঁচ) গুপ্তস্থান ধৌত করতঃ শরীর মর্দ্দন করা।
(ছয়) তিনবার গরগরা করা।
(সাত) তিনবার নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। এবং
(আট) কোন উচ্চ স্থান ছাড়া অন্যত্র গোসল করলে (সমতল ভূমিতে) গোসলের শেষে স্থানান্তরিত হয়ে পা ধোয়া।

গোসলের মুস্তাহাবঃ

(এক) অন্তরে ও মুখে নিয়ত করা।
(দুই) গোসলের প্রারম্ভে "বিস্‌মিল্লাহ্‌....." পড়া।
(তিন) নির্জন স্থানে গোসল করা।
চার) গোসলের সময় অনর্থক বা বাজে কথাবার্তা না বলা।
(পাঁচ) পরিমিত পানি ব্যবহার করা অর্থাৎ পানি অপচয় না করা।
(ছয়) গোসলের পর শুস্ক কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলা।
(সাত) গোসলের পর তাড়াতাড়ি অন্য কাপড় পরিধান করা।
(আট) আখেরী চার শোম্বার গোসল।

গোসলের মাকরূহঃ

(এক) ক্বিবলামুখী হয়ে অথবা পিট দিয়ে গোসল করা এবং
(দুই) পানি প্রয়োজনের বেশী বা কম ব্যবহার করা।

গোসলের নিয়তঃ

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতুল গোস্‌লা লিরাফয়িল জানাবাতি ওয়াস্‌ তিবা-হাতিস্‌ সালাতি ওয়া তাক্বারুবান্‌ ইলাল্লাহি তা'আলা।

ফরয-গোসল সম্পর্কে জ্ঞাতব্যঃ

জেনে রাখা আবশ্যক যে, ফরয গোসল করার পূর্বে শরীরে ও কাপড়ে লেগে থাকা অপবিত্র বস্তু ধুয়ে ফেলতে হবে। তা পরিস্কার না করে গোসল সেরে নিলে পবিত্রতার মধ্যে ত্রুটি থেকে যাবে। তাছাড়া, উক্ত গোসলের পূর্বে কুল্লির পরিবর্তে 'গরগরা' করতে হবে। এর পূর্বে খিলাল করে দাঁত পরিস্কার করে নেয়াও অবশ্যকীয়। নাকে পানি দেয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ডান হাতের অঙ্গুলিতে পানি দিয়ে তা নাকের ভিতর নিয়ে নস্যের মত টেনে টেনে ঢুকাতে হয়, যাকে ফিকহ্‌ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'ইস্‌তিনশাক্ব' বলা হয়। অতঃপর বাম হাতের তর্জনী ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নাকের ভিতর ভালরূপে পরিস্কার করে নাক ঝেড়ে পানি বের করে নিতে হয়। (যাকে ফিকহ্‌-এর পরিভাষায় 'ইস্তিন্‌সার' বলা হয়)

সারা শরীরে পানি পৌঁছানোর সময় ভালভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন কানের উভয় দিকে, রান ও হাঁটুর চিপায়, বগলে ও হাত-পায়ের আঙ্গুল সমূহের ফাঁকে পানি পৌঁছে। অতঃপর মেজে (মর্দ্দন) ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। অনুরূপভাবে, নাভীর ভিতর ও অন্যান্য গুপ্ত স্থানেও পানি পৌঁছিয়ে মেজে মেজে (মর্দ্দন) পরিস্কার করতে হবে। নারীদের বেলায়ও এগুলো প্রযোজ্য। অবশ্য, তারা তাদের হাত, কান ও নাকের অলংকারাদি নেড়েচেড়ে ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি পৌঁছাবে। বর্তমানে আধুনিক সমাজে মেয়েদের নাকে ও কানে ছিদ্র করা না থাকলেও যেসব নারীর নাকে ও কানে ছিদ্র করা হয়েছে সেসব ছিদ্রে পানি পৌঁছানোও ফরয।

ছেলেদের খাতনা করা এবং মেয়েদের কান নাক ছিদ্র করা ঃ

প্রকাশ থাকে যে, পুরুষদের খতনা করা আর অলংকার পরিধানের জন্য মহিলাদের নাক কান ছিদ্র করা সুন্নাতে ইবরাহীম (আ.)। যেহেতু সর্বপ্রথম খতনা করেছেন আবুল আম্বিয়া হযরত ইবরাহীম (আ.) আর সর্বপ্রথম কান নাক ছিদ্র করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্ত্রী হযরত হাজেরা (র.)। হাদীস শরীফে এসেছে,

«اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً»

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ- "হযরত ইবরাহীম (আ.) আশি বছর বয়সে খতনা করেছেন"। [৫৪]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ النَّاسِ أَضَافَ الضَّيْفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ: يَا رَبِّ، مَا هَذَا فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " وَقَارًا يَا إِبْرَاهِيمُ " قَالَ: رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا

অর্থাৎ- হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মেহমানকে মেহমানদারী করেছেন, তিনিই সর্বপ্রথম খাতনা করেছেন, তিনিই সর্বপ্রথম মোচ ছেটেছেন, তিনিই সর্বপ্রথম মাথায় সাদা চুল দেখেছেন। তিনি মাথায় সাদা চুল দেখে বললেন, হে প্রভু! ইহা কি? মহান আল্লাহ উত্তর দিলেন, হে ইবরাহীম! ইহা হচ্ছে সম্ভ্রম ও মর্যাদা। তিনি বললেন, তাই যদি হয়, তাহলে আমার সম্ভ্রম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও [৫৫]।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন,

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ.

অর্থাৎ- "সমস্ত আলেমগণ একমত যে, হযরত ইবরাহীমই (আ.) সর্বপ্রথম খতনা করেছেন"। [৫৬]

অন্য দিকে মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম কান ছিদ্র করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্ত্রী হযরত হাজেরা (র.)। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইরাহীম (আ.) এর স্ত্রী হযরত সারা (র.) স্বামীকে খুব ভালবাসতেন কিন্তু সুদীর্ঘকাল যাবত সংসার করেও কোন সন্তান না হওয়ায় হযরত সারা (র.) নিজের সুশ্রী দাসী হযরত হাজেরা (র.)-কে স্বামীর সাথে বিবাহ দেন। যখন হযরত হাজেরা (র.) এর গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর আগমন ঘটে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হাজেরা (র.)-কে আদর যত্ন করতে লাগলেন, তখন হযরত সারা (র.) এর মধ্যে নারী স্বভাব সুলভ ইর্ষার উদ্রেক হলে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, আমি হাজেরার দেহের কিছু অংশ ছিড়ে ফেলব, যাতে দেখতে কুশ্রী দেখা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার শপথ পূর্ণ করবেনা? হযরত সারা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন,

[৫৪]. সহীহ বুখারী-৩৩৫৬, সহীহ মুসলিম-২৩৭০।
[৫৫]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক-৩৪০৮, শুআবুল ঈমান-৫৯৭৫, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-২৬৪৬৭।
[৫৬]. তাফসীরে কুরতুবী-২/৯৮, আত-তামহীদ লিইবনে আব্দুল বার-২১/৫৯।

কিভাবে করব? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তুমি হাজেরার উভয় কান ছিদ্র করে দাও। হযরত সারা (আ.) হযরত হাজেরা (আ.) এর উভয় কান ছিদ্র করে দুটি দুল পরিয়ে দিলে তাঁর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। তখন হযরত সারা (আ.) বলেন, আমি তো তার সৌন্দর্যই শুধু বৃদ্ধি করে দিলাম। তখন থেকেই সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মহিলাদের কান নাক ছিদ্র করার সুন্নাতে ইবরাহীমি অদ্যাবধি প্রচলিত হয়ে আসছে। [৫৭]

এছাড়াও সহীহ বুখারী সহ অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (র.) কর্তৃক এগারজন মহিলাকে তাদের স্বামীদের সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে বললে তাদের মধ্যে এগারতম উম্মে যারা' নামক মহিলাটি বলেন, "আমার স্বামী আবু যারা' অলংকার দ্বারা আমার উভয় কান ঝুলিয়ে দিয়েছে"। হযরত আয়েশা তাদের বিস্তারিত বিবরণ ছরকারে দোজাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বিবৃত করলে তিনি ইরশাদ করেন, " উম্মে যরা'র জন্য আবু যরা' যে রকম, আমিও তোমার জন্য সেই রকম" [৫৮]।

স্পষ্টতই বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই স্বামী অলংকার দ্বারা স্ত্রীর কান ঝুলিয়ে দিয়েছে তাকেই পছন্দ করেছেন।

অতএব, আধুনিকতার নামে বর্তমান নারী সমাজ কান নাক ছিদ্র না করে সুন্নাতে ইব্‌রাহীমি পালনের পূণ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ্ আমাদের উক্ত সুন্নাত পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

গোসলের সময় যা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক:

- ❖ নাকের ভিতর 'শ্লেষ্মা' শুকিয়ে রয়েছে কিনা দেখতে হবে। যদি শুকিয়ে থাকে তা হলে তা পরিস্কার না করলে 'গোসল' শুদ্ধ হবে না।
- ❖ 'খাত্‌নাবিহীন ব্যক্তির' পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বর্দ্ধিত চামড়ার ভিতর অবশ্যই পানি প্রবেশ করাতে হবে এবং পরিস্কার করে ধৌত করতে হবে। অন্যথায় 'গোসল' শুদ্ধ হবেনা।
- ❖ দাঁতে কোন শক্ত দ্রব্য লেগে থাকলে বা একটা চনা (পরিমাণ) অপেক্ষা বেশী দ্রব্য লেগে থাকলে তা নরম হলেও গোসলের পূর্বে কুল্লি কিংবা

[৫৭]. তাফসীরে দুররে মানসূর-৫/৪৭, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর-৩/১৩৭, তারীখে দামেশক লিইবনে আসাকের-৭৩৫৬৭, আখবারুননিসা লিইবনিল জাওযী-১/৮৩,
[৫৮]. সহীহ বুখারী-৫১৮৯, সহীহ মুসলিম-২৪৪৮, সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ী-৯০৮৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিস্ওয়াক করতঃ পরিস্কার করে নিতে হবে। অন্যথায় গোসল শুদ্ধ হবে না।

- ❖ শরীরে কোন জড় বস্তু লেগে থাকার কারণে সেটার ভিতরের অংশে বা চামড়ায় পানি না পৌছলে গোসল শুদ্ধ হবে না। বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের (দঃ) দেয়া সভ্যতা ছেড়ে তাদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি পশ্চিমা ধাঁচের তথাকথিত সভ্যতাকে উন্নতমানের মনে করে তা গ্রহণ করতে অধিক আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়। তারা ওদের অনুকরণে এমন কিছু জিনিষ ব্যবহার করে, যা শরীরে পানি পৌছাতে বাধা সৃষ্টি করে বা পানি মোটেই পৌছেনা। যেমন-নখ পালিশ। তা ব্যবহারের ফলে নখ্ পর্যন্তপানি পৌছুতে পারে না। সুতরাং যে নখ্ পালিশ ব্যবহার করে তা অপসারণ (অযু গোসলের জন্য) করে না; তার না অযু শুদ্ধ হবে, না গোসল শুদ্ধ হবে। অতএব, নামায শুদ্ধ হবার প্রশ্নই আসে না।
- ❖ কোন নাপাক ব্যক্তির চোখে রোগ হলে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি পানি ব্যবহারে বারণ করেন, তাহলে চক্ষুদ্বয় মসেহ করতে হবে। চোখে রোগ হবার ফলে (যেমন-চোখ ওঠা) চোখ থেকে যে পানি বের হয় তাও 'নাজাসাতে গলীযাহ্'।
- ❖ অনুরূপভাবে নাভী বা স্তন থেকে ব্যথা বা অন্য কোন কারণে যে পানি নির্গত হয় তাও 'নাজাসতে গলীযাহ্'।
- ❖ যে পরিমাণ বমি, রক্ত ও পূঁজ ইত্যাদি বের হলে ওযু নষ্ট হয় না, সে পরিমাণ পবিত্র।
- ❖ বিড়ালের প্রস্রাব 'নাজাসাতে গলীযাহ্'। সুতরাং বিড়াল ও 'ইঁদুরের প্রস্রাব' চার আনা মূদ্রা (পরিমাণ) অপেক্ষা বেশী কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হবে।
- ❖ এভাবে হাঁস-মুরগী ব্যতীত যেসব পাখীর গোস্ত হালাল সেসব পাখীর উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কাজেই সেই প্রাণির ব্যবহৃত পানি পবিত্র বটে; কিন্তু তা দ্বারা অন্য কোন জিনিস পবিত্র করা যায় না। এটাই সর্ব সম্মত অভিমত। উল্লেখ্য যে, উপরোল্লেখিত মাসআলাগুলো গোসল ও ওযুর জন্য প্রযোজ্য।

মাইয়াতের গোসলের বয়ানঃ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া "ফরজে কেফায়া" বা ওয়াজিব। ফতহুল কদীর, নাহ্রুল ফায়েক ইত্যাদি কিতাবে আছে যে, মাইয়াতকে গোসল দেয়া অতীতের শরীয়ত হতে প্রচলিত। বর্ণিত আছে যে, আবুল বশর সৈয়্যদুনা আদম আলইহিচ্ছালামের এন্তেকালের পর সৈয়্যদুনা জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম আতর, কাফুর ও কাফনসহ এক জমাআত (দল) ফেরেস্তা নিয়ে অবতির্ণ হয়েছিলেন, এবং কুল বৃক্ষের পাতা পানিতে দিয়ে তাঁকে তিনবার সারা শরীর গোসল দিয়েছিলেন। তৃতীয়বারে পানিতে কাফুর দিয়েছিলেন, বেজোড় সেলাইবিহীন কাপড়ে কাফন পরায়ে নামাযে জানাযা আদায় করতঃ কবর খনন করে দাফন করেছিলেন, এবং তাহার আওলাদগণকে বলেছিলেন, যেন এই নিয়মে মাইয়াতের গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা করেন। এবং বলেছিলেন হে আদম সন্তান! কেয়ামত পর্যন্তইহা তোমাদের মাইয়াতের জন্য সুন্নাত।

নূর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্রান্ত আক্বিদাঃ

আমাদের মধ্যে কারো কারো আক্বিদা বিশ্বাস হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের সৃষ্টি না; বা আমাদের মত মাটির তৈরী মানুষ। তাদের খেদমতে আমি আদি পিতা আদম (আ.)'র দাফন সংক্রান্ত রাওয়ায়েত মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত করার অনুরোধ করব। এখানে ফেরেস্তাকুল সরদার সহ অন্যান্য আল্লাহ্র দুতগণ যারা আদম (আ.) এর দাফন কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন তারা কি মাটির তৈরী ছিলেন না নূরের তৈরী? যদি নূরের তৈরী হয়ে থাকেন মানবের মত কেমন করে আদমের কবর খনন, গোসল দেয়া, দাফন ইত্যাদির কাজ সমাধা করেছেন? এছাড়াও সৈয়দুনা জিবরাঈল (আ.) অসংখ্যবার আম্বিয়ায়ে সাবেকিন সহ প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কোথাও ওই ঘটনা গুলোর প্রেক্ষিতে বলা হয় না যে, সৈয়দুনা জিবরাঈল (আ.) আমাদের মত মানুষ। প্রিয় পাঠক ইন্সাফ আপনাদের হাতে!!!

- ❖ মৃত ব্যক্তিদেরকে গোসল দেবার নিয়ম এই যে, প্রথমে যে জায়গায় গোসল দেয়া হবে তা চতুর্দিকে পর্দা করে নেবে এভাবে যেন গোসল দানকারীরা ছাড়া কেউ মাইয়াতকে দেখতে না পায়। পবিত্র, পরিস্কার পানি সাধারণ গরম করে নেবে। তার মধ্যে কয়েকটা কুল গাছের পাতা ডালবে এ জন্য যে মৃত্যু যাতনার কারণে মাইয়াতের যে কষ্ট অনুভূত হয়েছে তা কিছুটা দূরিভূত হয় এবং অতি গরম বা ঠান্ডা অনুভূতিতে যেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যের কষ্ট না হয় এবং কোন অবস্থাতেই মৃত্যকে টানা হেঁছড়া বা সাধারণতঃ জীবিত ব্যক্তিকে যে প্রকারের কষ্ট দিলে তার যেমন অনুভূত হয় সে রকমও যেন কোন প্রকারের কষ্ট না হয়; এমন কর্ম থেকে গোসল দানকারীসহ সকলেই বিরত-সজাগ থাকবে। ইহাই সুন্নাত।

- যে খাট বা তক্তার উপরে মাইয়াতকে গোসল দেবে সেটা তিন, পাঁচ বা সাতবার সুগন্ধ লোবান জ্বালায়ে নিচে ও চতুর্পার্শ্বে ধুনী দেবে, এবং ধোঁয়া দেয়া এই জন্য যে, মাইয়াত এর শরীর থেকে এক প্রকারের গন্ধ বের হয়; তাই খুশবো লোবানের ধোঁয়া দ্বারা যেন উক্ত দুর্গন্ধ অনুভব না হয়।
- তারপর মাইয়াতকে কেবলামুখী ওই খাট বা তক্তার উপর শোয়াবে।
- অতপর মাইয়াতের পরিধিয় বস্ত্র খুলে নিয়ে একটি কাপড় দ্বারা মুর্দা ব্যক্তির গোটা শরীর ঢেকে রাখবে।
- এবার গোসল দানকারী স্বীয় হাত ভিজা কাপড় দ্বারা আবৃত করে মাইয়াতকে ইস্তিনজা করাবে, অর্থাৎ সামনে পেছনের গুপ্তস্থানদ্বয় মুছে ধুয়ে পরিস্কার করে দিবে।
- অতপর অজু করাবে প্রথমে মুখ ধুয়ে তারপর ডান হাত কুনী পর্যন্তপরে বাম হাত, মাথা মসেহ্ করাবে। হাতে ভিজা কাপড় মোড়ায়ে কানের ভিতর ও বাহির মসেহ্ করে পরিস্কার করে নেবে গরদন ও মসেহ্ করাবে। তারপর ডান পা, পরে বাম পা ধৌত করাবে। মাইয়াতের ওযুতে কবজা পর্যন্তহাত ধোয়া, কুল্লি করানো, নাকে পানি দেয়া নেই, অবশ্যই হাতে ভিজা কাপড় মোড়ায়ে দাঁত মাড়ীসহ এবং মুখের ভিতর ধুয়ে নিবে। চুল ও দাঁড়ি সুগন্ধ সাবান দিয়া পরিস্কারভাবে ধুয়ে নিবে।
- তারপর মাইয়াতকে বাম কাতে শোয়ায়ে মাথা হতে পা পর্যন্তসারা শরীরে পানি ঢালবে; যেন এক লোম পরিমাণ জায়গাও শুকনা না থাকে।
- অনুরূপভাবে ডান কাতে শোয়াইয়া গোসল দেবে। তারপর
- মাইয়াতকে টেক লাগায়ে বসায়ে পেটের উপরে ও নিচে হাত দিয়ে নরম হস্তে আস্তে আস্তে কয়েকবার মালিশ করবে, কোন ময়লা বাহির হলে শুকনা কাপড়ের টুকরা দিয়া মুছিয়ে পরে ভিজা কাপড়ের টুকরা দিয়া মুছবে।
- সারা শরীরে সুগন্ধ সাবান দিয়ে, দ্বিতীয়বার গোসল দিবে। ওযু দোহরাতে হবে না।
- পানিতে সামান্য কাফুর দিয়ে তৃতীয় বার গোসল দেবে।

- এবার এক টুকরা শুকনা কাপড় দিয়ে সামনে ও পিছনে (লজ্জাস্থান) মুছে শুকায়ে নিবে, আর এক টুকরা শুকনা কাপড় দিয়ে সারা শরীর মুছে শুকায়ে নিবে।
- যারা গোসল দিবে বা সাহায্য করবে ওই লোকগুলো ছাড়া অন্য কেহ গোসল দেওয়ার সময় দেখবে না।
- গোসলদাতা ঘনিষ্ট আপন লোক হওয়া, দ্বীনদার, পরহেজগার, আমানতদার হওয়া চাই, যেন মাইয়াতের কোন দোষ কারো কাছে প্রকাশ না করে; বরং গোপন রাখে, হ্যাঁ কোন গুন দেখলে প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু কোন বদ আক্বিদা বা জঘন্য ফাছেকের কোন আয়ব (দোষ) পরিলক্ষণ করলে যেমন হাদীস শরীফ মতে ওহাবী, জমাতি, তাবলিগিদের মৃত্যুর পরে চেহরা পরিবর্তনের ও নানা জাহান্নামি আজাব দর্শিত হওয়ার কথা অন্যের হেদায়েতের জন্যে প্রকাশ ও ব্যক্ত করতে পারবে।
- গোসলদাতা ব্যক্তি পাক পবিত্র হওয়া চাই।
- মেয়েলোককে মেয়েলোকে পুরুষকে পুরুষে গোশল দিবে। ছোট ছেলেমেয়েকে নারী পুরুষ উভয়ে গোসল দিতে পারবে।
- এমন ছোট ছেলেমেয়ে যে নামায বুঝেনা তাকে গোসল দিতে ওযু করাতে হবে না। তাছাড়া
- স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়, এমন কি ওই সময়ে অন্য পুরুষের সাথে নিকাহের কথা বলাও হারাম। তবে মাজুর (আপ্রাপ্যতা) এর বেলায় স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে।
- কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। হ্যাঁ মুখ চাইতে পারবে, তবে স্বামী স্ত্রীকে হাতে স্পর্শ করতে পারবে না। জানাজার খাট কাঁধে নিতে পারবে, (স্বামী স্ত্রীকে) মাইয়াতকে (স্বামী স্ত্রীকে) কবরে নামাতে পারবে।
- উল্লেখ্য কাফন পড়ানোর আগে আবার দেখবে যে মৃত হতে কোন ময়লা বের হয়েছে কিনা, বাহির হলে শুকনা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মুছে নিবে, পরে ভিজা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মুছে দিবে। এতে দ্বিতীয়বার ওযু গোসল এর প্রয়োজন নেই। মাইয়াত দ্বিতীয়বার গোসল দেয়া অবৈধ।
- মেয়েলোককে গোসলের পর চুল পেছনের দিকে না রেখে সিনার উপর এনে রাখবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ❖ মৃতের মাথার চুল বা দাড়ী আঁচড়াবে না, নখ কাটবে না, যেসব লোম মুড়াতে হয় প্রয়োজন হলেও মুড়াবে না এবং ঐ প্রেক্ষিতে মুড়ালে-আন্ডার সেভ করা গুণাহের কাজ।
- ❖ গোসল দাতার জন্য মাইয়াতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা অপরিহার্য নয়।
- ❖ মুসলমানের জন্য নখ পালিশ ব্যবহার করা হারাম এতে ওযু গোসল শুদ্ধ হয় না। নামায পড়া কুরআন তেলাওয়াত করা মসজিদে প্রবেশ করা তার জন্য জায়েয নেই সুতরাং মাইয়াতের নখ পালিশ থাকলে দূরিভূত করা ছাড়া গোসল হবে না। মাইয়াত নারী হউক বা পুরুষ হউক তার চোখে সুর্মা লাগাবে না, ইহা কঠোরভাবে নিষেধ।

মইয়াতের চোখ বন্ধ করা সংক্রান্ত একটি হাদীসে নববী:

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকাল করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখার জন্য তাঁর ঘরে তাশরিফ নিলেন এবং আবু সালমাকে দেখলেন, ঐ সময় হযরত আবু সালমার চোখ খোলা অবস্থায় দেখলেন। যেমন সাধারণত মৃতের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত মোবারক দ্বারা হযরত আবু সালমা (রা.)'র চোখ বন্ধ করলেন এবং ইরশাদ করলেন-

"إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ"

অর্থাৎ- যখন রূহ চলে যায়, তখন মইয়েতের চোখ সেদিকে তাকিয়ে থাকে।[২৯]

অতএব মৃত ব্যক্তির যদি চোখ খোলা থাকে, তা বন্ধ করে দেয়া বা আমাদের দেশে যে প্রথা প্রচলিত আছে যথা

১. মৃত্যুশয্যার ব্যক্তির পাশে বড় বড় করে কালেমাই শাহাদাত পড়া।
২. সাকরাতে মউত আসানীর সাথে হাওয়ার জন্য সূরা ইয়াসিন পড়া।
৩. দেহ থেকে রূহ চলে যাবার পর পর মৃতের দু'হাতকে নামাযের অবস্থার মত করে দেয়া;
৪. চেহারা ক্বিবলার দিক করে দেয়া।

[২৯]. মুসলিম- ৯২০, আবু দাউদ- ৩১১৮, উবনু মাজাহ- ১৪৫৪, মুসনাদে আহমদ- ২৬৫৪৩।

৫. মৃতকে গোসল দেয়ার পর সালাতে জানাযার পূর্ব পর্যন্ত মুর্দাকে যেখানে রাখা হয়, মৃতদেহ সামনে নিয়ে মাইয়াতের মাগফেরাত কামনায় তিলাওয়াতে কুরআন
৬. তাহলীল আদায় করা সুন্নাহ সম্মত এবং বৈধ।

কাফন পরিধানের বিবরণ:

পুরুষের জন্য কাফন মাত্র তিনটি:

১. কমিস (পীরহান)-এটা ঘাড় হতে পা পর্যন্তহবে।
২. এজার-যা মস্তক হতে পা পর্যন্তথাকবে।
৩. লেফাফা-যা এজার হতে কিঞ্চিৎ বেশী লম্বা হওয়া দরকার এবং তা দ্বারা মাথা ও পায়ের বাইরে যেন বাঁধ দিতে পারা যায় ওই পরিমাণ লম্বা হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীলোকের জন্য উপরোল্লেখিত তিনটিসহ আরো দু'টি অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করাতে হবে।

১. দামানী (ওড়না)-যা দুই হাত লম্বা অর্ধ হাত চওড়া হওয়া চাই।
২. সিনাবন্ধ-যা দৈর্ঘ্যে ২/৩ হাত এবং প্রস্থে বগল হতে হাটু পর্যন্তহবে। উল্লেখ থাকে যে, কাফনের বস্ত্রের ব্যাপারে সঠিক পরিমাপ মৃত্যু ব্যক্তির উপরই নির্ধারণ করা শ্রেয়। এবং কাফনের কাপড় সাদা রংয়ের হওয়াও একান্তবাঞ্চনীয়।

তায়াম্মুমের বিবরণ:

পানির অভাবে কিংবা পানি ব্যবহারে অক্ষমতা হেতু মাটি অথবা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা অযু ও গোসলের কাজ সম্পন্ন করাকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়। বালি, পাথর, চুনা, ইট ইত্যাদি মাটি জাতীয় বস্তুতে ধুলা না থাকলেও তাদ্বারা 'তায়াম্মুম' করা বৈধ।

যে সব কারণে তায়াম্মুম করা যেতে পারে:

(এক) এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে,
(দুই) পানি সঙ্গে আছে কিন্তু তা ব্যয় করে ফেললে নিজে কিংবা সঙ্গী লোকজন অথবা জীব-জন্তু পিপাসায় কষ্ট পাবার আশংকা থাকলে।
(তিন) পানি আনার পথে শত্রু কিংবা হিংস্র জন্তু ইত্যাদির ভয় থাকলে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

(চার) কূপ থেকে পানি উঠাবার কোন উপায় না থাকলে এবং
(পাঁচ) পানির মূল্য পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকলে তাছাড়া
(ছয়) ওযু বা গোসল (পানি দ্বারা) করার দরুন পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে এভাবে
(সাত) শীতকালে অযু বা গোসল করলে শরীরে কোন-প্রকার অপকার-সাধনের আশংকা থাকলে এবং
(আট) জানাযা বা ঈদের নামায না পাবার আশঙ্কা থাকলে ওযুর পরিবর্তে 'তায়াম্মুম' করা বৈধ।

উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির অলী ওয়ারিশ (অভিভাবক) জানাযার জন্য এবং বাদশাহ্ জানাযা ও ঈদ উভয় প্রকার নামাযের ক্ষেত্রে ওযু ব্যতীত 'তায়াম্মুম' দ্বারা পড়তে পারবেন না। যেহেতু তাদের জন্য উভয় নামায বিলম্ব করা যেতে পারে বাদশা ও অলি ওয়ারিশ হাওয়ার কারণে।

অযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে একই তায়াম্মুমে একাধিক নামায আদায় করা যায়। তবে যখনই পানি মিলবে তখনই তাকে পানি দ্বারা অযু করে নামায পড়তে হবে; তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা আদায়কৃত নামায দোহরাতে হবে না। কাযা ও করতে হবে না।

এছাড়া রুগ্ন ব্যক্তি যিনি ওজরের কারণে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতুনভাবে অযু করতে হয় এমন মুসল্লি প্রতি ওয়াক্তের ওযু করে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে যে কোন নামায, কুরআন তেলওয়াত শুধুমাত্র ঐ একই ওয়াক্তে আদায় করতে পারেন; তবে এক্ষেত্রে অন্য ওয়াক্ত নামায এর জন্য পুনঃঅযু করতে হবে। কিন্তু তায়াম্মুমের জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে, শুধুমাত্র তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ছাড়া। প্রকাশ থাকে যে, যা দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয়, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণও তাই।

জ্ঞাতব্যঃ

গোসল ও ওযুর পরিবর্তে নিম্নোক্ত নিয়মে একই 'তায়াম্মুম' যথেষ্ট দুইবার বা আলাদা অথবা পুনঃবার নিষ্প্রয়োজন।

তায়াম্মুমের ফরযঃ

(এক) নিয়ত করা,
(দুই) পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় কোন বস্তুর উপর দু'হাত মেরে মুখমণ্ডল মসেহ্ করা এবং

(তিন) আবার হাত মেরে উভয় হাত কুনুই পর্যন্তমসেহ্ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাতঃ

(এক) 'বিস্‌মিল্লাহ্ .....' পাঠ করে তায়াম্মুম আরম্ভ করা,
(দুই) পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর উভয় হাত মারা।

তায়াম্মুম ভঙ্গ হওয়ার কারণঃ

যেসব কারণে ওযু ভঙ্গ হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। উপরন্তু পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে।

তাইয়াম্মুমের নিয়তঃ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু ত্বায়াম্মুমা লেরাফ্‌ইল হাদাসে ওয়াছ্‌তেবা হাতিস্ সালাতে ওয়াতাকার্রোবান ইলাল্লাহি তা'আলা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

অনেকে রুগগ্রস্থতা ও অসুখের সময় গোসল করতে না পারলে নামায ছেড়ে বসে, ইহা মারাত্মক ভুল। বরং যতদিন পর্যন্তগোসল করলে ক্ষতি হবার আশংকা থাকে ততদিন পর্যন্ততায়াম্মুম করে নামায পড়তে থাকবে। তার মানে ওযু করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, তবে তায়াম্মুম করবে, এভাবে গোসলের পরিবর্তে ও তায়াম্মুম করবে।

আর যদি অযু গোসল উভয়ই অসুস্থব্যক্তির ক্ষতি সাধন করবে বলে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার অভিমত দেয় উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নিবে। ওযু ও গোসলের জন্য একবারই তায়াম্মুম (প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন ভাবে) করলে যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তির এমন কোন রোগ আছে, যে রোগের কারণে তার ওযু রাখা সম্ভবপর হয় না। যথা প্রমেহের দোষ, সর্বদা ফোটা ফোটা মনি, মযি নির্গত হয়, কিম্বা বহুমুত্র বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যার প্রস্রাব বের হয়, এবং সর্বদা ফোটা ফোটা প্রস্রাব হতে থাকে, বা এই জাতীয় কোন পীড়া থাকলে প্রত্যেক নামাযের জন্যে তাজা ওযু করে নামায পড়বে। ওই নামাযের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ততার ঐ এক ওযুই যথেষ্ট; তার কাপড়ও নাপাক হবেনা, বিনা সন্দেহে উক্ত কাপড় সহকারে নামায পড়তে পারবে। অতঃপর নতুবা ওয়াক্ত নামাযের জন্য নুতন অযু করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

❖ স্বরণতব্য যে, আগেকার বুর্যগানে দ্বীনগণ নামাযে প্রায়শঃ আলাদা কাপড় ব্যবহার করতেন। যেমন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) জীবনী পর্যালোচনা করলে তাঁর জীবন চরিত্রে এ রকম তথ্য পাওয়া যায়।

❖ ময়লা যুক্ত কর্দমাক্ত পানি সংক্রান্তএকটি মাসআলা এরূপ যে, জমিন বা ক্ষেতের পানি, উহার নাপাকীর অবস্থা জানা না থাকলে উহা পাক বলে গণ্য হবে। অনেকে এইরূপ পানির ছিটা কাপড়ে লাগলে নামায পড়ে না। অথচ উহা নাপাক হওয়ার কথা শরীয়তে সাব্যস্ত করেনা। বর্ষাকালে, শহরের অলি গলির পানি ও কাদা নাজাসাতে খফিফা। উহা দ্বারা তখনই কাপড় নাপাক হবে যখন এক চতুর্থাংশ কাপড়ে পানি লাগবে। তদুপরি "আল্ আশবাহ্ ওয়ান্নাজায়ের" গ্রন্থে বর্ণিত যে, গলি পথের কাদামাটি বা তার উপর পড়া পানির ছিটা যা হতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় নাপাক মনে করা ঠিক না। সুতরাং অলি গলির কাদা মাটির পানির ছিটা কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক বলে মনে করে নিজেকে নাপাক বা অপবিত্র জেনে নামায তরক করা অত্যন্তদোষের ও গুণাহের কাজ।

হায়য্ ও নিফাস্:

নিফাস্-এর নিম্নতম মুদ্দত (সময়সীমা) নেই। সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ না হলে 'তাহুর' (পবিত্রতা) ধরা হবে। নিফাসের উর্ধ্বতম মুদ্দত বা সময়সীমা হচ্ছে ৪০ দিন ও ৪০ রাত।

আর 'হায়য্'-এর নিম্নতম 'মুদ্দত' (সময়সীমা) হচ্ছে তিন দিন ও তিন রাত এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে দশদিন ও দশ রাত। 'হায়য্' ও 'নিফাস'-এর রক্ত বন্ধ হওয়ার পরই পবিত্র হয়ে সেই ওয়াক্ত থেকে নামায পড়তে হবে। সেই ওয়াক্তের নামায না পড়লে ওই নামাযের অবশ্যই ক্বাযা আদায় করতে হবে। 'হায়য্ ও 'নিফাস্'-এর দিন গুলোর রোযা কাযা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীলোকের হায়য্ ও নিফাসের দিনগুলোর নামায আদায় বা কাযা করার প্রয়োজন নেই এবং শরিয়ত প্রণেতা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নারী সমাজের প্রতি বিশেষ ছাড় ও অনুগ্রহ হিসাবে উক্ত নামায সমূহ ক্ষমাকৃত।

পবিত্রতা সম্পর্কিত কতেক মসায়েল:

❖ গোবর দিয়ে ঘরের মেঝে লেপন করলে সেটার উপর নামায পড়া জায়েয নয়। নামায আদায় করলে তা বিশুদ্ধও হবে না।

❖ নাজাসতে গলিজা বা নাপাকী এমন বস্তুতে লেগেছে যে সব বস্তু ধোয়ার পর মোছড়ানো যায় না যেমন-চাটাই, মাদুর কাঁথা, লেপ ও তোষক ইত্যাদি, সেগুলো ধৌত করে এভাবে পবিত্র করতে হবে যে, একবার ধৌত করে তা কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। যখন তা থেকে পানির ফোটা ঝরা বন্ধ হয়, তখন পুনঃবার তা ধৌত করবে-এভাবে তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হবে।

❖ মানুষ ও হালাল পশুর মুখ পবিত্র থাকলে তাদের উচ্ছিষ্ট পাক। কিন্তু শুকর, কুকুর, হিংস্র পশু এবং মুখে মদের চিহ্ন আছে এমন মানুষের উচ্ছিষ্ট নাপাক।

❖ শিকারী পাখী যেমন-কাক, চিল ও বাজ ইত্যাদি এবং যেসব জীব ঘরে বাস করে, যেমন-ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট পাক। তবে ব্যবহার করা মাকরূহ-ই-তান্যীহী।

মণী (বীর্য), মযী ও ওদী:

যৌনাঙ্গ থেকে নির্গত (তরল গাড় পিচ্ছিল বস্তু) বীর্যকে আরবীতে 'মনী' বলা হয়। তাতে এক প্রকার দুর্গন্ধ থাকে।

কাম ভাব উদয় হবার পরও বীর্য বের হবার পূর্বে কামোত্তেজনা ভাবে বা ব্যতীত যে তরল (পিচ্ছিল) বস্তু বের হয় তাকেই 'মযী' বলা হয়।

প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে কামভাব ছাড়া (রোগের কারণে) যে পাতলা পুঁজের মত তরল পদার্থ বের হয় তাকে আরবীতে 'ওদী' বলা হয়।

'মযী' বা 'ওদী' নির্গত হলে গোসল ফরয হয়না; ওযুই যথেষ্ট; কিন্তু 'মণী' বা বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়।

নাপাকীর প্রকার

নাপাকী (অপবিত্রতা) দু'প্রকার:

একঃ গ'লীযাহ্ (কঠিন)ঃ

যেমন-মলমূত্র, প্রবহমান রক্ত, মরদেহ, হারাম জন্তুর পায়খানা-প্রস্রাব, এবং ওই সমস্ত জিনিষ, যে গুলোর কারণে ওযু নষ্ট হয়ে যায়, যেমন-মুখভর্তি বমি করা, নাক দিয়ে রক্ত ঝরা ইত্যাদি।

দুইঃ খফীফাহ্ (হালকা)ঃ

যেমনঃ হালাল জন্তুর প্রস্রাব ও হারাম পাখীর উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ:

অজানাবশতঃ বিশেষ অবস্থায় 'যাহেরী নাজাসাতে গলীযাহ্' বা 'প্রকাশ্য কঠিন অপবিত্র বস্তু' এক দিরহামের কম পরিমাণ লাগলে তা ধৌত না করে নামায আদায় করা বৈধ: এবং নামায ও দোহরাতে হবে না। তবে মাসয়ালা হচ্ছে- এক দিরহামের সমপরিমাণ লাগলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। হ্যাঁ, এক দিরহামের অধিক পরিমাণ লাগলে তা ধৌত করা ফরয। ফিকৃহ্শাস্ত্রবিদগণের এক দিরহামের ব্যাখ্যা হচ্ছে- যেমন মনে করুন আপনার হাতের তালু দেখাচ্ছেন ডাক্তারকে। হাতমুক্ত অবস্থায় আপনার হাতের তালুতে যে পরিমাণ বা পরিধির মোতাবেক পানি আপনার হাতে তালুর ঠিক মাঝ বরাবর গড়িয়ে না পড়ে থেকে যাবে: তাই হচ্ছে এক দিরহাম।

হাতের তালুর গভীরতার সম পরিমাণ 'তরল' ও 'চার আনা মুদ্রা' অপেক্ষা সামান্য অধিক পরিমাণ কঠিন 'খফীফা নাপাকী, শরীরে লাগলে বা সমগ্র শরীরের এক চতুর্থাংশের কম পরিমাণ লাগলেও উক্ত নাপাকী সহকারে নামায আদায় করা বৈধ। অবশ্য নাপাকী ধৌত করে নামায পড়া উত্তম।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'গোসলের সুন্নাত' সমূহের মধ্যে একটা হচ্ছে 'নামাযের ওযুর' ন্যায় গোসলের পূর্বেও 'ওযু' করা।

নাপাকী সম্পর্কিত এক অদ্ভূত ফতোয়া:

বাতিল দেওবন্দী সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট আলেম মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী সাহেব কর্তৃক প্রণীত 'বেহেশ্তী যেওর' (উর্দু সংস্করণ, আমার কাছে সংরক্ষিত) ২য় খন্ডঃ 'নাজাসাত (নাপাকী) অধ্যায়-এর ১৬ পৃষ্ঠায় লিখা হয় যে, 'হাতের মধ্যে কোন নাপাকী লেগে থাকলে তা কেউ জিহ্বা দ্বারা তিন বার চেটে নিলেও তা পরিস্কার পবিত্র হয়ে যাবে।'

প্রিয় পাঠকগণ! মেয়েলোকদের জন্য লিখিত 'থানভী' সাহেবের 'বেহেশ্তী যেওর' পড়ে নাপাকী জিহ্বা দ্বারা চেটে নেয়ার চেষ্টা করবেন না। কেননা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন স্থান রাখেননি যেখানে আগুন কিংবা পানি অথবা মাটি নেই যা দ্বারা তাঁর বান্দাগণ উপকৃত হয়। কিন্তু মৌং থানভী সাহেব নারীদের জন্য লিখিত উক্ত কিতাবে এমন কথা লিখে আবার কেনই বা বললেন, 'মুখে চেটে নেয়া উচিত নয়'। এর রহস্য কি সে

নিজেই জানেন। তবে, পাঠক সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ রইলো যেন তাঁরা ভুল বশতঃও উক্ত ফতোয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন।

ইস্তিন্জার বয়ান

মলমূত্র ত্যাগ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:

(এক) আল্লাহর নাম না লওয়া
(দুই) যিকর না করা
(তিন) আযানের জবাব না দেয়া
(চার) স্বীয় গুপ্ত স্থানের দিকে না তাকানো
(পাঁচ) পায়খানা বা প্রস্রাব খানায় থুথু, (পায়খানা বা প্রস্রাব খানায় থুথু ফেললে দন্তরোগ দেখা দেয়)। নাকের শ্লেষ্মা না ফেলা
(ছয়) গরগরা না করা
(সাত) আকাশের দিকে না তাকানো এবং
(আট) অকারণে পায়খানায় বেশীক্ষণ বসে না থাকা, স্মর্তব্য যে, মলত্যাগের সময় বাম পায়ের উপর ভর করে বসা উচিত। তাছাড়া
(নয়) ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পৃষ্ঠ দিয়ে বসে পায়খানা বা প্রস্রাব করা- ইহা শুধু বয়স্কদের জন্য নিষিদ্ধ নয়, বরং ছোট বালক-বালিকাদেরকেও ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পৃষ্ঠ ফিরিয়ে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য দাঁড় করানো বা বসানোও শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ। অসাবধানতাবশতঃ যদি কেহ ক্বিবলার দিকে মুখ বা পৃষ্ঠ দিয়ে বসে বা বসায় তবে স্মরণ হওয়া মাত্রই অন্য দিকে ফিরে যেতে বা ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং
(দশ) চন্দ্র ও সূর্যকে সামনে বা পেছনে রেখে, নদী, পুকুর ও কূপের নিকটবর্তী স্থানে মলমূত্র ত্যাগ না করা, ও
(এগার) ফলদার ও ছায়াদার বৃক্ষের নীচে, কবরস্থানে, রাস্তার পার্শ্বে, শক্ত মাটির উপর প্রস্রাব-পায়খানা না করা, এভাবে
(বার) ইঁদুর, পিপীলিকার বা অন্য গর্তে বা ছিদ্রে অথবা এমন কোন স্থানে যেখানে লোকে বিশ্রাম নেয় সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা। এবং
(তের) মসজিদ ও ঈদগাহের নিকটে মলমূত্র ত্যাগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ, এ ছাড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

(চৌদ্দ) বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় প্রস্রাব করা, নীচে বসে উঁচু স্থানের দিকে প্রস্রাব করা গুনাহ্‌র কাজ। প্রস্রাবের পর মূত্র সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হওয়াও আবশ্যক। সন্দেহপূর্ণাবস্থায় ইস্তেঞ্জা (পবিত্রতার্জনে উদ্যোগী হওয়া) করলে গুণাহ্‌গার হবে।

(পনের) হাঁড়, খাদ্যদ্রব্য, গোবরের উপর প্রস্রাব-পায়খানা করা কিংবা 'ইস্তেঞ্জা' (পবিত্রার্জনে ব্যবহার করা) গুনাহের কাজ। লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের দেশে কোন কোন সূফী প্রকৃতির লোকেরা মসজিদের জন্য আনীত ইট বা কংকরকে ঢিলা রূপে ব্যবহার করে থাকেন। এটা জঘন্য ও গর্হিত কাজ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া ইরশাদে নববী (দঃ) মতে ঐ হাঁড় মানবের উচ্ছিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য, জ্বীন জাতির খাদ্য হিসাবে বিবেচিত ৬০।

(ষোল) ভগ্ন পাত্রের টুকরা, কয়লা, পশুর খাদ্যদ্রব্য এবং অপবিত্র বস্তুকে পবিত্রতার্জনের লক্ষ্যে ঢিলারূপে ব্যবহার করা বৈধ নয়।

(সতের) কাগজ দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা নিষিদ্ধ যদিও সেটার উপর আবু জাহল বা কাফিরের নাম লিপিবদ্ধ থাকে। এবং

(আঠার) যেসব লোকের এমন রোগ হয়, বা পেশাব টপবে যার কারণে ওযু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না, তারা প্রত্যেক নামাযের জন্য তাজা ওযু করবে। ঐ নামাযের সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে তার ওযু যাবে না এবং কাপড়ও অপবিত্র হবে না। নিঃসন্দেহে ওই কাপড় নিয়ে সে পূর্ণ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে, এটাই শরীয়তের হুকুম।

(উনিশ) ঢিলা গ্রহণ কালে মিসওয়াক না করা।

(বিশ) সজোরে প্রবাহিত বাতাসের দিকে প্রস্রাব না করা।

(একুশ) ঢিলা বা টিস্যু ব্যবহারের পর পানি দ্বারা প্রশ্রাব-পায়খানার রাস্তাকে হাতে ডলে-মৈথুন করে ধোয়া। শুধুমাত্র পানি ঢেলে দিলে কোন অবস্থাতেই পবিত্র হবেনা। আর পবিত্র না হওয়ার ফলে তার কোন এবাদত-বন্দেগী শুদ্ধ হবেনা। বরং অপবিত্র অবস্থায় ইবাদত করার কারণে গুনাহগার হবে।

[৬০]. তিরমিজী- ১৮, মুনাদে আহমদ- ৪১৪৯।

'শরীর অপবিত্র' ও 'ওযুবিহীন ব্যক্তি' সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

❖ শরীর অপবিত্র হবার কারণে গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য তৎক্ষণাৎ গোসল করা 'ওয়াজিব' নয়। হ্যাঁ যখন নামায আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন ওয়াজিব। তবে যদি এত দেরী হয় যে, নামাযের সময় উপস্থিত হয়ে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় তৎক্ষণাৎ গোসল করে নেয়া ফরয। তবে গোসল করতে বিলম্ব না করা চাই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ঘরের মধ্যে, গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি গোসল না করে ঘরে অবস্থান করে: সে ঘরে রহমতের ফিরিশ্‌তা (শান্তির দূত) আগমন করেন না।" ৬১

উল্লেখ্য যে, 'জনাবত'-এর গোসল না করলে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি হয়। আর হায়যাবস্থায় স্ত্রী সংগম করলেও 'জুযাম' বা কুষ্ঠরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

❖ মানুষের শরীরে যতক্ষণ কোন প্রকাশ্য নাপাকী, যেমন মল মূত্র ইত্যাদি না লাগে ততক্ষণ সে অপবিত্র হবে না। এ ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা, মুসলিম অমুসলিম, জীবিত ও মৃত সবই এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

❖ মানুষ বে ওযু হলে বা তার উপর গোসল ফরয হলে: সে অপবিত্র বলে বিবেচ্য হবে মাত্র। অতএব তার ঘাম, মুখের লালা ও তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র।

❖ গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। হ্যাঁ যদি অপারগতায় প্রবেশ করতে হয়, যেমন পানির বালতি বা ড্রাম মসজিদের ভিতরে থাকে, তা বের করে আনার মতও কেউ সেখানে না থাকে, তখন তায়াম্মুম করে যথাশীঘ্র সম্ভব বালতি বা ড্রাম ইত্যাদি মসজিদ থেকে বের করে নিয়ে আসবে।

❖ কোন ('ইতেকাফকারী') ব্যক্তির মসজিদে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তখন নিদ্রাভঙ্গের সাথে সাথেই যেখানে সে নিদ্রারত ছিল, সেখানেই তায়াম্মুম করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসবে। দেরী করা হারাম।

[৬১]. আবু দাউদ- ২২৭, ৪১৫৩, নাসায়ী- ২৬১, মুসনাদে আহমদ- ৬৩২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা, কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, (যদিও কুরআনের কোন পাতা সাদা থাকে,) দেখে দেখে তেলাওয়াত করা, কুরআনের আয়াত তাবিজে বা অন্যত্র লিখা বা স্পর্শ করা, কুরআনের আয়াতযুক্ত অংশটি স্পর্শ করা বা পরিধান করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। অনুরূপভাবে, তার জন্য 'হরূফে মুক্বাত্তা'আত' (কুরআনের বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহ) সম্বলিত তাবিজ বা তা খোদাইকৃত আংটি পরিধান করা হারাম।
- যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে ওই ব্যক্তির জন্য আযান ও সালামের জবাব দেয়া জায়েয। অনুরূপভাবে, তাস্‌বীহ, তাহ্‌লীল ও দুরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়েয। তবে উত্তম পন্থা, ওযু বা কুল্লি করে পাঠ করা চাই। ওই অবস্থায় কুরআন শরীফ দেখলে (যদিও অক্ষরসমূহের উপর দৃষ্টি পড়ে ও শব্দসমূহ বুঝতে পারে, মুখে পাঠ না করে, স্মৃতিগোচর হয়ে যায় তবে) কোন অসুবিধা নেই।
- অপবিত্র ও বেওযূ ব্যক্তি ফিক্বহ্ ও হাদীসের কিতাব সমূহ স্পর্শ করা মাক্‌রূহ। হ্যাঁ যে কাগজে ক্বোরআনে করীমের আয়াত লিপিবদ্ধ আছে সেটার উপর হাত রাখা হারাম।
- কুরআন পাকের অনুবাদ-ফার্সী, উর্দু বাংলা অথবা অন্য যে কোন ভাষায় হোক না কেন, স্পর্শ করার বেলায়ও মুল কুরআনের কপি স্পর্শ করার বিধানাবলী মেনে চলতে হবে।
- অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মজিদ লিখা হারাম এবং বেঅযূ অবস্থায়ও কুরআন মজিদ লিপিবদ্ধ করা না জায়েয।
- বেঅযূ ব্যক্তির জন্য কুরআন শরীফে হাত লাগানো ব্যতিরেখে তেলাওয়াত করা, মুখে বা ইশারায় যিকর আয্‌কার করা, দুরূদ শরীফ ও তাস্‌বীহ তাহ্‌লীল পাঠ করা, কারো সালামের জবাব দেয়া, হাঁচির পর 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা, অথবা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলে জবাব দেয়া এবং আযানের জবাব দেয়াও জায়েয। হ্যাঁ, ওযু সহকারেই যিকর-আয্‌কার, তাস্‌বীহ্ তাহ্‌লীল ও দুরূদ শরীফ পাঠ করা সর্বোত্তম পন্থা। এতে সওয়াবও বেশী পাওয়া যায়।
- যে ব্যক্তি বে-ওযু, তার জন্য কুরআন মজিদ বা কুরআনের কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম। হ্যাঁ, স্পর্শ করা ব্যতিরেকে মুখে বা দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে কোন অসুবিধা নেই।

'হায়য' ও 'নিফাস' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য:

- স্ত্রীলোকের মাসিক 'রক্তস্রাব' ঋতুস্রাব' (হায়য) ও প্রসবোত্তর কালীন 'রক্তস্রাব' (নিফাস) অবস্থায় কুরআন পাকে হাত লাগানো সম্পূর্ণরূপে হারাম। যদিও বা কুরআন করীমের উপর কোন কিছুর আচ্ছাদন থাকে। আচ্ছাদিত কুরআন মজীদের উপর হাত বা 'আঙ্গুলের নখ' অথবা শরীরের যে কোন অঙ্গ লাগানো বা লেগে যাওয়া উভয়ই হারাম।
- কাপড়ের কোণা অথবা ওড়নার আঁচল দ্বারা অথবা এমন কাপড় শরীরের সাথে যা পরিধান বা পরিবেষ্টন করা আছে, কুরআন মজিদ (রক্তস্রাব, ঋতুস্রাবযুক্ত মহিলার গোসল ওয়াজিবের বেলায়) স্পর্শ করা হারাম। হ্যাঁ, যদি 'জুয্‌দান' বে অযু পুরুষের বেলায় কাপড় বা চামড়ার আবরণ দ্বারা আবৃত কুরআন করীম হয়: তখন ওই জুয্‌দান স্পর্শ করতে কোন অসুবিধা নেই। এভাবে রুমাল ইত্যাদি কাপড় দ্বারা ছোঁয়া, (শুধু বে ওযু পুরুষের ক্ষেত্রে) যা না নিজে পরিধান করুক বা নাই করুক তাহলে স্পর্শ করা জায়েয আছে।
- (মহিলার ক্ষেত্রে) আর পরিধেয় ঋতুস্রাব, রক্তস্রাবকালীন মহিলার বস্ত্রের আঁচল, ওড়নার, এমন কি চাদরের এক কোণ্ কাঁধের উপর থাকলে অপর কোণ্ দ্বারা কুরআন মজিদ স্পর্শ করা ও লওয়া হারাম। (কেননা ঐ মহিলা পরিধানকৃত বস্ত্র যেমন শরীরের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, তদ্রূপ চাদর ইত্যাদিও ওই সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে)
- মাসিক 'রক্তস্রাব' অবস্থায় নারীদের মসজিদে প্রবেশ করা, তাওয়াফ করা, কুরআন করীম দেখা বা তেলাওয়াত করা, কোন আয়াতে করীমাহ্ লিপিবদ্ধ করা বা আয়াতযুক্ত তাবীয্ বানানো, অথবা এমন তাবীয্ বা আংটি ছোঁয়া বা পরিধান করা, যার উপর কুরআনের 'হরূফে মুক্বাত্তা'আত' লিপিবদ্ধ থাকে, ব্যবহার হারাম।
- হায়য ও নিফাস হয়েছে এমন নারীর ঘাম, মুখের লালা, তার উচ্ছিষ্ট পানি, তার হাতে রন্ধনকৃত রুটি, তরকারী ও ভাত ইত্যাদি পবিত্র। অপবিত্র মনে করা জাহেলী।
- স্বীয় ঋতুস্রাব হওয়া স্ত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করা জায়েয। স্বামী শুধু সংগম করা ছাড়া একই চাদরের নীচে ঘুমানো ইত্যাদি জায়েয বরং পূণ্যময়ও বটে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

❖ ঋতুস্রাব অবস্থায় সংগম করা হারাম এবং হারাম জেনেও যদি কোন স্বামী সংগম করে বসে; তাহলে জঘন্য গুনাহ্‌র ভাগী হবে। তওবা করা তার উপর ফরয। আর ওই হারামকে হালাল জানলে তা হবে কুফরী।

মিস্‌ওয়াক সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য:

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমার উম্মতের উপর প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে 'মিস্‌ওয়াক' করাটা কঠিন ও কষ্টসাধ্য হবে অনুভব না করতাম তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে উম্মতের উপর 'মিসওয়াক' করাটা একান্ত আবশ্যকীয় হিসাবে ঘোষনা দিতাম। আর আমার উম্মতও যদি মিসওয়াক করার মধ্যে কতো ফজিলত রয়েছে জানতেন তাহলে তাঁরা আপন শয়ন স্থানে শিয়রের পাশে 'মিসওয়াক' নিয়ে রাত্রি যাপন করতেন। [৬২]

'মিসওয়াক' কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সমান মোটা হবে ও তা এক বিঘতের অধিক না হওয়া চাই। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এক শ্রেণীর আমেলে সুন্নাতের দাবীদার (!) মিসওয়াকের সাইজ না জেনে গরু-ছাগলের খুঁটির মত বড় বড় সাইজের মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকেন। আশা করি, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হবেন। মিসওয়াক তিক্ত গাছের ডালা হওয়া উত্তম। এতে দাঁত শক্ত হয় ও হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। মিসওয়াক ধরার নিয়ম হচ্ছে-ডান হাতের তিন আঙ্গুল-অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদাত মিসওয়াকের উপরে, আর তর্জনী ও কনিষ্ঠা মিসওয়াকের নীচে রেখে ডান দিক থেকে মিসওয়াক আরম্ভ করতে হয়। এবং ইহাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকা। তাছাড়া ঐ এক বিঘত মিসওয়াক নিশেঃষ হয়ে গেলে তা কোন অপবিত্র স্থানে না পেলানোই সুন্নাত তরিকা। পূর্ববর্তী মনিষীগণ উপরোক্ত মতেই আমল করেছেন।

মিসওয়াককরণ সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য:

প্রিয় পাঠক নিশ্চয় মিসওয়াক করা কত গুরুত্ব ফজিলত এবং পূণ্যময়ী কাজ তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাদিস দ্বারা অনুধাবণ করেছেন, কতেক মাযহাবেই নামাযের পূর্বে মিসওয়াকের বিধান রয়েছে। সরওয়ারে কারেনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার অন্তিম

[৬২] . বুখারী- ৮৮৭. মুসলিম-৪২, আবু দাউদ- ৪৭, তিরমিজী- ২২।

শয়নেরত অবস্থায়ও আমাদের মাতা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মুখে নরম করায়ে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াক করেছিলেন, অতঃপর ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন।

অতএব এতবড় বরকতময় মিসওয়াক করাকে যদি আমরা বর্জন করি বা করলেও ইসতিনজারত অবস্থায় করি, তাহলে সওয়াব অর্জন করলেন না গুণাহগার হলেন। প্রিয় পাঠক নিজেই সিদ্ধান্তনিবেন। কেননা প্রস্রাব পায়খানা ত্যাগরত অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়াও যেভাবে অবৈধ, মিসওয়াক ঐ সময় করবেন কিনা আপনার বিবেকের কাছে জেনে নিবেন। আল্লাহ্‌ আমাদের হিদায়াত করুক। আমিন।

মিসওয়াকের দো'য়া:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ

আল্লাহুম্মা বারিক লী ফীহে।

উল্লেখ্য যে, জানা থাকলেও সম্ভব হলে এই দোয়া পড়ে পড়ে "মিসওয়াক" করা অতি উত্তম।

পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

❖ অযু ও ইস্তিঞ্জার পর অবশিষ্ট পানি পাক, না পাক মনে করে ফেলে দেয়া দোষ এবং অপব্যয়। বরং ওযুর পানির সম্মানার্থে তা ইস্তিনজায় মলমুত্রত্যাগের পর পরিস্কারের জন্য ব্যবহার না করা ভাল। এবং তা হতে এক মুষ্টি পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। ইস্তিঞ্জার পর অবশিষ্ট পানি অন্য কাজে এমনকি ওযুতেও ব্যবহার করতে পারবে।

❖ যে পানি ওযু ও গোসল করার সময় (অঙ্গ ধোয়াপানি) যা ঝরে পড়ে, তা পাক বটে কিন্তু ওই পানি দিয়া, ওযু ও গোসল করা বা কোন কিছু পাক করা জায়েয নয়।

❖ তদরূপ বে-ওযু ব্যক্তির হাত বা আঙ্গুল বা আঙ্গুলের এক গিরা, নখ অথবা শরীরের যে কোন অংশ, বা ধৌত করা পানি (ব্যবহারিত পানি) ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে পানিতে পড়ে অথবা ডুবাবে: তবে ওই পানি অযু ও গোসলের উপযোগী থাকবে না বা ওই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন অবৈধ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ❖ হ্যাঁ অবৈধ ও পবিত্রতা অনুপযোগী পানির স্থানও পাত্র এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। যদি ওই পানির "দাহদার দাহ" দৈর্ঘ্য প্রস্ত দশ দশ হাত অপেক্ষা কম হয়, যেমন বদনার, বালটির, কলসির, ড্রামের পানি ইত্যাদি দ্বারা উপরোক্তভাবে হলে পবিত্রতা অর্জন অবৈধ।
- ❖ তদরূপ যার উপর গোসল ফরয, তার শরীরের কোন একাংশ ধৌত করা ছাড়া পানিতে লেগে যায়, তবে ওই পানিও ওযু গোসলের উপযোগী থাকবে না। যদি ধৌত করা হাত বা শরীরের কোন অংশ লাগে বা পড়ে, তবে দোষ নেই। হ্যাঁ ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যই ঐ পানিও ব্যবহার বৈধ বা দুরস্ত।
- ❖ ছোট ছোট গর্তের পানি, যেখানে কোন নাপাকী পড়ার কথা জানা না থাকে; তবে ওই পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয।
- ❖ অনিচ্ছা সত্তে হাঁটু পর্যন্তকাপড় উঠে গেলে বা সতর খুলে গেলে, নিজের বা অন্যের সতর দেখলে বা স্পর্শ করলে (ডাক্তাররা বা বিশেষ প্রয়োজনে স্পর্শ অথবা দেখলে) অযু ভঙ্গ হয় না।
- ❖ নাকের পানি, ময়লা, থুথু, ঘাম, শরীরের ময়লা, কাঁশ, ক্রন্দনে চক্ষু হতে যে পানি বের হয়–পবিত্র, তাতে ওযু ভঙ্গ হয় না।
- ❖ ছোট শিশু, যে দুধ পান করে বমি করলে, যদি মুখভর্তি হয়, তবে নাপাক। দেরহামের বেশী যেই জায়গায় লেগে যাবে, নাপাক করে দিবে এবং তা ওই সময় যদি পেট হতে আসে। আর যদি পেটে পৌঁছার আগে সীনা হতে আসে, তবে পাক। কাশীর বমি যতই হউক ওযু ভঙ্গ করে না।

কোন ধরনের পানি দ্বারা ওযু ও গোসল জায়েযঃ

- ❖ বৃষ্টির পানি, সমুদ্র, নদী, দরিয়া, নালা, চশমা, কুপ, বড় হাউজ, বড় পুকুর, প্রবাহিত পানি, কুয়াশা, বরফ এইসব পানি দ্বারা ওযু ও গোসল, প্রত্যেক রকমের পবিত্রতা অর্জন জায়েয বা বৈধ।
- ❖ 'দাহদারদাহ' অর্থাৎ দশহাত লম্বা দশহাত চওড়া পানির যে হাউজ, কুপ বা পুকুর হয় তাকে দাহদারদাহ বা বড় হাউজ বলা হয়। অনুরূপ যদি বিশ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া হয়, বা পঁচিশ হাত লম্বা, চারহাত চাওড়া হয়। গভীরতা এতটুকু যথেষ্ট যেন হাউজ বা কুপের কোন দিকের জমিনের তলা যাতে হাতে না লাগে। এ ধরনের পানির হুকুম প্রবাহিত

পানিরই হুকুম। নাপাকী পড়লে পানি অপবিত্র হবে না (তবে ঐ নাপাক শরীয়ত মোতাবেক অপসারণ করতে হবে), হ্যাঁ যতক্ষণ নাপাকীর কারণে রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন না হয়।

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

নামাযঃ

"নামায ইসলামের মেরুদন্ড"।[৬৩] সমস্ত এবাদতের মধ্যে নামায আল্লাহ্ পাকের অতিশয় প্রিয় বস্তু। হযরত আদম (আ.) হতে আমাদের নবী, খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই নামায ছিল। ইসলামে ঈমানের পর নামাযই প্রধান ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন, 'বালেগ' (প্রাপ্ত বয়স্ক)-এর উপর নামায ফরয। যে কোন পুরুষ, নারী, ধনী, দরিদ্র, সুস্থ, রুগ্ন-এমনকি কমপক্ষে ইশারা-ইঙ্গিতে নামায পড়তে সক্ষম ব্যক্তি; মৃত্যুর পূর্বক্ষণের মুহূর্ত পর্যন্ত (জ্ঞান বহাল থাকা) নামায আদায় করতে হবে; কারো জন্য ক্ষমা নেই।

কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে নামাযের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগীদ দেয়া হয়েছে। এমনকি মু'মিন এবং কাফিরের মধ্যে নামাযকে পার্থক্য হিসেবে সাব্যস্থ করা হয়েছে। শুধু তা নয়,পবিত্র হাদীসে মানুষকে সত্যিকার অর্থে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নামই একমাত্র সুষ্ঠু উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নামায পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সময় নিষ্ঠা, আনুগত্য, সততা, অসৎকাজ ও অন্যায় পরিহার, ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা, সমতা, শৃঙ্খলা, ন্যায় পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির শিক্ষা দেয়।

এছাড়া মি'রাজ রজনীতে মহান রাব্বুল আলামিন প্রথমত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আমাদের জন্য ফরয করেছেন। পরে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামায ক্ষমা করেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিনিময়ে। অর্থাৎ পঞ্চাশ ওয়াক্ত আদায়ের পূণ্য উম্মতে মুহাম্মদীর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্য পাঁচ ওয়াক্তে প্রদান করবেন প্রতিশ্রুতিতে। এখন নামায আদায়ে পাঁচ ওয়াক্ত হলেও সাওয়াবে প্রতি ওয়াক্তে অতিরিক্ত দশগুণ হিসাবে পঞ্চাশের সাওয়াব পাওয়া যাবে আশা করা যায় আলহামদু লিল্লাহ্।

---

[৬৩]. জামে' তিরমিযী-২৬১৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

❖ এই ভিত্তিতে নামায পাঁচ ওয়াক্ত ফরয হওয়ার পেছনে বিভিন্ন রেওয়ায়েত হিকমতের কথা মুহাদ্দেসিন মুফাচ্ছেরিনরা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে এখানে এতটুকুই জেনে রাখা আবশ্যক যে, মানবকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহকারে সৃষ্টি করেছেন, অতএব, ওই ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগঠিত পাপ পংকিলতা দূরীভূত করার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র উপর ফরয করেছেন।

পাদটিকা:

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ওয়াক্ত মোতাবেক পাঞ্জগানা নামায যে ফরজ: এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন হাকীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا-

"অতঃপর তোমরা যখন নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদ মুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে" উপরোক্ত আয়াতে কোরাআনের স্পষ্ট অর্থ দ্বারা প্রমাণিত যে, নামায প্রত্যেক মুমিন নর নারীর উপর ফরয এবং নির্দিষ্ট সময়ে"। [৬৪]

এভাবে আল্লাহ জাল্লাশানুহু আয়াতে কুরআন দ্বারাই নামাযের নাম, ও সময় বাতলিয়ে দিয়েছেন। যেমন- ইরশাদ হয়েছে-

وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায টিক রাখবে। (অর্থাৎ ফজর ও আসর) এবং রাতেরও প্রান্তভাগে: (অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামায) পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দুর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক"। [৬৫]

[৬৪]. সূরা আন-নিসা-১০৩।
[৬৫]. সূরা হূদ-১১৪।

সালাতে আসর, ফজর, ইশা ও জোহরের নামাযের সময় ও নামের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে করিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ-

"অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় (মাগরিবের নামায) ও সকালে (ফজরের নামায) নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে তারই প্রশংসা"। [৬৬]
অপর আয়াতে করীমায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন-

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا-

"নামায কায়েম রাখুন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠে রাত্রির ফিরিশতাগণও উপস্থিত থাকেন এবং দিনের ফিরিশতাগণও এসে হাজির হন"। [৬৭]

অধিকাংশ কুরআনুল করিমের ব্যাখ্যাকারকগণ মত দিয়েছেন যে, এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। এভাবে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে যার দ্বারা পঞ্জেগানা নামায, সময়, নাম সর্বোপরী তার মহাত্ব, গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ প্রিয় পাঠকদের খেদমতে একটি আয়াতের মর্মার্থ পেশ করছি। পবিত্র কুরআনে হাকিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبَارَ السُّجُودِ-

"অতএব তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালন কর্তার (অর্থাৎ সালাতে ফজর ও আসরের নামায) সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। রাত্রির কিছু অংশে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও" ৬৮।

[৬৬]. সূরা আর-রূম-১৭,১৮।
[৬৭]. সূরা বনি ইসরাঈল-৭৮।
[৬৮]. সূরা ক্বাফ- ৩৯,৪০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহীহ্ হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবাহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লাহ', ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' এবং ১ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা যুল-জালালে ওয়াল ইকরামি ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' পাঠ করবে তার গুণাহ সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হলেও তার গুণাহ মাফ ও মোচন হয়ে যাবে। [৬৯]

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট যে, ক্বোরআনে করীমের প্রায় শতোধিক আয়াতে করীমায় নামাযের নির্দেশ, নামাযের প্রতি তাগীদ, নামাযীর প্রশংসা, বে-নামাযী এবং নামাযে অবহেলা কারীদের কুৎসা ও ঘৃণার কথা, বিভৎস শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চার ইমামের মধ্যে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, নামায পরিত্যাগকারী কাফির। হযরত ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, সে প্রাণদণ্ডের উপযোগী অপরাধী। আমাদের ইমাম, ইমামে আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, তাকে কঠোর শাস্তি ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইত্যাদি দিতে হবে। আর নামাযকে কেউ হেয় প্রতিপন্ন বা নামায নিয়ে বিদ্রুপ করলে অথবা নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে কিংবা ঘৃণা করলে অথবা তা 'ফরয' হওয়ার বিধানকে অস্বীকার করলে নিঃসন্দেহে ও সর্বস্মতভাবে সে কাফির হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ্।

নামায হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজিরা প্রদান বা মহান মনিবের সাথে সাক্ষাত করা। আর এ জন্যেই নামাযকে মু'মিনগণের মি'রাজ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ নামায আদায়ের জন্য রয়েছে নির্ধারিত বিধি-নিষেধ, বিভিন্ন পূর্বশর্ত ও নিয়ম কানুন। এগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব: প্রকারান্তে, হারাম, মাক্রূহে তাহ্রীমী, মাক্রূহে তান্যীহী, অধিকতর উত্তম-বর্জন, নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সুতরাং নামাযে এ গুলোর প্রতি পরিপূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। নিম্নে সংক্ষেপে ও ধারাবাহিকভাবে এ প্রসঙ্গে বিবরণ দেয়া হয়েছে যা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

[৬৯]. বুখারী- ৬৪০৫, মুসলিম- ৫৯৭, আবু দাউদ- ১৫০৪, তিরমিজী-৩৪৬৬।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ জাল্লা শা-নুহু ঈমানদার বান্দাদেরকে তার বন্দেগীর সর্বোত্তম ও প্রথম সোপান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন নামায; এবং নামায কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। নামাযের নিয়ম ও পদ্ধতি পূর্ণভাবে আদায় করে নামায পড়াই হচ্ছে নামায কায়েম করা। নিজে নামায পড়া, অপরকেও পড়তে উদ্ধুদ্ধ করা; পরিবার ও সমাজের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করণে প্রচেষ্টা করা ইবাদতের অংশ ও অত্যন্ত পূণ্যময়ী।

হাদীসে পাকে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

"তোমরা ওই নিয়মে নামায আদায় কর, যে নিয়মে আমাকে নামায আদায় করতে দেখ" ৭০ অপর এক বর্ণনায় আছে, একজন গাঁয়ের লোককে যথা নিয়মে নামায আদায় করছে না দেখতে পেয়ে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» অর্থাৎ "তুমি গিয়ে পুনরায় নামায আদায় কর, কারণ তুমি নামাযই আদায় করনি।" ৭১ এভাবে গিয়ে তিনবার পড়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নামাযের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। আর ঘোষণা করলেন যে, যদি ওই ধরণের নামায পড়া অবস্থায় তোমার মৃত্যু হতো তাহলে 'গাইরে ইসলাম' (ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম মতে)–এর উপরই তোমার মৃত্যু ঘটত।

এক বর্ণনায় এসেছে যে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً، الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا؟ قَالَ: " لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (র.) হতে বর্ণিত, ছরকারে কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে যে নামায চুরি করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, নামায কিভাবে চুরি

[৭০]. সহীহ ইবনু হিব্বান-১৬৫৮, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৩৮৫৬, সুনানে দারকুতনী-১০৬৯।
[৭১]. সহীহ বুখারী-৭৫৭, সহীহ মুসলিম-৩৯৭,

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে যথাযথভাবে রুকু-সিজদা আদায় করেনা"। [৭২]

অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্বাওমাহ্ আদায় করে না, দু'সাজদার মধ্যখানে বসে 'জলসা' আদায় করে না, সাজ্‌দায় নাক ও কপাল দু'টো মাটিতে না লাগায়, মোট কথা, নামাযের পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন করে নামায আদায় করেনা সে মুসল্লীই বড় চোর। নাউযুবিল্লাহ্।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি) মাক্‌তুবাত শরীফ'-এ লিখেছেন, "লোকেরা অধিক পরিমাণে রিয়াযত ও ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করুক; কিন্তু একাগ্রতার সাথে যথাযথভাবে নিয়ম পদ্ধতি পালন করে নামায আদায় করার চাইতে বড় নেয়ামত (স্বর্গীয় আশীর্বাদ) আর কিছুই নেই।" নামায ঈমানদারের জন্য খোদা প্রাপ্তিরই অন্যতম সোপান।

নামাযের বাহিরের ফরয সমূহ:

নামাযের ফরয সমূহ দু'ধরণের। যেমন-কতিপয় ফরয, যে গুলো নামায আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত; সেগুলোকে নামায আদায়ের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হয় বলে নামাযের শর্তাবলী বা আহকামে সালাত বলা হয়। ওই পূর্বশর্তাবলী সর্বমোট ৭ (সাত) টি, যা নিম্নরূপ-

(এক) ওযু বা গোসল দ্বারা শরীর পাক করা।

(দুই) মুসাল্লীর কাপড় পাক হওয়া।

(তিন) নামাযের জায়গা পাক হওয়া।

(চার) সতর ঢাকা-পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, স্ত্রী-লোকের জন্য মুখ-হাত ও পা ব্যতীত সমুদয় শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া।

(পাঁচ) নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া, অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়া এবং

(ছয়) যে ওয়াক্তের নামায আদায় করবে সে ওয়াক্তের নিয়ত করা; নিয়ত মনে মনে করা যায়, তবে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা মুস্তাহাব এবং 'মুস্তাহ্‌সান' (উত্তম) (কবীরী)

[৭২] মুসনাদে আহমদ-১১৫৩২, মুয়াত্তা ইমাম মালেক-৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান-১৮৮৮।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

জামাতের সময় যদি মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করতে গিয়ে ইমামের সাথে রাকআত হারানোর সম্ভাবনা থাকে, তবে এহেন অবস্থায় মৌখিক নিয়ত না জায়েয বা 'নিস্প্রয়োজন'। সুতরাং তখন মনে মনে নিয়ত করে নামাযে শামিল হয়ে যেতে হবে

এবং

(সাত) কিব্‌লামুখী হয়ে নামায আদায় করা।

নামাযের ফরযসমূহ (ভিতরের) সবিস্তারে বর্ণনা:

কিছু এমন ফরয আছে- যা ছাড়া নামায আরম্ভ করা যায় না, এইসবকে নামাযের রোকন; অথবা নামায আরম্ভের পূর্ব শর্ত বলা হয়। ফরয মানে ওই খোদায়ী আদেশ যা অবশ্যই পালনীয়। আর কিছু এমন ফরয বা অবশ্য করণীয় আছে যা নামাযের ভিতরে পাওয়া যেতে হয়, এই সমস্তকে নামাযের শর্ত বলা হয়, তা হতে একটাও বাদ গেলে, নামায হবে না; সাহু সিজদা দিলেও নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

১. হাদস ও নাপাকী হতে শরীর পাক হওয়া

২. পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া। শরীরে ও কাপড়ে এক দিরহামের কম আর কাপড়ের চার ভাগের এক ভাগের কম নাজাসতে খফিফা (হালকা) লেগে থাকলে, তাছাড়া এর অধিক লেগে থাকলে নামায শুদ্ধ হবে না।

৩. নামাযের স্থান পাক হওয়া। অন্ততঃ পা, হাঁটু, হাত রাখার এবং সেজদা দেওয়ার স্থানসমূহ পাক হতে হবে।

৪. সতরে আওরাত অর্থাৎ পুরুষের নাভি হতে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্তএবং মেয়ে লোকের পা ও হাতের তালু ছাড়া সমস্ত শরীর (ঢাকা) আবৃত করা। উল্লেখিত আবৃত (ঢাকা) স্থান সমূহকে 'আওরত' বলে। উল্লেখ্য স্ত্রীলোকের চুল ও আওরতের মধ্যে গণ্য। যে কাপড় পরিধান করলে শরীরের বর্ণ প্রকাশ পায় এরূপ পাতলা কাপড় পড়া দোরস্ত নহে বা অবৈধ।

৫ শরীরের যেসব অঙ্গ আওরত (সতর) হিসাবে গণ্য, নামাযের মধ্যে তার যে কোন একটির এক চতুর্থাংশ বা ততোধিক অনাবৃত অবস্থায় থাকলে, নামায দোরস্ত হবে না। যদি কয়েকটি অঙ্গের কিছু কিছু স্থান করে খোলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে, এবং ওগুলো সমষ্টি একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ হয়, তবে নামায দোরস্ত হবে না, অন্যথায় দোরস্ত হবে।

৬ পরিধানের কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় নামায আদায় করতে হবে।

৭ পাগড়ি বেধে নামায আদায় মুস্তাহাব। হাদীস শরফে এসেছে, "পাগড়ি সহ দু'রাকায়াত নামায পাগড়ি বিহীন সত্তর রাকাআতের চেয়ে উত্তম"।[৭৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দায়েমী সুন্নাত পুরুষের পাগড়ি বা শিরোভূষণ

প্রকাশ থাকে যে, পাগড়ি বা শিরোভূষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতে দায়েমী হলেও আহলে হাদীস নামক ইংরেজ সৃষ্ট এই ভ্রান্ত দলটি মুসলিম সমাজ থেকে এই সুন্নাতটি মিটিয়ে দিতে সচেষ্ট রয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে তো এর ব্যবহার নাই-ই উপরন্তু তার বক্তৃতা বিবৃতি, আলাপ-আলোচনা ও প্রচার-প্রকাশনা কোথাও এই সুন্নাতের বিবরণ নাই। অথচ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থের সহীহ হাদীস সমূহের আলোকে নিশ্চিতরূপে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সভা-সমাবেশ, যুদ্ধকাল ও ওয়াজ-নসীহতের সময় পাগড়ি পরিধান করতেন। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা মুবারকে শোভা পাচ্ছিল পাগড়ি। সাহাবী হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের দিন ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় ছিল একটি কালো পাগড়ি।' [৭৪]

খুতবা প্রদানকালে তিনি পাগড়ি পরতেন। সাহাবী আমর ইবন হুরাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

[৭২]. জামেউল আহাদীস লিস-সুয়ূতী-১২৭৭৪, মুসনাদুল ফিরদাউস লিদ-দাইলামী-৩২৩৩৩।
[৭৪]. সহীহ মুসলিম-১৩৫৮

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সামনে খুতবা দিলেন তখন তাঁর মাথা মুবারকে ছিল কালো পাগড়ি'। [৭৫]

সাহাবী আমর ইবন হুরাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অপর বর্ণনায় বলেন,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

'আমি যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি মিম্বরে বসে খুতবা দিচ্ছেন আর তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে একটি কালো পাগড়ি, যার দুই প্রান্ত তিনি তাঁর দুই কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।' [৭৬]

আরেক হাদীসে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ ، مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একটি চাদর যা দিয়ে তাঁর দু'কাঁধ পেচিয়ে ছিল আর তাঁর মাথায় ছিল কালো কাপড়ের ইসাবাহ (এক ধরনের পাগড়ি)। এভাবেই তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে খুতবা প্রদান করলেন।' [৭৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু নিজেই পাগড়ি পরেননি, সাহাবীদেরও তিনি বিভিন্ন সময় পাগড়ি পরিয়েও দিয়েছেন। বিশেষত কাউকে সেনাপতি বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণকালে তিনি তাকে নিজ হাতে পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছেন বলে একাধিক সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের পাগড়ি :

[৭৫]. সহীহ মুসলিম-১৩৫৯।
[৭৬]. সহীহ মুসলিম : ১৩৫৯।
[৭৭]. সহীহ বুখারী : ৩৮০০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহাবায়ে কেরামের পাগড়ি পরিধান সম্পর্কেও বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবন দিনার (রহ.) বলেন,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ.»

'একবার হজের সফরে মক্কার পথে এক বেদুঈন আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবদুল্লাহ তাঁকে সালাম দেন এবং তাকে নিজের বাহন গাধার পিঠে বসিয়ে নেন। আর নিজ মাথা থেকে পাগড়ি খুলে তাকে দিয়ে দেন। আমরা তাঁকে বললাম, এরা তো বেদুঈন, এরা তো অল্পতেই খুশি হয় (এত বড় উপহার দেয়ার কী দরকার ছিল?)। আবদুল্লাহ বললেন, এর পিতা আমার পিতা ওমর ইবন খাত্তাবের বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পিতার সেবাযত্নের পদ্ধতি হলো, পিতার প্রিয় মানুষদের সেবাযত্ন করা।" [৭৮]

এছাড়া ঈদের দিনে সাহাবায়ে কেরাম সবিশেষ পাগড়ি পরতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। [৭৯]

যেভাবে পাগড়ি পরতেন :

তাবেঈ আবু আবদুস সালাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবন উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পাগড়ি পরিধান করতেন? তিনি বললেন, "পাগড়ি তিনি মাথায় পেচিয়ে নিতেন, পেছন দিক থেকে গুজে দিতেন এবং প্রান্তদ্বয় উভয় কাঁধের মাঝ বরারব ঝুলিয়ে দিতেন।" [৮০]

[৭৮]. সহীহ মুসলিম-৬৬৭৭।
[৭৯]. সুনানুল কুবরা বাইহাকী-৫/১৭৮; বাইহাকী-৫/১৭৪।
[৮০]. মাজমাউয-যাওয়ায়েদ : ৫/১২০।

পগড়ীর প্রান্তদ্বয়ঃ

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ির প্রান্তদ্বয় উভয় কাঁধ বরাবর পেছনে ঝুলিয়ে দিতেন। তবে কতটুকুন ঝুলাতেন সে ব্যাপারে ফুকহায়ে কেরাম তিনটি পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

১. এক বিগত পরিমাণ।
২. মধ্য পীঠ বরাবর।
৩. পীঠের নীচ পর্যন্ত।

বিখ্যাত ফতওয়ার কিতাব মাজমাউল আনহার উল্লেখিত রয়েছে যে,

وَالسُّنَّةُ: إِرْخَاءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ هَكَذَا فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ثُمَّ قِيلَ قَدْرَ شِبْرٍ، وَقِيلَ إِلَى وَسَطِ الظَّهْرِ، وَقِيلَ إِلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ.

অর্থাৎ "সুন্নাত হল পাগড়ির প্রান্তকে উভয় কাঁধ বরাবর ঝুলিয়ে দেয়া। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ করেছেন। কতটুকুন ঝুলাবেন এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেনে এক বিগত, আবার কেউ বলেছেন মধ্য পীঠ বরাবর, আর কেউ মতামত দিয়েছেন পীঠের নীচ প্রান্ত পর্যন্ত। [৮১]

পাগড়ির রঙ :

উপরিউক্ত মুসলিম ও বুখারীর বর্ণনাসহ অধিকাংশ হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়, সফরে ও যুদ্ধেক্ষেত্রে কালো রঙের পাগড়ি পরেছেন। কালো রঙ ছাড়া হলুদ রঙের পাগড়ি পরেছেন বলেও কিছু হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হলুদ পাগড়ির প্রচলন ছিল। বদরের যুদ্ধে তাঁরা ফেরেশতাদের মাথায় হলুদ পাগড়ি দেখেছেন বলেও গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা রঙের পাগড়ি পরিয়েছেন এবং একে সমর্থন

[৮১]. মাজমাউল আনহার-২/৫৩২. মুলতাকাল আবহার- ১/১৯১ ;

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন বলেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু 'অ'নহুকে সেনাপতি বানানোর সময় তিনি সাদা পাগড়ি পরিয়েছেন।[৮২] এছাড়া সাহাবায়ে কেরাম সবুজ ও লাল রঙের পাগড়ি পরেছেন বলেও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের চার বীর সাহাবী চার ধরণের পাগড়ী পরতেন। তাঁদের এজন হচ্ছেন সৈয়দুশ শুহাদা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি পাখির ডানা দিয়ে তৈরী পাগড়ী পরতেন। আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন, হযরত আলী ইবনু আবি তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি পশমের তৈরী সাদা পাগড়ীধারী। তৃতীয় হচ্ছেন, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি পরতেন হলুদ পাগড়ী। আর চতুর্থ সাহাবী হযরত আবু দুজানাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরতেন লাল পাগড়ী। তিনি লাল পাগড়ী মাথায় বাঁধলেই সবাই বলাবলি করত "মৃত্যুর পাগড়ি ওয়ালা'। উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘোষণা করলেন, আমার তরবারী কে নিবে? তখন সবাই নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন; "আমার তরবারীর উপযুক্ত ব্যক্তি কে"? শুনে সবাই চুপ হয়ে গেলেন কিন্তু এই অনন্য বীর হযরত আবু দুজানা ঘোষণা দিলেন, আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরবারী ধারণ করার উপযুক্ত।[৮৩]

যেহেতু পাগড়ি হচ্ছে পুরুষের ভূষণ বা সৌন্দর্য। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাগড়ি পরেছেন, অন্যদের পরিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সবযুগের বুজর্গ ব্যক্তিগণ পাগড়ি পরেছেন আর নামাজে আল্লাহ তায়ালা যে সৌন্দর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তার অংশ হিসেবে পাগড়ি ব্যবহার করা হলে তা অবশ্যই কামা ও উত্তম বলে গণ্য হবে। এ কথা বলাবাহুল্য যে, একজন আল্লাহর প্রতি সমর্পিত ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকৃত অনুসারীর বেলায় পাগড়ি ব্যবহার ও

[৮২]. মুসনাদ আহমদ : ৪/৫৮৩।

[৮৩]. সীরাতে ইবনু হিশাম-২/৬৮, সীরাতে ইবনু কাসীর-৩/৩২, আল-বিদায়া-৪/১৯, আস-সীরাতুল হালাবিয়া-২/৩০৭।

এতে উৎসাহিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পরেছেন এবং অন্যদের পরিয়েছেন আর তাঁর প্রকৃষ্ট অনুসারী শ্রেষ্ঠ মানুষদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামও তাঁর অনুকরণ করেছেন। তবে এটাকে মুত্তাকী বা পরহেজগারদের মাপকাঠি বানিয়ে ফেলা উচিত নয়। তাকওয়ার আসল পরিচয় পোশাকে নয়; আল্লাহর ভয়ে গুনাহ বর্জনের মাধ্যমেই তাকওয়ার প্রকাশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি পরেছেন এবং পরিয়েছেনে এটাই আমাদের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয়। আল্লাহ আমাদেরকে শরীয়তের সব বিষয়ে সঠিক অবস্থান ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাগড়ী পরিধান করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দায়েমী সুন্নাত হওয়া সত্বেও উহা পরিত্যাগ করে টুপির উপর মহিলাদের ঘোমটার আদলে লাল-সাদা রুমাল ঝুলিয়ে হারামাইন শরীফাইনে খুতবা ও নামায পড়াতে দেখলে আহলে হাদীস নামক ভণ্ড লা-মাযহাবীদের প্রতি ঘৃণা আসে। আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুন। আমীন।

- শুধু লুঙ্গী, পেন্ট, পায়জামা পরে খালী গায়ে নামায পড়া মাকরূহ।
- আওরাত অনাবৃত হওয়া মাত্র ঢেকে ফেললে নামায দোরস্ত হবে। কিন্তু নামাযের এক রোকন আদায় করার মত সময় অনাবৃত থাকলে নামায ফাছেদ (নষ্ট) হবে।
- নামাযী নামায অবস্থায় অসর্কাবস্থায় নিজের সতর বা লজ্জাস্থান দেখলে নামায ফাছেদ হবে না, কিন্তু মাকরূহ হবে।

৫. কেবলামূখী হয়ে নামায পড়া। নৌকা বা জাহাজে নামায পড়তেও মুখ কেবলার দিকে রাখতে হবে। দিক নির্ণয় করা সম্ভব না হলে, যে দিকে কেবলা বলে মন সাক্ষ্য দেয়, সে দিকে মুখ করে নামায পড়তে হবে। এমতবস্থায় যদি কেবলা সম্বন্ধে বিনা চিন্তায় নামায পড়া হয়, তবে ঘটনাক্রমে কেবলার দিকে মুখ থাকলেও নামায শুদ্ধ হবে না। আর চিন্তা ও মনের সাক্ষ্যের পর কেবলা নির্ণয়ে ভুল হলেও নামায দুহ্রাতে (পুনরায় পড়তে) হবে না। চিন্তা ভাবনার পর নামায আরম্ভ করলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাযের মধ্যে যদি অন্য দিকে কেবলা বলে মনে হয়, তবে নামাযের মধ্যেই সে দিকে ফিরে যাবে।

৬. প্রত্যেক ফরয নামায ও সালাতে বিতির নির্ধারিত ওয়াক্তে বা সময়ে পড়া।

৭. নিয়ত করা: ফরয নামাযের জন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা শর্ত, অর্থাৎ জোহর বা আসরের ফরয নামাযের ফরয নামাযের নিয়ত করছি। রাকাতের সংখ্যার নিয়ত করা জরুরী নহে। সুন্নাত ও নফলের জন্য সাধারণভাবে নামাযের নিয়ত করলেই চলবে মোক্তাদীর পক্ষে এই ইমামের পেছনে নামায পড়ছি, অর্থাৎ এইরূপ নিয়ত করতে হবেঃ ইকতিদাইতু বি হাজাল ইমাম।
আর ইমাম সাহেব নিয়ত করার বেলায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন এবং উপস্থিত হবেন তাঁদের ইমামতী করছি এইরূপ নিয়ত করতে হবে।
আরবিতে যেমন-

"আনা ইমামুন লেমান হাদ্বারা ওয়া মাই ইয়াহ্দুরু।"
জানাযার নামাযে জানাযা পুরুষ কি স্ত্রীলোকের অথবা ছোট ছেলে, মেয়ের, এ বিষয় নিয়ত করা আবশ্যক। যদি ও বিষয় জ্ঞাত হওয়া না যায় তা হলে এ বলে নিয়ত করবে- যে, ইমাম যাঁর জানাযা পড়ছেন আমিও তাঁর জানাযা পড়ছি।

৮. 'তাকবীরে তাহরীমা' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে নামায শুরু করা।

- দাঁড়িয়ে নামায আদায় কারীর জন্য সোজা দাঁড়িয়ে 'তাকবীর' বলা শর্ত। অনেকে ইমামকে রুকুর অবস্থায় পেয়ে ঝুঁকে পড়ে ও তাকবীর বলে, এটি দুরস্ত নয়।
- 'তাকবীরে তাহরীমা' শরিয়তের পরিভাষায় জানাযার নামাযের রোকন এবং অন্য সব নামাযের শর্ত হিসাবে গণ্য।

৯. "কিয়াম করা" অর্থাৎ দাঁড়ায়ে নামায পড়া ফরয। পাঁচ ওয়াক্তের ফরয, বিতির, ঈদের নামায এবং ফজরের নামাযের সুন্নাত দাঁড়ায়ে পড়া ফরয। বিনা ওযরে এসব নামায বসে পড়লে সহী হবে না। তবে চলন্তনৌকায় দাঁড়ায়ে সম্ভব না হলে অথবা নৌকা তীরে ভিড়াতে সক্ষম না হলে নামায বসে পড়লে দুরস্ত হবে। অনুরূপ ট্রেনেও চলমান বাসে বৈধ হবে না।

১০. 'ক্বিরাআত' পাঠ করা। লম্বা এক আয়াত, বা ছোট তিন আয়াত পড়া ফরয। মোক্তাদীর জন্য ক্বিরাআত পড়া নিষেধ।

- ইমাম ও একাকী নামাযীর পক্ষে ফরযের দুই রাকাতে, সুন্নাত, নফল, ঈদ ও বিতিরের সব রাকাতে ক্বিরাআত পড়া ফরয।
- একা পাঠরত মুসল্লি কিরাত পাঠ করার সময় নামাযী নিজে শুনতে পায় মত ক্বিরাআত পড়তে হবে। মনে মনে ক্বিরাআত পাঠ করলে নামায হবে না। যেহেতু পঠন বা তেলাওয়াত হয়নি।
- উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব মতে মুক্তাদীর পক্ষে ক্বিরাআত পড়া হারাম। যদি কেহ ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পড়ে তা'হলে তার নামায দুহরাতে হবে [৮৪]। কিন্তু জমাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেব রসায়েল মাসায়েল কিতাবের ১ম খণ্ডে লিখেছেন, "যখন ইমাম চুপে চুপে ক্বিরাআত পড়ে তখন মুক্তাদীও সূরা ফাতেহা পড়বে।"

❖ পাঠক! আপনী হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলে উক্ত ভ্রান্তমাসয়ালায় কান দেবেন না।

১১. 'রুকু': দাঁড়ায়ে নামায আদায়কারী রুকু করবার সময় অতটুকু ঝুকবে: যেন, উভয় হাত হাঁটুর গোড়ালী পর্যন্তপৌছে। আর বসে নামায আদায়কারী এমনভাবে রুকু করবে যেন মাথা হাঁটু বরাবর সমান হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন পায়ের উপর বসা অবস্থান হতে পাচা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়।

১২. 'সেজদা' নামাযের প্রত্যেক রাকাতে দুই সেজদা করা ফরয। কপাল, উভয় হাত সেজদার সময় জমিনে রাখা ফরয। নাক ও উভয় হাঁটু জমিনে রাখা ওয়াজিব। [৮৫]

- যদি সেজদার সময় পায়ের সমস্ত আঙ্গুল কেবলামুখি ও বাকী অংশ খাড়া না রাখে বরং পায়ের পিঠ (ইচ্ছাকৃত) জমিনে লাগিয়ে দেয়; তবে নামায জায়েয হবে না। [৮৬]
- যদি তিন তসবীহ অর্থাৎ তিনবার (মধ্যম পন্থায়) 'সোবহানাল্লাহ্' বলতে যতটুকু সময় লাগে অতক্ষণ পর্যন্তপায়ের সমস্ত আঙ্গুল জমিন হতে উঠতে থাকে: তবে নামায ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যাবে।

---

[৮৪]. আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া-২/৩১৯।
[৮৫]. দুররে মুখতার-১/৪৪৭।
[৮৬]. প্রাগুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- সেজদার সময় দু'পায়ের অন্ততঃ একটি করে আঙ্গুলের পেট মাটিতে রাখা এবং রাখা আঙ্গুলের মাথা কেবলামুখী রাখা ফরয।
- ❖ নামাযীকে সেজদার স্থানে দৃঢ়ভাবে কপাল স্থাপন করতে হবে। ঘাস, গালিচা, নরম বিছানা ইত্যাদির উপর সেজদা করলে কপাল লাগায়ে এমনভাবে চাপ দিতে হবে; যেন আর অধিক নীচের দিকে না ধেবে যায় অর্থাৎ স্পন্সে বা এমন নরম স্থানে সেজদা করা যা দ্বারা নাক ও কপালের অবস্থান অনেক উচু নিচু হয়ে যায়। নতুবা নামায দুরস্ত (শুদ্ধ) হবে না। নরম বিছানায় নাকের হাড় পর্যন্তনা লাগালে নামায হবে না।
- অপরদিকে মুসল্লির সেজদার স্থান পায়ের স্থান হতে এক বিঘত উচু হলে নামায দোরস্ত হবে না।

১৩. قعده أخيره 'কু'দায়ে আখীরা' অর্থাৎ শেষ বৈঠক; নামায শেষে তাশাহুদ পাঠ পরিমাণ সময় বসে থাকার নাম কু'দায়ে আখীরা। ইহা ফরয।

- নামাযের সমস্ত রোকন জাগ্রত অবস্থায় আদায় করতে হবে। কোন রোকন তন্দ্রা-নিদ্রাবস্থায় আদায় করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। জাগ্রত হয়ে পুনরায় ঐ নামায দুহ্রাতে (পুণঃ আদায় করতে) হবে।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ:

নামাযের ওয়াজিব ত্যাগ করা গুণাহ্, এতে নামায দুহ্রাতে (পুনঃবার) হয় না। হ্যাঁ ভুলক্রমে ছাড়লে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় এবং এর দ্বারা নামায শুদ্ধ হয়ে যায়।

১. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে এবং সুন্নাত, নফল ও বিতিরের প্রত্যেক রাকাতে 'আল্হামদু সুরা' পড়া। এমন কি এ থেকে এক আয়াতও ছুটে গেলে সাহু সেজদা দিতে হবে।

২. 'যাম্মে সুরা' অর্থাৎ সূরা ফাতেহা 'আল-হামদুর' সহিত অন্য সুরা মিলানো। বড় এক বা দুই আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান, যার অক্ষর সংখ্যা কমপক্ষে ত্রিশ অক্ষর হবে, অথবা এই পরিমাণ ছোট তিন আয়াত, ফরযের প্রথম দু'রাকাতে, সুন্নাত, নফল ও বিতিরের প্রত্যেক রাকাতে উল্লেখিত পরিমাণের ক্বেরাত পড়া ওয়াজিব।

৩. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত কেরাতের জন্য নির্দিষ্ট করা। যদি ভুলক্রমে ফরযের প্রথম দু'রাকাতে 'আলহামদু' ও 'সুরা' কোনটাই না পড়ে তবে পরের দু'রাকাতে পড়বে ও সাহু সেজদা আদায় করবে।

অপর সুরার আগেই 'সুরা ফাতেহা' পড়তে হবে। যদি 'সুরা ফাতেহা' না পড়ে অন্য কোন একটি সুরার একটি কালেমা (বাক্য) পড়ে ফেলে তবে ও সাহু সেজদা আদায় করা ওয়াজিব।

৪. 'তাদীলে আরকান' অর্থাৎ রুকু, সেজদায় রুকু হতে দাঁড়ায়ে দু'সেজদার মধ্যে বসে একবার 'সোব্হানাল্লাহ্' বলতে যতক্ষণ সময় লাগে অন্ততঃ ততক্ষণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা 'কাওমা'। তার মানে রুকুর পর দাঁড়ান ও জলসা অর্থাৎ দু'সেজদার মধ্যে বসা, বিশ্বস্ত মতানুসারে ওয়াজিব, ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে নামায দুহ্রাতে হবে। ভুলক্রমে ছুটেগেলে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব।

৫. কা'দায়ে উলা অর্থাৎ চার রাকাত ও তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাত পড়ে তাসাহুদ পড়ার পরিমাণ সময় বসা। শেষ বৈঠকের আগে যতবার বসতে হয়, সবই প্রথম বৈঠক হিসেবে ধরা হবে। চার রাকাতের বেশী নফল নামায রাত্রি কালে এক সালামে পড়া জায়েয। যথা আট রাকাতের নিয়ত করে থাকলে চার বার নামাযে বসতে হবে। চতুর্থবার বসা ফরয, তার আগের তিন বৈঠক ওয়াজিব। এমনিভাবে মাসবুক অর্থাৎ যার নামাযে কয়েক রাকাতই ইমামের সাথে ছুটে গিয়েছে; তার অবশিষ্ট নামায পড়বার কালে যদি কয়েকবার বসতে হয়, ওইগুলোর মধ্যে শেষ বৈঠক ছাড়া অপর সব বৈঠকই ওয়াজিব।

৬. 'তাশহুদ' অর্থাৎ প্রথম হতে শেষ পর্যন্তসমস্ত বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা ওয়াজিব। তাশাহুদের একটি শব্দও ছুটে গেলে সাহু সেজদা করা ওয়াজিব হয়। চার রাকাত ফরয নামাযে বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় অথবা বিতিরের নামাযের প্রথম বৈঠকে এক বারের বেশী তাশাহুদ পড়লে বা উঠলে এক রোকন পরিমাণ দেরী করলে, অথবা 'আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা' সৈয়্যেদেনা মুহাম্মদ' পরিমাণ পড়লে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে। তবে মুহাম্মদ শব্দ পাঠের পূর্বে স্মরণ হওয়ার কারণে 'মুহাম্মদ' পাঠ না করে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে সাহু সেজদা দিতে হবে না।

৭. নামাযের শেষ ভাগে, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' বলা অর্থাৎ নামায হতে বের হবার বা নামায শেষ করার উদ্দেশ্যে বলা। একা আদায়রত নামাযী সালাম কালে ডানে বামে ফেরেশতাদের সালাম করছি এই নিয়ত করবে। ইমাম উভয় পার্শ্বের ফেরেশতা ও মুক্তাদীদের, আর মুক্তাদী উভয়দিকের ফেরেশতাদের ও সঙ্গি নামাযীদের আর যেদিকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম থাকেন তার প্রতি সালামের নিয়ত করবে। যদি ঠিক ইমামের পেছনে দাঁড়ায়, তবে উভয় সালামে, ইমামের প্রতি সালামের নিয়ত করবে।

৮. **দোয়ায়ে তাশাহুদ সংক্রান্ত দৃষ্টি আকর্ষণঃ**

মুহতারাম পাঠক! ওয়াজিব সংক্রান্ত পয়েন্ট ছয় (৬) "তাশাহুদ" ও পয়েন্ট সাত (৭) নামাযের রাকাত শেষান্তে "সালাম" বিষয়ে "তাশাহুদে" ছরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "আসসালামু আকাইকা আইয়ুহান নবীয়ু" শব্দাবলী দ্বারা সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামকে হাজের নাজের: তথা উপস্থিত জ্ঞানে তাঁর প্রতি মনুযোগী হতে হবে। ফাতওয়ায়ে আলমগীরিতে এসেছে.

وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيَهَا الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ

অর্থাৎ তাশাহুদের শব্দাবলী উচ্চারণের সময় এর অর্থের প্রতি মনুযোগী হওয়া আবশ্যক [৮৭]।

অর্থাৎ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া, দ্বিতীয় সিজদাহ করা, সালাম ফিরানো ইত্যাদি যেমন ওয়াজিব অনুরূপভাবে তাশাহুদ ও দরূদ পড়ার সময় হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয়ার সময় তাঁর খেয়াল মনে ধারণ করাও ওয়াজিব। অথচ ভ্রান্ত ওয়াহাবীরা নামাযের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল করলে নামায হবেনা বলে ফাতওয়া দেয়। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করুন। আর নামায শেষান্তে "সালাম" বলার সময় উপরোক্ত বর্ণনা মত ও নিয়মে সুক্ষ্মদেহদারী ফেরেশতাদেরও উদ্দেশ্য করে সালাম পড়তে হয়; যা দোয়ায়ে তাশাহুদে বিদ্যমান, এবং ঐ "তাশাহুদ" ও "সালাম" বাংলাদেশে যেটা সৌদি আরবেও এক ও অভিন্ন: "তাশাহুদ" ও "সালাম" নিয়তেও অভিন্ন। নেই কোন মাযহাবের পার্থক্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশ-জাতী মাযহাব ভিন্নতার

[৮৭]. আলমগীরি-১/৭১।

কোন অবকাশ না রেখে মুসলমান বলতে প্রথমে নামাযই ইবাদত; এবং তা পালন করতে তাশাহুদ ও নামায শেষান্তে সালাম পঠনে নির্দিষ্ট দোয়া আরবী ভাষায় নির্মাণ করেছেন শরীয়ত প্রণেতা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যা পড়া ওয়াজিব তো বটেই; এবং যে দোয়া সংশাধনের সুযোগও নেই। চাই সে পশ্চিমা দেশের মুসলমান হউক বা প্রাচ্য দেশের। অর্থাৎ "তাশাহুদ" আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান নবীয়ু" এবং নামায শেষান্তে আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" পড়তেই হবে আরবীতে। যা সম্বন্ধ সূচক মাধ্যম পুরুষ সর্ব্বনামপদযুক্ত দোয়া, যা আরবী বাংলা ব্যকরনীক নিয়মে উপস্থিত লোকের জন্যই ব্যবহার করতে হয়।

এভাবে প্রথম বৈঠকে তাশহুদের পর দরুদ পড়ার বিধান নেই। অতএব অসাবধানতাবশতঃ বেখেয়ালে দুরুদে ইবরাহীমি পড়া শুরু করে 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম পর্যন্ত পড়লে সাহু সেজদা দিতে হবে, অন্যথায় নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়াকালিন মুসল্লির হৃদয়ে তাজিমে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপস্থিত ছিল।

তবে আমার দুঃখটা হল নামাযে ঐ অদৃশমান ও অনুপস্থিত হাবিবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফেরেশতার প্রতি সালাম পড়ার শব্দে উপস্থিত সম্বন্ধ সূচক সর্ব্বনামপদ ব্যবহারে আজ পর্যন্তকোন আলেম নয়· সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানও এই আপত্তি করে নাই ও করতেও পারবে না। কেননা মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বরণবিহীন কোন ইবাদত বন্দেগীই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতার অবকাশ নেই, আর ঐ "তাশাহুদ" ও নামায শেষান্তেদরুদ সালাম এর প্রথা পদ্ধতি-নির্মাণ স্বয়ং শরিয়ত প্রণেতা রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ই প্রবর্তন করেছেন। এছাড়া মুসলমান এর নামায অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ অনুশীলন করতে হবে; এছাড়া বৈকি।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঐ শ্রেণীর জ্ঞান পাপী বাতিল ফিরকার লোকেরা নামাযে হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেয়াল দুরস্ত নাই বলে ফতওয়া দেয় এবং ঐ নিয়ম ও নিয়তে সরওয়ারে কাউনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়ায়ে সালামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাপারে আপত্তি না করলেও নামাযের বাইরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঐ নিয়ম ও নিয়তে "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পড়া-বলা মিলাদ শরীফে পড়া-বলা (একা বা সম্মিলিত) শিরক বিদআত বলে ফতোয়া দেয়; যা গোমরাহী, কুফরী ও অজ্ঞতা ছাড়া বৈকি। আল্লাহ সকল মুমিনকে সিরাতে মুস্তাকিমে চলার তৈফিক দিন আমিন।

৯. বিতিরের নামাযে "দো'আয়ে কুনুত" পাঠ করা। দো'আয়ে কুনুত মুখস্ত না থাকলে এবং মুখস্ত না হওয়া পর্যন্ত

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

উচ্চারণঃ 'রাব্বানা আতেনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফীল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কেনা আজাবান্নার' বা তিনবার 'রাব্বিগফিরলী' পড়বে।

১০. তাক্‌বীরাতে ঈ'দাইন অর্থাৎ ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহার নামাযে অতিরিক্ত ছয় তকবীর বলা।

❖ ঈদের নামাযের নিয়ত পড়ার পর প্রথম তকবির হচ্ছে তাকবিরে তাহরীমা। তাই তাকবির বলার পর নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে দো'আ "সানা" পাঠ করতঃ প্রথম রাকাতে তিন তকবীর বলবে, ১ম রাকাতের ফাতেহা ও ক্বিরাত পাঠের পূর্বে ঈদের তিনটি তাকবির বলবে; ১ম দুইটিতে হাত উঠাবে ছেড়ে দেবে প্রত্যেক তকবীরেই কান পর্যন্তহাত উঠাবে: হাত ছেড়ে দিবে। তৃতীয় তকবিরে নামাযের মত হাত বেঁধে নিবে। তার মানে ১ম রাকাতে তকবিরে তাহরীমা সহ ৪টি তকবির হবে। অতঃপর সুরা ফাতেহা ও কিরাত পাঠ করবে অর্থাৎ তৃতীয় তকবীরের পর হাত বেঁধে ইমাম 'তাউজ' ও 'তাসমিয়া' পড়ে ক্বিরাআত শুরু করবে এবং যথানিয়মে ১ম রাকাত আদায় করবে। অতঃপর দু'রাকাত বিশিষ্ট এ নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাড়াবে এবং দ্বিতীয় রাকাতের সূরা ফাতেহা ও ক্বিরাআত যথানিয়মে শেষ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পুনঃরায় তিনবার আল্লাহু আকবর তকবীর বলবে। প্রত্যেকবারেই হাত উঠাবে। তিন তকবিরে হাত তুলবে, হাত ছেড়ে দিবে হাত বাঁধবে না। অর্থাৎ তৃতীয় তাকবীর পর্যন্তহাত উঠাবে কানের লতি পর্যন্তএবং দু'হাতের তালু ক্বিবলার দিক থাকে মত। তবে মনে রাখতে হবে যে, তৃতীয় তাকবিরে হাত না ছেড়ে নামাযের মত হাত বেঁধে নেবে। তার মানে ঐ তিন তাকবিরই ঈদের তাকবির হিসাবে বিবেচিত। এভাবে দ্বিতীয় রাকাতে চতুর্থবার আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাবে।

❖ উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক তাকবীর এর মাঝে অন্তত এক বার (তিন তাকবীর বলার মধ্যে) 'সুবহানাল্লাহ' বলা পরিমাণ দেরী (ফাঁক) বা অপেক্ষা করবে।

❖ যদি তকবীর সমূহ ছুটে যায়, কিম্বা কম বা বেশী হয় স্বস্থানে আদায় না হয়ে অন্যস্থানে আদায় হয়, তবে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু বড় জমাআত হলে ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকলে, দুই ঈদে ও জুমার নামাযে সাহু সেজদা করবে না, এবং নামায ও দোহরাতে হবে না। (দুররে মোখতার)

১১. 'ক্বিরাত বিল জাহার' অর্থাৎ মাগরীব, এশা, ফজর, ঈদাইন (দুই ঈদ), জুমা ও সালাতে তারাবীহ্ এবং রমজান মাসে বিতিরের নামায জমাআতে আদায় করলে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করা।

▯ কোন ব্যক্তি একাকী চুপে-চুপে নামায পড়াকালে 'আলহামদু সুরার' কিছু অংশ পড়ার পর অপর কোন ব্যক্তি তার একতেদায় নামায শুরু করে দিলে অবশিষ্ট ক্বিরাত শব্দ করে পড়বে।

▯ রাত্রিকালীন নফল নামাযে সশব্দে বা নীরবে উভয় প্রকারের ক্বেরাত পড়া জায়েজ।

১২. 'সির' নিরব অর্থাৎ, জোহর, আসর, সব রাকাতে মাগরিব ও এশার শেষ এক ও দুই রাকাতে এবং দিবাকালের সুন্নাত/নফল নামাযে ক্বিরাআত আস্তে (নিরবে) পাঠ করা।

১৩. নামাযে বার বার করতে হয় কাজগুলোর তরতিব (শৃঙ্খলা) রক্ষা করা। নামাযে যেমন একাধিক বার সেজদা করতে হয়, সেজদা সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। যদি নামাযী এক রাকাতে এক সেজদা করে; এবং অপর সেজদা ভুলে যায়, তবে ওই নামাযেই যখন উহা মনে পড়ে: যে রাকাতে মনে পড়বে ওই রাকাতের সেজদার সাথে আদায় করে নেবে এবং সাহু সেজদাও করবে। কিন্তু এক সেজদা সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করে ফেললে নামায হবে না। নামায দোহ্‌রাতে হবে। কেননা প্রত্যেক রাকাতের দু'সেজদা করা ফরয।

১৪. 'কাওমা' অর্থাৎ রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। (স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে)।

১৫. সেজদার সময় কপালের সাথে নাককেও মাটিতে স্পর্শ করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৬. সেজদার সময় প্রত্যেক পায়ের অধিকাংশ আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগায়ে আঙ্গুলের মাথা কেবলামুখী রাখা।
১৭. 'জলসা' অর্থাৎ দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা। (স্থির হয়ে বসতে হবে)
১৮. তাশাহুদ পাঠের পর তৃতীয় রাকাতের জন্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাওয়া।
১৯. নামাযের এক রোকন আদায় করার পর দেরী না করে সাথে সাথে অন্য রোকন আদায় করা।

নামাযের সুন্নাত সমূহ:

১. 'রাফয়ে ঈ'দাইন' অর্থাৎ তকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত উঠানো। হাত উঠাবার সময় উভয় হাত কেবলামুখী রাখা। আর হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। বেশী ফাঁক না করা বা একেবারে মিলায়েও না ফেলা। পুরুষের বৃদ্ধাঙ্গুলী যেন কানের লতি পর্যন্ত স্পর্শ করে হাত উঠানো। আর মেয়ে লোক তাদের বৃদ্ধা আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।
২. 'ওয়াজয়ে ইদাইন' অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পর (ক্বিয়াম) দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধা। পুরুষ উভয় হাত নাভীর নীচে স্বাভাবিকভাবে চেপে ধরবে। উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব মতে কুমন্ত্রণার উৎপত্তিস্থল হল নাভী। সেজন্য তাকবিরে তাহরিমা বলার পর নাভী সমেত নিচে হাত বাঁধতে হয়, যেন ডান হাত বাম হাতের উপর থাকে, ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধা আঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কবজী জড়িয়ে ধরবে। আর ডান হাতের অপর তিন অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলী বাম হাতের উপর রাখবে। ডান হাতের হাতলী (হাতের পেটের অংশ) বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে। আর মেয়ে লোক সাধারণভাবে বুকের নিচে হাত রাখবে।
৩. 'সানা' অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পর 'সুবহানাকা' শেষ পর্যন্ত পাঠ, মুক্তাদী, ইমাম ও একাকী নামাযী প্রত্যেককেই সানা পড়তে হবে, কিন্তু মুক্তাদী জমাতে শামিল হতে ইমামকে যদি ক্বিরাআত পড়তে পায়, মুক্তাদী আর ছানা পড়বে না।

৪. 'তা'উজ' অর্থাৎ ইমাম ও একাকী নামাযী প্রথম রাকাতে 'সানা' পড়ার পর 'আউজুবিল্লাহ্' শেষ পর্যন্তপাঠ করবে, তবে ইমামের পেছনে মুক্তাদী পড়বে না।
৫. 'তাসমিয়াহ্' অর্থাৎ কেরাতের আগে 'বিছমিল্লাহ্' শেষ পর্যন্তপাঠ করা। ইমাম ও একাকী নামাযী, প্রত্যেক রাকাতে 'আলহামদু' সূরা পড়ার আগে 'বিসমিল্লাহ্' শেষ পর্যন্তপড়বে। তবে মুক্তাদী তাসমিয়া পড়ার প্রয়োজন নেই।
৬. 'তাকবীরাতে ইনতেকাল' অর্থাৎ রুকু আদায়ে, রুকু হতে উঠতে, সেজদায় যেতে, সেজদা হতে উঠতে এবং সেজদা বা বসা হতে দাঁড়াতে 'আল্লাহু আকবর' বলা। ইমাম তাকবীর সমূহ শব্দ করে আর মুক্তাদী বা একাকী পড়নে ওয়ালা নামাযী নিজে শুনে মত নিঃশব্দ তাকবির বলবে।
৭. রুকুতে তিনবার 'সোবাহানা রাব্বিয়াল আজীম' বলা সুন্নাত।
৮. রুকু হতে উঠার সময় ইমাম ও একাকী নামাযী 'সামেয়াল্লাহু লিমান হামেদা' বলা।
৯. রুকু হতে দাঁড়ায়ে 'কাওমায়' 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলা।
১০. সেজদায় তিনবার 'সোবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা। রুকু এবং সেজদায় তসবীহ্ বেশী পড়তে ইচ্ছা করলে বেজোড় পড়বে। তবে ইমাম পাঁচ বারের বেশী তসবীহ পড়া অনুচিত।
১১. 'সূরা ফাতেহার' পর চুপে চুপে 'আমীন' বলা। ইমাম, মুক্তাদীও একাকী নামাযী সকলেই ওয়া লাদ্ দোয়াল্লিনের পর নিঃশব্দে 'আমীন' বলবে।
১২. শেষ বৈঠকে 'তাশাহুদ' 'আত্তাহিয়াত' পড়ার পর দুরূদ শরীফ পাঠ করা।
১৩. তাশাহ্‌হুদের পর দুরূদে ইবরাহীমি পাঠ করতঃ নামাযের শেষভাগে হাদীসে বর্ণিত যে কোন একটি দোয়ায়ে মাসুরা পাঠ করা।
১৪. সেজদার সময় উভয় পায়ের সমুদয় আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগায়ে আঙ্গুলের মাথা কেবলামুখী রাখা।
১৫. রুকুতে হাঁটু সোজা রাখা।
১৬. সেজদার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক অতঃপর কপাল মাটিতে রাখা।
১৭. সেজদা হতে উঠবার সময় প্রথমে মাথা, তারপর নাক তারপর হাত, তারপর হাঁটু উঠাবে।
১৮. দুদিকে সালাম ফেরান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. "মাসবুক" ইমামের প্রথম সালাম শেষ হাওয়া পর্যন্তঅপেক্ষা করবে; অতঃপর দ্বিতীয় সালাম শুরুতে ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ান।

নামাযের মুস্তাহাব সমূহঃ

১. 'হেফজে নজর' নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে, রুকুর অবস্থায় পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের আগার দিকে, আর বসা অবস্থায় কোলের দিকে, ডান দিকে সালাম ফেরানোর সময় ডান কাঁধের উপর, বামদিকে সালামের সময় বাম কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা।

২. নামাযের সময় 'হাত' আস্তিন বা চাদরে আবৃত থাকলে 'তাকবীরে তাহরীমা'র সময় পুরুষ নিজ হাত বাহিরে রাখা মুস্তাহাব। মেয়ে লোক হাত বের করবে না। অত্যাধিক ঠান্ডার ভয়ে বা অন্য কোন কারণে পুরুষও যদি হাত বাহির করতে না পারে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

৩. 'তারতীল' অর্থাৎ নামাযের ক্বিরাআত ধীর স্থিরভাবে সতর্কতার সাথে 'খোশ এলহানে' বা মিষ্ট সুরে প্রত্যেকটি হরফ মাখরাজ বা উচ্চারণস্থান হতে বিশেষ 'ছেফাতের' সাথে আদায় করা ফরয। এর ব্যতিক্রমে অনেক সময়ে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এ সমস্ত বিষয় তাজবীদের কিতাবের সাহায্যে কোন ভাল আলেম বা ক্বারীর নিকট 'মুশক' (অনুশীলন) করে নেয়া উচিত। প্রত্যেক মুসল্লি 'আল্‌হামদু সূরা' ও কুরআন শরীফের যতটুকু অন্তত নামাযে পড়বে সহী করে মুখস্ত করে নেয়া দরকার।

৪. রুকুর অবস্থায় মাথা, পিঠ ও কোমর সমান্তরাল রাখা, অর্থাৎ পিঠ ও কোমর হতে মাথা উঁচু করবে না নীচুও করবে না।

৫. সেজদার সময় উভয় হাত কানের (লতি সোজা মাটিতে স্থাপন করা) বরাবর রাখা।

৬. সেজদার সময় উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলি কেবলার দিকে রাখা।

৭. তাকবীরে তাহরীমা ও বৈঠকের সময় হাতের আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে আঙ্গুলগুলি না খুলে রাখবে, আর না মিলায়ে রাখবে।

৮. সেজদারত অবস্থায় মাটির উপর দু'হাতের তর্জনী আঙ্গুলগুলিদ্বয় দু'কানের লতি বরাবর মত স্বাভাবিক অবস্থা ও অবস্থানে মাটিতে স্থাপনসহ বাকি আঙ্গুল সমূহ মিলায়ে কেবলামুখী রাখা।

৯. বসা অবস্থায় উভয় পায়ের উরুর উপর হাত এমনভাবে রাখা যেন আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ হাঁটুর সামনে থাকে।

১০. সালামের সময় ডানে বামে মুখ ফিরান মুস্তাহাব।

১১. পুরুষের জন্য রুকু ও সেজদার মধ্যে বগল ও পার্শ্বদেশ খোলা রাখা। (শরীরের সাথে না মিলানো)।

১২. পুরুদের জন্য সেজদার মধ্যে পেটকে রান বা উরু হতে পৃথক রাখা।

১৩. মেয়ে লোকের জন্য বগল পেটের সাথে পেট রানের সাথে রান পায়ের নলার সাথে আর পায়ের নলাকে মাটির সাথে মিলায়ে রাখা।

আওকাতে সালাত : একটি জরুরী জ্ঞাতব্যঃ

পঞ্জেগানা (পাঁচ ওয়াক্ত) নামায নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা ফরয। সময় হবার পূর্বে পড়লে নামায হবে না। আর ওয়াক্ত চলে যাবার পর পড়লে ক্বাজা হবে। বিনা ওযরে নামায ক্বাজা করা মহাপাপ। নামাযের সময় নিম্নরূপ-

ফজরের নামাযের সময়:

সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্তফজরের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। শেষ রাত্রিতে আসমানের মধ্যভাগে একটি সুক্ষ, পাতলা ও লম্বালম্বি সাদা রং দেখা দেয়। এর মধ্যভাগে সমস্ত দিগন্তজুড়ে কাল রং দৃষ্ট হয়। পরে ওই কাল রং আরো গাঢ় ছড়ায়ে পড়ে। উক্ত সাদা বর্ণকে ছোবহে কাজিব বা 'ছোবহে মোসতাতীল' বলা হয়। এই সময় ফজরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না, বা এশার সময়ও শেষ হয়না। ছেহরীর সময়ও বাকী থাকে। এর প্রায় বার ১২ মিনিট পর পূর্বদিকে নীচ হতে যেখানে সূর্য উদয় হবে সেখানে আকাশের কেনারায় দিগন্তআকারে একটি আলো দক্ষিণ ও উত্তর উভয় পার্শ্বে ছড়ায়ে পড়ে। ক্রমশঃ সেই আলো উর্ধমুখী হতে থাকে। একে 'ছোবহে ছাদেক' বা স্পষ্ট প্রভাত বলা হয়। তখন হতে ফজরের নামাযের সময় শুরু হয়।

- ভোরের আলো ছড়ায়ে পড়লে পুরুষের ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু সূর্য্য উদয়ের সন্দেহ মনের মধ্যে আসতে পারে ততটা দেরী করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুচিত। সময়ের প্রথম ভাগে যখন ঘরে অন্ধকার থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সে সময় ফজরের নামায পড়া উত্তম।

- ফজরের নামায পড়াকালে সূর্য্য উদয় হতে গেলে সেই নামায ছহী শুদ্ধ হবে না। সূর্য্য উদয়ের পর যখন হলুদ রং বিলীন হয়ে যাবে তখন উক্ত নামায কাযা করতে হবে। নামাযে ফজর মোট চার রাকাত। প্রথমত দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তারপর দুইরাকাত ফরজ।

যোহর ও জুমার নামাযের সময়:

সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশ হতে পশ্চিম দিকে হেলতে আরম্ভ করলে, যোহর ও জুমার নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। যতক্ষণ না প্রত্যেক জিনিষের ছায়া দ্বিগুণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্তযোহর ও জুমার সময় থাকে। দ্বিপ্রহরের সময় বিভিন্ন (প্রত্যেক) জিনিসের যে ছায়া পড়ে, তাকে ছায়ায়ে আসলী বা মূল ছায়া বলা হয়। তা বাদ দিয়ে দ্বিগুণ ছায়া ধর্তব্য। যথা-৭ আঙ্গুল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি কাঠির ছায়া ঠিক দুপুরে যদি ৪ আঙ্গুল হয়; তবে যোহরের সময় ওই কাঠির ছায়া আঠারো আঙ্গুল হওয়া পর্যন্তবিদ্যমান থাকবে। যোহরের নামায পড়াকালে যদি আসরের সময় হয়ে যায়, তবে উক্ত জোহরের নামায সহী হবে। কিন্তু জুমার নামায আদায়কালে যদি আসরের সময় হয়ে যায়, তবে জুমার নামায সহী হবে না। তখন যোহরের নামাযই কাযা নামায হিসাবে পড়তে হবে ঐ সময় জুমা অবৈধ।

গ্রীষ্মকালে 'মিচালে আওয়ালের' (নামাযের আউওয়াল ওয়াক্তের) শেষ ভাগে, শীতকালে মিছালে আওয়ালের মধ্যভাগে যোহরের নামায আদায় করা মোস্তাহাব। তবে প্রত্যেক মওসুমেই জুমার নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা সুন্নাত। জুমার নামায দেরীতে পড়া শিয়া রাফেযীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে।

পবিত্র রমজান মাসের "আখেরী জুমা" সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

মূলতঃ ইসলামের সোনালী যুগে স্বয়ং শরিয়ত প্রণেতা সরওয়ারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শুধু রমযানের 'জুমাতুল বিদা' কেন: বরং পুরো রমজানুল মোবারকের জুমঅরা জামাত পঞ্জেগানা-নামায, কোয়ামে রমযানের জন্য সালাতে তারাবিহ সহ প্রত্যেক ইবাদত, রিয়াজত, বন্দেগীকে অধিক গুরুত্ব সহকারে আদায়ের স্বীকৃতি অসংখ্য হাদিস-

আমালে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ দ্বারা অত্যন্ত যওক শওকের সাথে পালন করার স্বাক্ষর ব্যাপক হারে পাওয়া যায়। এমনিও জুমার দিনকে রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের ঈদের দিন হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন।

আসলে সমাজের দিকে একটু নজর দিলে আমরা এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাব যে, যারা পবিত্র রমজানুল মোবারকের ফরয রোজাগুলো রাখা তো দূরের কথা; ঐ পবিত্র মাসে রোজাদারদের প্রতি সামান্যটুকুও সম্মান প্রদর্শনে দিনের বেলায় হোটেল রেস্তোরা বন্ধ না রেখে নির্দ্বিধায় খাবার বিক্রি করছে, প্রকাশ্য ধুমপান করছে। বোহায়াপনা, ধর্মদ্রোহী যে করছে তার পরিণতি কি হতে পারে, মরতে তো হবে একদিন সে চিন্তা তাদের মাথায় আসেনা। সরকার পক্ষ শুধুমাত্র পত্রিকা মারফত সাধারণ ঘোষণা "রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা জাহেরীভাবে আল্লাহর বান্দা! স্বীকার করে কিন্তু তাদের হৃদয়ে কোন আল্লাহ ভীতি, পরকালের ভয় বলতে বিন্দুমাত্রও নেই। ১২ মাসের বৎসরে ১১ মাসে নেই আল্লাহ ও তার রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্টিমূলক আমল পরহেজগারী ও বন্দেগীর প্রতিফলন। আফসোস হয় রমজানুল করিম এর একমাসেও নেই সিয়াম সাধনা, সালাতে পঞ্জেগানা, তারাবিহ বা কিয়ামে লাইলের অনুশীলনের কোন তাগিদ, লেশমাত্রও নেই গুরুত্ব ও মহত্ব হৃদয়ঙ্গমতার কোন আলামত। অথচ স্বয়ং রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবা তাবেয়ীন, তাবে তাবেইন ও সমস্ত বুর্যগানে দ্বীনের এমনকি সাধারণ একজন পাঞ্জেগানা নামায আদায় করেন এমন মুমিন ব্যক্তিও পবিত্র রমজানুল করিমের মাস আগমনের দুই মাস আগে হতে রমজানের সিয়াম সাধনায় কিয়ামুল লাইল আদায় করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়।

পবিত্র হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যালোচনায় আমরা এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাই। যেমন তফসীরে "দুররে মানসুরে" হযরত সালমান ফারেসি (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানুল মোয়াজ্জামের শেষ জুমাতে আগমনী মাস রমজানুল মোবারক সম্পর্কে দীর্ঘ খোৎবা পেশ করতেন এবং অন্য কোন মাসকে; দিবারাত্রির বা অন্য কোন মাসের আমলের বিনিময় সত্তর থেকে সাতশত গুণ বেশি সওয়াব প্রাপ্তির কথাও অধিক ফযীলতের সংখ্যাগত ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

গুণগত বেশির বর্ণনা ঐ দীর্ঘ খোৎবাতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করতেন। [৮৮]

এমনিতেই আমরা অবগত যে, মহান রাব্বুল আলামীন হাদিসে কুদসী দ্বারা ঘোষনা দিয়েছেন হাবীবে দো'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে যে; 'আস্ সাওমু লিওয়া ওয়া আনা উযজা বিহি' অর্থাৎ- রোযা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং নিজেই এর বিনিময়। এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত হাদিস ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী কারী (র.) তাঁর হাদিস শরীফ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মিরকাতুল মাফাতিহ" গ্রন্থে বিশুদ্ধ বর্ণনাকারীর রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি ইসলামের কল্যাণ ও উত্তম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও পূণ্যবর্তী হওয়া যায় এমন নিয়ম-পন্থা প্রবর্তন করবে; এবং প্রবর্তীত নিয়ম কুরআন সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ প্রেক্ষিতে প্রবর্তনকারী যেমন সাওয়াবের ভাগী হবেন তেমনিভাবে অনুস্বরণ-অনুশীলনকারী ও পূর্ণ্যবর্তী হবে তো বটে, বরং অনুশীলনকারী হতেও প্রবর্তনকারী অধিক পুণ্য পেতেই থাকবে।

সুতরাং পবিত্র রমযানুল করিমের শেষের জুমাকে "জুমাতুল বিদা" বলার সাথে সাথে বন্দেগীরত বা বিমুখ উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে এক প্রকার অনুভূতি সৃষ্টি হবে। যা দ্বারা বন্দেগী মগ্ন ব্যক্তি আরো যত্নবান হয়ে অধিক পূণ্য হাসিলে ব্রতী হবেন। সেজন্য আমাদের দেশে অনেককেই দেখা যায় প্রায় সকল মসজিদে রমজানের শেষ দশদিন "ইতিকাফ" করতে চলে যান নিজের পরিবার, পরিজন, ঘর-বাড়ী ছেড়ে। এটা শুধু মাত্র আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য। এর মধ্যে আরেকটা কারণ হচ্ছে, রমযানের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতে লাইলাতুল কুদরও হয়ে থাকে।

অতএব পূণ্যার্থীরা লাইলাতুল কুদরের পরিপূর্ণ ফয়জ বরকত সওয়াব অর্জনে ঐ শেষের দশদিন 'ইতিকাফ' করতে চলে যায়। আর বন্দেগী বিমুখ মানুষ তার হৃদয়ে সামান্য হলেও অনুশোচনা এসে যায়, যেহেতু রহমতের ও মাগফিরাতের দশ দশ ২০ দিন তো গেল; জাহান্নাম থেকে মুক্তির ১০ দিনের অন্তত জুমাতুল বিদায় হলে ও উপস্থিত হই। ফলে তারা জুমাতুল বিদা একথা শুনলেই: তারা মসজিদে উপস্থিত হবে এবং অনুশোচনা আফসোস করবে-বিগত কৃতকর্ম অভ্যাসের জন্য। ফলে যে কয়দিন রমজানুল করিমের দিবস

[৮৮]. তাফসীরে দুররে মানছুর-১/৪৪৬।

রয়েছে, সেগুলোতে রোজা, নামায আদায়ের দিকে অগ্রসর হবে। কারণ মুসলিমের জীবনইতো বন্দেগীর জন্য। বন্দেগী বিহীন জীবন লজ্জায় পূর্ণ। আর অমুসলিমরা তো 'জীবন মৃত্যু'। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত করুক। আমিন।

আসরের নামাযের সময়:

যোহরের সময় শেষ হবার পর হতেই আসরের সময় আরম্ভ হয়। অর্থাৎ কোন জিনিসের মূল ছায়া ব্যতিরেকে দ্বিগুণ ছায়া হওয়া হতে আরম্ভ হয়ে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্তবর্তমান থাকে। সব সময় আসরের নামায ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর কিছু বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। কিন্তু সূর্য (রৌদ্র)'র রং হলুদ বর্ণ হলে এবং সূর্যের প্রতি স্বাচ্ছন্দে তাকান সম্ভব হলে ওই সময়ে আসরের নামায পড়া মাকরূহ। অবশ্য সূর্য অস্ত যেতে থাকলে সেদিনের আসরের নামায পড়ে নেবে। এবং আসরের নামায আদায়কালীন সূর্য্য অস্ত গেলে নামায ফাসেদ হবে না।

মাগরিবের নামাযের সময়:

মাগরিবের নামাযের সময় সূর্যাস্ত হতে আরম্ভ হয়ে পশ্চিম আকাশের লালিমা বিলীন হওয়ার পর পশ্চিম আকাশের দক্ষিণ ও উত্তরে প্রসারিত যে সাদা রং দেখা দেয়, যাকে "শাফাকে আবইয়াজ" বলা হয়। এই সাদা রং বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামায বিনা-কারাহাতে (মাকরুহ ছাড়া) পড়া যায়। অতএব, মাগরিবের ওয়াক্ত শুরুর সাথে সাথে অর্থাৎ প্রথমভাগে মাগরিবের নামায আদায় করা মোস্তাহাব। আকাশে তারার জ্যোতি দেখা দেয়া পর্যন্ত বিনা কারণে বিলম্ব করা মাকরূহ। আর হানাফী মাযহাব মতে সালাতে আসর আদায়ের পর হতে মাগরিবের ফরয আদায়ের পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন নফল সুন্নাত নামায পড়া অবৈধ। এমনকি ক্বাযা নামাযও পড়া মাকরূহ ও নাজায়েজ। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের নামাযের সময় জানা উপস্থিত হলে সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে প্রথমে মাগরিবের ফরয ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ে এর পর জানাযা পড়তে হবে, যেহেতু ফাতওয়ার কিতাবে এসেছে,

لِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ فَعَلَى هَذَا تُؤَخَّرُ عَنْ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ- ফাতওয়া হল সালাতে জানাযাকে জুমআর সুন্নাতের পরে পড়ার উপর অনুরূপভাবে মাগরিবের সুন্নাতেরও পড়ে পড়তে হবে। কারণ জুমআর সুন্নাতের চেয়ে মাগরিবের সুন্নাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। [৮৯]

এশা ও বিতিরের নামাযের ওয়াক্ত:

শাফাক অর্থাৎ যে সাদা বা লালিমা সন্ধ্যায় আকাশ প্রান্তরে উদ্ভাসিত হয় তা অস্তমিত হওয়ার পর হতে, সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্তএশা ও বিতিরের নামাযের ওয়াক্ত। অবশ্যই বিতিরের পূর্বে এশার নামায আদায় করতে হবে। সালাতে বিতির এশার নামাযের আগে পড়লে হবে না পুনরায় ইশা ও বিতির আদায় করতে হবে।

- রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অপেক্ষা করে এশার নামায আদায় করা মোস্তাহাব। বিনা কারণে মধ্য রাত্রির পর এশার নামায পড়া মাকরূহ।
- এশার নামায আদায় কালে সোবহে সাদেক হয়ে গেলে উক্ত এশার নামায সহীহ্ হবে।
- মেঘলা দিনে আসর ও এশার নামায যথাশীঘ্র আদায় করা মোস্তাহাব। এ ছাড়া অন্যান্য নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব।

পবিত্র শবে বরাত ও শবে ক্বদরের নামায:

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে দোযখের কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো তাহলে এত অসংখ্য নবী রাসুল (আ.) ও বাণী বদ্ধ কিতাব সাহিফা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ কুরআন করিম পাঠাতেন না। যা দ্বারা মানুষ সিরাতে মুসতাকিমের উপর নিজেদের ইহ জীবন পরিচালনা করে পরকালে চিরশান্তি লাভ করতে পারে। তাছাড়া রাব্বে কায়েনাত আল্লা জাল্লা জালালুহু মানুষকে "উন্নততম সৃষ্টি" হিসাবে পয়দা করেছেন। এবং দিয়েছেন স্বাধীনতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক এবং ভাল মন্দ বিচার করার বিশ্লেষণ শক্তি।

[৮৯]. ফাতওয়ায়ে শামী-১/৩৭৬, বাহরে রায়েক-১/২৬৬।

তা নাহলে ইনসানকে সঠিক পথে চলার উৎসাহিত করতে পুরস্কারের ঘোষণা দিতেন না। মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যদি একটি ভাল কাজ কর তাহলে তোমাদের আমল নামায় দশটি নেকী লিখে দেব, অথবা তার চেয়েও অধিক। আর যদি গুণাহ কর, তবে বিনিময়ে একটিই লিখা হবে। অথবা সেটিও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তবে এর জন্য আল্লাহ্ গাফুরুর রহীম চান অনুশোচনা, অনুতপ্ততা এবং ক্ষমা চাওয়ার মহৎ মানসিকতা ও আন্তরিকতা এবং ভবিষ্যতে পাপ করবে না মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প।

কেননা আল্লাহ জাল্লা শানুহু অধিক পছন্দ করেন বান্দার আনুগত্যতা ও ক্ষমা প্রার্থনাকে। তিনি চান মানুষ তার নিকট পাপের গুনাহের জন্য তাওবা করুক, লজ্জিত হোক।

উল্লেখ্য মুখে তওবা তওবা করলে তওবা হয়ে যাবে না এর জন্য প্রয়োজন নির্জনে বসে জীবনের সমস্ত গুণাহের কথা মনে করে অনুশোচনা অনুতাপে লজ্জায় কাতর হয়ে কাঁদতে হবে এবং পঞ্জেগানা ও তাহাজ্জুদের নামাযের পাশাপাশি বেশী বেশী করে নফল নামায পড়তে হবে। তেলওয়াতে কুরআন করিম করতে হবে। অর্থাৎ যে ইবাদতে বেশী স্বাদ পাওয়া যায় তাই করা ভাল। তবে সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও ঈমানদারীর মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে ইবাদত বন্দেগীর সংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে খুসু-খুজু মনোযোগিতা, আন্তরিক সাধ্য সামর্থতাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ বেশী পছন্দ করেন। তার মানে মুহাব্বতের সাথে অল্প ইবাদত গাফলতিপূর্ণ অসংখ্য ইবাদতের চেয়ে শ্রেয়।

সরওয়ারে কাউনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- পাপিষ্ট বান্দার অনুতাপ, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থিতার চোখের পানি আল্লাহ্র ক্রোধাগ্নিকে নিভিয়ে দেয়। এছাড়া মহান রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদেরকে অবারিত রহমতের অভয় দিয়ে কুরআন হাকিমের বহুস্থানে ঘোষণা দিয়েছেন যেমন "সূরা হিজর" এর ৪৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্তক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সুতরাং আল্লাহ চান আনুগত্যতা, ক্ষমা প্রার্থনা বা তায়েব ইলাল্লাহ এবং তার দেয়া কুরআন পাককে বুকে ধারণ ও প্রতিটি হুকুম আন্তরিকভাবে পালনের মাধ্যমে পাশাপাশি তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন জীবন্তকোরআন। তাই আল্লাহর আনুগত্যতা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়া সাল্লাম যা করতে বলেছেন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। আর যা নিষেধ করেছেন তা সর্বান্তক্রমে বর্জন করতে হবে। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'ই হলেন আল্লাহর একমাত্র মুখপাত্র।

তাইতো রাব্বে কায়েনাত জাল্লা জালালুহু তাঁর একমাত্র হাবীব শফিউল মুজনেবিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতদের অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত অনেক বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন। যা অন্য নবী, রাসুল (আ.) গণের উম্মতের বেলায় দেননি। আবার অন্যান্য নবী, রাসুল (আ.) এর উম্মতদের যে দীর্ঘ হায়াত, শক্তি, সামর্থ দিয়েছিলেন উম্মতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তা দেননি।

সুপ্রিয় পাঠক! আমাদের সবারই একথার উপর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সময়, মাস, বছর, কাল-যুগ সব কিছুর নিয়ন্ত্রনকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। আমরা সৃষ্টি কূলের সবাই তার অধীনস্থ ও মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহু 'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ', তিনি 'সামাদুন'। তাঁর যতদিন ইচ্ছে হবে ততদিন এ আকাশ-বাতাস প্রাণ জীবন স্পন্দন সজীব রাখবেন; আর যখন ইচ্ছে হবে তৎক্ষণাৎ ওলট পালট করে দেবেন সবকিছু। ঐ নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে সৃষ্টিকূলের কোন মানব দানবের হাত বা সামান্য পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। এভাবে সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছে: এবং দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও নিঃশেষ হচ্ছে আমাদের জীবন প্রদীপের আলো। আবার জীবন প্রদীপের আলো জ্বলছে আমরাও বেঁচে আছি। আর কোন এক সময়ে আল্লাহর দূত আজরাইল (আ.) মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হবেন তা আমরা কেউ জানিনা; এবং জানার কোন মাধ্যম বা যন্ত্র কেউ বানাতে পারেনি এবং পারবেও না।

প্রিয় পাঠক! কিন্তু কি এতদ্বসত্ত্বেও আমরা এসব বিশেষ সুবিধা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি পাওয়ার, জানার, বুঝার পরও কি পৃথিবীর সম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তির মোহ ত্যাগ করে হালাল-হারাম, বাছ-বিচার বিবেচনায় না এনে নিসংকোচে জীবন প্রদীপের আলো নিঃশেষে মগ্ন থাকিনি? কি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি না মৃত্যুর দিকে? হায় আফসোস! মৃত্যুর ও আখিরাতের চিন্তা আমাদের হৃদয়কে একটুও নাড়া দেয় না!

অতএব, মুসলিম উম্মাহর এ উদাসীনতা গাফলতি পরিহারের লক্ষ্যে মহান আল্লাহু গফুরুর রাহীম বারে বারে সতর্ক করেছেন। আহবান জানিয়েছেন

পৃথিবীর মোহ ত্যাগের ও সরল সঠিক পথে চলার; এবং গাফলতির উদাসীনতার কারণে যে সময় ও পূণ্যগুলো জীবনের খাতা থেকে উধাও করে দিয়েছি সে ক্ষতিগুলো পুষিয়ে নেয়ার জন্য মহান ক্ষমাশীল আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা কতগুলো সময় পথ-নিয়ম দিয়েছেন। মাস দিয়েছেন, সে মাস, দিবস, রাত্রি গুলোতে আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহুর উপর পূর্ণ ভরসা, একনিষ্টতা ও আন্তরিকভাবে অনুশীলন ইবাদত বন্দেগী রিয়াজত করলে ঐ গাফলতির সময় গুলো পূর্ণ হয়ে লাখো কোটি গুনাহ্ সমূহ্ সাওয়াব ও পূণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেননা ঐ সময়, দিন, রাত্রি, মাসগুলোর ইবাদত বন্দেগীর বিনিময় খালেকে কায়েনাত আল্লাহু গফুরুর রহীম অগণিত মহিমায় ভরপুর করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতগণ স্বল্প ইবাদতে অধিক পূণ্য অর্জন করতে পারে।

এক কথায় তার বান্দাদের নাজাতের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে ঐ সময়গুলো পয়দা বা দান করেছেন। যেমন আরাফাতের দিন, আশুরার দিন, জুমার দিন, দুই ঈদের দিন, জিলহজ্ব মাসের ১০, ১১, ১২, ১৩ তারিখের দিন, রবিউল আউয়াল শরীফের ১২ তারিখ এবং ১৫ শা'বানুল মোয়াজ্জামের দিবস। আর রাতের মধ্যে মুহাররমুল হারামের প্রথম রাত, আশুরার রাত, রজবুল মুরাজ্জাবের প্রথম রাত, এবং রযবুল মুরাজ্জাবের ১ম বিষ্যুদবার দিবাগত রাত (এ রাত্রে হাবীব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা আবদুল্লাহ্ (র.) এর পেশানী মোবারক হতে মা আমেনা (র.) এর উদর মোবারক নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থানান্তরিত হয়েছিল) ও ২৭ তম রাত, ১৫ই শাবানুল মোয়াজ্জামের রাত, আরাফাতের রাত। এভাবে দুই ঈদের পূর্বের দুই রাত, রমজানুল করিমের প্রত্যেক দিবস-রাত্র-সময় তো বটে, তবে ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তম রাত। বিশেষ করে ইমামে আজম আবু হানিফা (র.) এর মতে ২৭ তম রাত এবং মাসের মধ্যে মুহররম, রবিউল আউয়াল, রজব (আল্লাহর মাস) শা'বান (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাস) রমজানুল মোবারক (উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাস)।

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রথমতঃ ১৫ শাবান রাতের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করব যে, পবিত্র কুরআনুল হাকিমে ইরশাদে রাব্বানী হচ্ছে, "হা-মীম" সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয় আমি এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিতাব (কুরআন করিম) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়"। [৯০]

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহুর রাসূল আলামিন পবিত্র কুরআন করিমকে নিসফে্ শা'বানের (শবে বরাতের রাত) অবতীর্ণ করেছেন। আবার সুরায়ে ক্বদরে ইরশাদ হয়েছে- কুরআন হাকিমকে ক্বদরের রাত্রিতে নাজিল করেছেন। এর মধ্যে আসলে কোনটি সঠিক? উত্তর হচ্ছে দুটোই সঠিক। তার মানে কালামুল্লাহ শরীফ নাযিলের ফায়সালা হয়েছে শবেবরাতে আর সেই ফায়সালা বাস্তবায়ন হয়েছে শবে ক্বদরে। [৯১]

আবার এমনও হতে পারে যে, কালামুল্লাহ শরীফ লাওহে মাহফুজ হতে প্রথম আসমানে নাজিল করেছেন আর প্রয়োজন অনুসারে হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নাজিল করেছেন; অল্প অল্প বা ক্বদরের রাত্রে একসাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরো কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অল্প অল্প নাজিল করার যুক্তি এই যে, যখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, বা নতুন কোন বিধি বিধান আরোপের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখনই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিয়েছেন জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে। তবে সিদ্ধান্তটি কিন্তু মহান রাব্বে কায়েনাত গ্রহণ করেছেন অনেক আগে। হ্যাঁ সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাতটি হল নিসফে সাবানের রাত্রে অর্থাৎ শবে বরাতে।

তাই উপরোক্ত ৪ নং আয়াতে কতই পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় ইরশাদ হয়েছে- "এই রাত্রে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়" ৯২। অর্থাৎ আহকামুল হাকেমিন আল্লাহ এই রাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সর্বনিম্ন আকাশে পাঠিয়ে দেয়।

অতএব, বরাতের রাত সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাত। ওই রাতেই আগমনী এক বছরের বাজেট পাস হয়ে যাবে। কাজেই বাজেট পাস হওয়ার আগেই নিজ নিজ মনের কামনা বাসনা পাক দরবারে ইলাহীতে পেশ করতে হবে। কারণ

[৯০]. সূরা আদ-দুখান-১-৪।

[৯১]. আতি-তিবইয়ান ফী লাইলাতিল কাদরি ওয়া লাইলাতিন নিসফি মিন শা'বান, মোল্লা আলী কারী।

[৯২]. সূরা আদ-দুখান-৪।

বাজেট তৈরীর জন্য মহান আল্লাহ বরাতের রাত্রে বান্দাদের আরজী গ্রহণের জন্য সর্ব নি আকাশে অবস্থান করেন এবং দয়াবান মেহেরবান হয়ে বান্দার আরজী মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

সহীহ্ হাদিস শরীফে শা'বান মাসের ১৫তম রাত্রের বর্ণনা বিভিন্নভাবে অনেক বর্ণনাকারী কর্তৃক ব্যাপক ফযীলত, বুর্জগীর কথা বর্ণিত হয়েছে। এটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের মহিয়সী মাতা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, "একরাতে তাহাজ্জুদের নামাযে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত দীর্ঘ সময় সেজদারত থাকলেন যে, আমি উদ্বিগ্ন সন্দিহান হয়ে পড়েছিলাম যে, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝি এই পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহর সানিধ্য চলে গেছেন, বিচলিত মনে তাঁর কাছে গিয়ে তার কদম মোবারকের তর্জনী আঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম। এতে কদম মোবারক ছোঁয়ার প্রেক্ষিতে আমার বিচলিত মনে স্বস্থি ফিরে এলো। অতঃপর নিজ স্থানে চলে এলাম। নামায শেষান্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা (রা.) আজ কোন রাত জানো? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা-তাহেরা (রা.) উত্তর করলেন আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ শা'বানের ১৫ তম রাত। এই রাতে আল্লাহ জাল্লাশানুহু দুনিয়াবাসীর যাবতীয় বিষয়ের নথিপত্র কার্যকর করার উদ্দেশ্য ফিরিস্তাদের হস্তান্তর করেন। যার মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, রিজিক, দৌলত, জয়-পরাজয়, মান-সম্মান, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকে"। [৯৩]

সুতরাং প্রত্যেক আল্লাহর বান্দার কাজ হলো এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্তির রাত শবে বরাতে তাঁর কাছে চাওয়া, বেশী বেশী করে চাওয়া, তুচ্ছ-ছোট থেকে ছোট তুচ্ছ জিনিস যদি বান্দা আল্লাহর কাছে চায়; তাহলেও তিনি অধিক খুশী হন। বার বার তওবা ভঙ্গ করেও বান্দা গাফুরুর রাহীম আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে যদি চায়, তাহলে ও তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন না। বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনায় আছে "জুমা ও পাঞ্জেগানা নামায শেষে মহান আল্লাহর কাছে বান্দা কিছু না চেয়ে মুনাজাত না করে চলে যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দূত ফিরিশতারা বলেন যে, "হে নামাযী! তোমাদের কি আল্লাহর কাছে কিছুই চাওয়ার নাই?"

[৯৩]. জামে' তিরমিযী-৭৩৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইরশাদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছে এভাবে পুরো রমজান মাস, শবে বরাত ও লাইলাতুল কুদরের রাতে ফিরিস্তাদের দৈনন্দিন নিজস্ব ইবাদত বন্ধ করে পৃথিবীব্যাপী ফিরিস্তারা বিচরণ করতে নির্দেশিত হয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ইবাদতগাহে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের উপর আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকে এবং দোয়া মুনাজাত প্রার্থনারতদের বেলায় আমিন আমিন বলতে থাকেন।

স্বয়ং আল্লাহ রাব্বে কায়েনাত প্রথম আকাশে এসে বান্দার উদ্দেশ্য বলতে থাকেন হে বান্দারা! তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি গুণাহের ক্ষমা প্রার্থী, আছে কি কেহ রিযিক, মান-সম্মান চাহেনে ওয়ালা, আমি আজকের রাতে তোমাদের দোয়া গ্রহণের জন্য প্রথম আসমানে এসেছি। তোমরা আমার কাছে চাও। আজকে যা চাও তাই দেব। তবে হ্যাঁ আল্লাহর সাথে অংশীদারে বিশ্বাসী, বান্দার হক ধ্বংসকারী, মা-বাবার নফরমান ব্যক্তিরা ঐ রাতদ্বয়ের কামালাত বুর্জগী থেকে বঞ্চিত হবে। নাউজুবিল্লাহ। মূলতঃ এ রাতদ্বয়ে আগমনী বৎসরের সকল প্রকারের প্রাপ্তি, বঞ্চনা, সম্মান-অসম্মানের ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত; প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে হস্তান্তর করা হয়।

মূলতঃ ইসলাম ধর্মের মূল ধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'র আকিদায় বিশ্বাসীদের জন্য শবে বরাতের সাথে সাথে শবে কুদর ও অনন্য বৈশিষ্ট্যময় মর্যাদাময় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই শুধু উম্মতের জন্য বিশেষ নিয়ামত হিসাবে চিহ্নিত রাত সমূহের মধ্যে অন্যতম মহিমান্বিত রাতদ্বয় হচেছ শবে বরাত ও শবে কুদরের রাত। কেন না পবিত্র কুরআনে হাকিমে কোন রাত সম্পর্কে একক নাম বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সুরা মহান আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেননি। অন্য কোন রাত দিন সময় মহুর্তের ফজিলত বর্ণনা করেছেন কোন সুরার কোন আয়াতের একটি অংশ বিশেষের মাধ্যমে। কিন্তু লাইলাতুল কুদরের রাতের আভিজাত্যতা চরম উৎকর্ষতা ও মহত্বতা অনুধাবনে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা নাজিল করেছেন।

রাব্বে কায়েনাত কর্তৃক কুদরের রাত সম্পর্কে কোরআনে হাকিমের "সুরা কুদরে" ইরশাদ হচ্ছে- আমি কুরআন নাযিল করেছি কদরের রাত্রে। কদরের রাত সম্পর্কে আপনি জানেন কি? কদরের রাত হল একহাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহুল আমিন

জিব্রাইল (আ.) সহ পালনকর্তার নির্দেশক্রমে অবতীর্ণ হয়। এটি নিরাপত্তা বা রহমত যা ফজর উদয় পর্যন্তঅব্যহত থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একবার দরবারে রিসালতে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচনার পর্যায়ে পূর্বেকার নবী, রসুল এর উম্মতগণের ইবাদত বন্দেগীর আলোচনায় বণি ইস্রাইলের একজন ব্যক্তি "সামযুন" সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। যিনি একাধারে হাজার মাস একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ও তার ধর্মদোহীদের বিরুদ্ধে দিনের বেলা যুদ্ধ করেছেন ও কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন। রাতের বেলা ইবাদত রিয়াজতএ নিয়োজিত থাকতেন এবং এক মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। হুজুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে অত্যন্তবিস্মিত বিচলিত হলেন; স্বীয় উম্মতের জন্য এবং দোয়া করলেন আল্লাহর দরবারে এরূপ নেকী সওয়াব স্বীয় উম্মতের বেলায়ও বরাদ্দ পাওয়ার জন্য। এই বলে যে, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের আয়ু কম, শক্তি-সামর্থ ও কম। এ ব্যাপারে আপনার অনুগ্রহ চাই। রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া কবুল করতঃ উম্মতে মোহাম্মদীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য অপূর্ব নেয়ামত স্বরূপ কদরে রাত দান করলেন, যা এমন মহান রাত; যা বণি ইসরাইলের এক ব্যক্তির একাধারে এক হাজার মাস দিনে জিহাদ রাত্রে বন্দেগীর অপেক্ষা অধিক উত্তম। এই রাত উম্মতে মোহাম্মদীর ভাগ্য বিকাশের আল্লাহর অপূর্ব দান।

এ রাতে অধিক নফল নামায, সালাতুত তাস্‌বিহ্, কুরআন তিলওয়াত, মরহুমিন মুবব্বিদের ইসালে সাওয়াব, বেশী বেশী করে বিগত দিনের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা, কান্নাকাটি অধিক করা উত্তম। নূন্যতম ১২ রাকাত লাইলাতুল কুদরের বা বরাতের নফলের নিয়তে নামায, যাতে প্রতি রাকাতে সুরা কদর একবার তিন বার সুরা ইখলাছ পড়ার নিয়মের কথা বুর্জগানে দ্বিনগণ কর্তৃক আমল হিসাবে স্বীকৃত আছে।

উপসংহারে আমাদের মহিয়সী মাতা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা হুমাইরা (রাহ.) বর্ণিত একটি হাদিস প্রিয় পাঠকদের খেদমতে আরজ করব। "তিনি একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরজ করলেন ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি যদি শবে কুদর পাই তাহলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কি দোয়া করব?" উত্তরে ইরশাদ করলেন- এই দোয়া করবে "আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুবুন করিম, তুহিব্বুল আফবা, ফা'ফু আন্নী"।

মহান রাব্বে কায়েনাত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ফখরে মাওজুদাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তোফাইলে আমাদের সবাইকে শবে বরাত-কৃদরের রহমত, বরকত পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

হারামাইনের পরের দিন, ঢাকায় কেন ঈদের দিন

একটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান:

পবিত্র কুরআন করিম ও হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা ও উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রমাণিত যে, লাইলাতুল বরাত ও কৃদরের রাত্রিতে অসংখ্য ফেরেশতা, বিশেষ করে কৃদরের রাতে হযরত রুহুল আমিন জিব্রাইল (আ.) সহ অগণিত অসংখ্য ফেরেশতার বহর নিয়ে ধরা পৃষ্টে চলে আসেন এবং বন্দেগীরত বান্দাদের আল্লাহর রহমতের বারিধারা দিয়ে সয়লাব করতে থাকেন, এভাবে সকাল উদিত হওয়া পর্যন্ত।

এছাড়া উক্ত আয়াতে করিমা দ্বারা এও প্রমাণিত যে, ঐ কৃদরের একরাতের ইবাদত হাজার মাস দিন রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই এক হাজার মাসের মধ্যে তো বহুবার কৃদরের রাত আসবে। অর্থাৎ কৃদরের রাত হবে। আর প্রত্যেকটি রাতই এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম হবে। আর এভাবে হিসাব করলে একজন বান্দার জীবনে অনেক রাত হতে পারে। এভাবে মাসের সংখ্যাও হয়ে দাঁড়াবে অসংখ্য। অতএব এর সরল উত্তর এই যে, হাজার মাসের হাজার রাতের চেয়ে কৃদরের রাত উত্তম বলা হয়েছে। তার অর্থ হলো সাধারণ হাজার মাসের হাজার রাতের চাইতে কৃদরের রাতের মহিমা মহত্ব অধিক, তার মানে সাধারণ রাতের সওয়াবের গুণগত ও সংখ্যাগত দিক দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ যেমন- সুরা ইয়াসিন একবার পাঠ করলে দশবার খতমে কুরআনে র সওয়াব পাওয়া যায়। তার মানে সুরা ইয়াছিন ছাড়া দশবার বাকী কুরআন করিম তেলওয়াত করলে যে সওয়াব হয়, একবার সুরা ইয়াসিন পড়লেও তেমনি সওয়াব হয়ে থাকে।

আবার কেউ বলতে পারেন যে, বিশ্বের সকল স্থানেতো একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় না। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শবে কদর ও শবে বরাত হয় এবং ফেরেশতাদের অবতরণ ও নূযূলে বরকত সময়ও কি ভিন্নতর হয়? হ্যাঁ পৃথিবীর যে অংশে যখন রাত থাকে সে অংশে তখনই শবে বরাত ও শবে কদরের বরকত দেয়া হয়। অনুরূপ ফেরেশতারাও সে অংশে তখনই অবতরণ ও অবস্থান করেন।

এছাড়া আমাদের মুসল্লি সমাজের কতেক মুহতারম বরহক তরিকতের মাশায়েখ ও বুযুর্গ পীরানে কিরামদের এক শ্রেণীর স্বার্থন্বেষী মুরীদ ও অনুসারীরা আপন আপন মুর্শিদের একান্তই নিজস্ব কর্মগুলো ফিক্হে ইসলামীর চার মূলনীতির (কোন তোয়াক্কা না করে বরং অংশ মনে করে) ভিত্তিতে প্রণিত এবং প্রতিষ্ঠিত মাসয়ালা "চন্দ্র দেখে রোজা রাখ চন্দ্র দেখে ঈদ কর"।[১৪]

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধীতা করেন। তারা ভিত্তিহীনভাবে পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের কথিত অনুসরণ ও সেদেশে উদিত চন্দ্রের হিসেবে রোযা ও সালাতে ঈদাইন পালন করার ভ্রান্ত ও কল্পনা প্রসূত বিবেক বিবর্জিত আবেগী রোযা ও ঈদাইন পালন করেন যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী।

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ"

অর্থাৎ-বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবুল বুখতারী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং 'বতিনে নাখলা'

[১৪]. সহীহ বুখারী-১৯০৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা (রমযান মাসের) চাঁদ দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ কেউ বলতে লাগলেন, এ'তো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এ'তো দুই তারিখের চাঁদ। এর পর আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (র.) এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আমরা তো চাঁদ দেখেছি, কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছেন, এ দু'রাত্রির চাঁদ, আবার কেউ কেউ বলছেন একরাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক অমুক রাত্রে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ পাক এ চাঁদকে বর্ধিত করে দিয়েছেন। মূলত এ ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছো।[৯৫]

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

অর্থাৎ "হযরত কুরাইব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মুল ফযল (র.) সিরিয়ায় হযরত আমীর মোয়াবিয়া (র.) এর কাছে পাঠান। আমি সেখানে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন সারতেই সেখানে সিরিয়ায় থাকতেই রমযানের চাঁদ উদিত হয়। আমি সেখানে জুমাবারের আগের রাত্রেই চাঁদ দেখি। এর পরে মাসের শেষের দিকে মদীনায় ফিরে আসি। মদীনায় ফিরে আসলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (র.) আমাকে রমযানের চাঁদ কবে দেখেছি জানতে চাইলে আমি

[৯৫]. সহীহ মুসলিম-১০৮৮।

জুমাবারের আগের রাতে চাঁদ দেখার কথা জানাই। তখন তিনি আমাকে নিজে চাঁদ দেখেছি কি না জিজ্ঞেস করলে আমি উত্তরে বল্লাম, হ্যাঁ আমি দেখেছি এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (র.) সহ অন্যান্য লোকেরা জুমাবারেই রোযা শুরু করেছেন। তখন হযরত ইবনু আব্বাস (র.) বললেন, আমরা তো চাঁদ দেখেছি শনিবারে, তাই আমরা ত্রিশ রোযাই পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তখন আমি বললাম, আপনি কি হযরত আমীর মোয়াবিয়া (র.) এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না? তখন তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৬]

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, চন্দ্রে আকার বড় বা ছোট হওয়াটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ ও ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে কোন সময়ে চাঁদ দেখা গেছে সেটাই।

এছাড়া তাদের ঐ কর্মকাণ্ড উপরোক্ত চার মূলনীতির আলোকে ছাড়া ও ফিকহ্ ইসলামীর কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারা যায় এমন নীতিমালারও মোখালিফ। যা নিছক আপন পীর মুর্শিদ ও মরহুম সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন একজন হক্কানী আল্লাহর অলি দরবেশের আত্মায় কালিমা লেপনেরই নামান্তর এবং গোমরাহী ও ফিৎনা ছড়ানোর হাতিয়ার সাদৃশ্য। কারণ এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবী নামক গ্রহে দৃশ্যমান আকাশে চন্দ্র যেমন একটি সূর্যও অনুরূপ। তাছাড়া আল্লাহর সৃষ্টিতে পৃথিবী যেমন একটি গ্রহ, চন্দ্র-সূর্যও গ্রহ হিসেবে স্ব স্ব অবস্থানে চলমান ও বিরাজমান বটে; কিন্তু পৃথিবী নামক গ্রহ স্থিরগ্রহ মনে হলেও চন্দ্র সূর্য সহ প্রত্যেক গ্রহ তার অবস্থান হতে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণিয়মান।

অতএব, পৃথিবী নামক গ্রহের উপর আপন কক্ষপথে ঘূর্ণিয়মান এই চন্দ্র সূর্যের অবস্থান যেখানেই হয় সেখানেই দিবা-রাত্রি হিসাবে পরিচিত ও বিবেচিত। ফলশ্রুতিতে ওখানকার সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন ঐ দিবারাত্রির সময় হিসেবে পালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। যেমন দিবা রাত্রি উভয়ক্ষেত্রেই (চন্দ্র সূর্য উদয়মান সময়ে) সময় ০.১ টা আছে। কিন্তু সূর্য থাকাকালীন দুপুর ১টাকেই যোহরের নামাযের সময়, কামাই রোজগারের সময়,

[৯৬]. সহীহ মুসলিম-১০৮৭, সুনানে আবু দাউদ-২৩৩২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যাহ্নভোজের সময় হিসাবে পরিগণিত। তার মানে কর্মচাঞ্চল্যতা ও রোজগার করার জন্য হচ্ছে দিন। অপরদিকে সূর্য অস্তের পর হতে রাত আরম্ভ বা চন্দ্র প্রদর্শিত কালীন সময়ের রাত ০.১টা হচ্ছে সারাদিনের সকল প্রকার শ্রম ক্লান্তি অবসানে অঘোর ঘুমের সময়। তার মানে দুই শূণ্য একটার মধ্যে যে বিস্তর তফাৎ তা বিজ্ঞপাঠকের অবশ্য বোধগম্য হয়েছে। অর্থাৎ কোন বুদ্ধিমান লোকেই রাত ১টাকে যোহরের নামাযের সময় বলবে না। কেননা চন্দ্রকালীন সময়ের মধ্যে যোহরের নামায নামক আদায়ের জন্য কোন ওয়াক্ত বা নামায নেই।

এছাড়া ঘূর্ণিয়মান চন্দ্র সূর্য দ্বারা যে দিবা-রাত্রি হয়; তার উপর নির্ভর করে যে কোন সমাজে বিশেষ করে মুসলিম সমাজের যাবতীয় কর্মকান্ড ঐ ভিত্তির উপরই তারিখ, সময় নির্ধারিত পালিত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং কুরআন সুন্নাহ্ও ঐ যৌক্তিক বাস্তবতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে ও স্বীকৃতি দিয়েছে।

ফলশ্রুতিতে আমরা স্যাটেলাইটের বদৌলতে এর বাস্তবতা দেখতে পাই। যখন আমরা এদেশে রমযান মাসের রোযা, ইফতার, মাগরিব, সালাতে তারাবিহ্ পড়ে বের হই; তখন পবিত্র হারামাইন শরীফাঈনে দেখি যে, তারা ইফতার সারছেন বা সালাতে মাগরিব আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এভাবে আবার যখন রমযানুল করিমের সাহ্রী সেরে আমরা রোজারত সালাতে ফযর বা-জামাতে আদায় করে রোযা অবস্থায় অঘোর নিদ্রায় থাকি। ঠিক ঐ সময়ে পবিত্র হারামাইন শরীফাঈনের বাসিন্দারা কেউ সাহ্রীর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা সারছেন। তার মানে তখন তারা রোযা শুরুও করেন নি।

সুপ্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনার প্রক্রিয়ায় উভয় দেশের মুসল্লি-রোযাদারদের রোযা-নামায 'ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় কর' এবং 'চন্দ্র দেখে রোজা রাখ ও চন্দ্র দেখে ঈদ কর' এই নীতিবাক্যদ্বয়কে আল্লাহর কুদরতের অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্যের স্ব স্ব কক্ষপথে ও গতিতে ঘূর্ণিয়মান হবার যুক্তিক বাস্তব-সম্ভব বলে নিঃশর্তভাবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে ইসলাম বা ফিক্হে ইসলামী ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উভয় দেশের সায়েমিনও মুসল্লিদের রোযা নামাযও নিষ্কলুষ ভাবে যে আদায় অনুমোদিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, উপরোক্ত বিপথগামী জ্ঞানপাপীরা শুধুমাত্র রোযা এবং কুরবানী এ দু'বিষয় নিয়ে ইখতিলাফ করে পরিতৃপ্ত হয়।

তার মানে একদিন আগে সৌদি আরবের অনুসরণ করে রোযা ও কুরবানী করে। তবে নামায ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে ও ওয়াক্তের বিষয়ে নয়। ব্যাপারটি আমার বুঝে আসেনা।

অতএব, আমাদের দেশের কতিপয় মুসলিম কর্তৃক 'হারামাইনের পরের দিন ঢাকায় কেন ঈদের দিন' উক্তি সর্ববৈ গোড়ামী-উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ফিক্হে ইসলামীর উপর অযাচিত ভিত্তিহীন হস্তক্ষেপই বলা যেতে পারে। এছাড়া উপরোক্ত বক্তব্য অস্বীকার মানে- 'ইসলাম' পনের শত বছর পূর্বেকার, অতএব, ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত নয় আক্বিদা পোষণ করা ইসলামী ভৌগলিক জ্ঞান শুন্যতার বহিঃপ্রকাশ। যা দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিপদগামী করা ছাড়া বৈ কি। আল্লাহ্ হিদায়ত করুন। আমিন।

প্রয়োজনীয় মাসয়ালা:

- ❖ আকাশ সম্পূর্ণ ফর্সা হলে ফযরের নামায পড়া মুস্তাহাব। তবে এমন সময় আরম্ভ করা উচিত যাতে ৪০ আয়াত দ্বারা নামায শেষ করার পর কোন কারণে নামায নষ্ট হলে পূণরায় ৪০ আয়াত দ্বারা নামায দোহরান বা পূনরায় পড়া সম্ভব হয়।
- ❖ গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায বিলম্বে পড়া এবং শীতকালে নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা মুস্তাহাব।
- ❖ সালাতে জুমার খুৎবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বরে উঠবে, বসাও পূর্বে ও আজানে খোৎবার আগে মুসল্লিদের উদ্দ্যশ্য সালাম দেয়া অতপরঃ বসা জায়েজ। যেহেতু তখনো আযানে খোৎবা হয়নি এবং ইমাম ও মিম্বরে বসেনি। তাই সালামের আমল অতি উত্তম।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়:

সূর্য্যোদয়ের সময়, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় এবং সূর্য্যাস্তকালে। উল্লেখ্য থাকে যে, ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও ক্বাজা যাবতীয় নামায ওই তিন সময়ে পড়া জায়েয নেই। এমনিভাবে সাহু সেজদা ও তেলাওয়াতে সেজদাও নিষিদ্ধ। অবশ্য কোনদিন ঘটনাক্রমে আসরের নামায পড়তে বিলম্ব হয়ে গেলে সেই দিনের সেই নামায সূর্য্যাস্তের সময় আদায় করতে পারবে। কিন্তু অত দেরী করা মাকরূহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ❖ উক্ত সময়ের ভিতরে আয়াত সেজদা পাঠ করলে, সেজদা পরে আদায় করা উত্তম। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সেজদা আদায় করে তবে জায়েজ হবে। অবশ্য পূর্বে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে থাকলে; তবে উক্ত তেলাওয়াতের ওয়াজিব সেজদা ঐ সময়ে আদায় করা দোরস্ত নহে।
- ❖ উক্ত নিষিদ্ধ সময়ে জানাজার নামায পড়া নিষেধ। অবশ্য জানাযা নিয়ে আসলে পড়া দোরস্ত। কিন্তু সম্ভব হলে বিলম্ব করা উত্তম।
- ❖ কোন ব্যক্তি সোবহে সাদেকের পূর্ব হতেই পূর্বের অনাদায়ী কাযা নামায পড়তে থাকলে সেই অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে গেলেও পূর্বের (কাযাকৃত নামায আদায়ে রত) নামায সম্পন্ন করে নেবে। অতপরঃ ফযরের ফরয আদায়ের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্তমাকরূহ সময়। কোন নফল নামাযও পড়া যাবে না, এমনকি ফজরের সুন্নাত না পড়ে ফরয আদায় করলে সূর্য্যোদয়ের আগে সুন্নাত পড়ার সময় থাকলেও পড়বে না। পূর্ণ সূর্যোদয় হয়ে গেলে ঐ অনাদায়ী সুন্নাত/কাযা নামায পরে পড়বে।
- ❖ আসরের নামাযের পর হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্তমকরূহ সময়, উক্ত সময়ে কোন নফল নামাযও পড়বে না। ফরয নামাযের 'একামত' বলার পর সুন্নাত ও নফল পড়া মাকরূহ। প্রকাশ থাকে যে, ফযরের সুন্নাত না পড়ে থাকলে, এবং ফযরের জমাতে শামিল হাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা ফযরের জমাআত না পাবার সম্ভাবনা থাকলে, এ পর্যায়ে সুন্নাত দু'রাকাত আদায়ের পর তাশাহুদে শামিল হওয়ার অবকাশ থাকলে; সে অবস্থায় জমাআতের স্থান হতে দূরে পৃথকভাবে সুন্নাত পড়ে ফযরের জামাআতে শামিল হবে। যদি উপরোক্তভাবে জমাআতে শরিক হবার সম্ভাবনা মোটেই না থাকে, তবে সুন্নাত পড়বে না। পূর্ণ সূর্যোদয়ের পরে অবশ্যই সুন্নাত পড়ে নেবে।
- ❖ একামতের সময় সুন্নাত আদায় অবস্থায় থাকলে, দুই রাক্আতে সালাম ফিরাবে। তবে তৃতীয় রাক্আতে থাকলে পুরো পড়ে নেবে।
- ❖ যে সময় ইমাম জুমার খোতবার জন্য স্বস্থান হতে দাঁড়াবে, সে সময় হতে জুমার ফরয আদায় পর্যন্তযে কোন প্রকার নামায পড়া মাকরূহ। তবে নামাযরত থাকলে আদায় করে নেবে। হ্যাঁ এই নামায শেষ হতেই পরবর্তী নামাযের নিয়ত করবে বাধবে না।

- ❖ সুবহে সাদেকের পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্তফজরের সুন্নাত ছাড়া সকল প্রকার নফল নামায পড়া মাকরূহ।
- ❖ ফজর ও আসর নামাযে সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব স্বস্থানে বসে থাকা মাকরূহ। বরং মুসল্লীদের সম্মুখে নিয়ে বসা উত্তম।
- ❖

নামায ভঙ্গকারী (মাকরূহ) বিষয়াদির বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, মাকরূহ দু'প্রকারঃ তাহরীমী (ভারী) এবং তানজীহী (হালকা) শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিষয় করা না করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তা মাকরূহ তাহরীমী। এ জাতীয় মাকরূহ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়।

- ▯ আর যে গুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি মাকরূহ তানযীহী। এ জাতীয় মাকরূহ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না। তবে মাকরূহ তানযীহী বার বার সংগঠিত হলে মাকরূহ তাহরীমীতে পরিণত হয়। যা নামাযকে ভঙ্গ করে। যেমন কোন পুরুষ যদি নামাযের পূর্বে নিজের মাথার চুল বাঁধে এবং সেই বাঁধা চুল নিয়ে নামায পড়ে, তবে নামায মাকরূহ হবে। চাই সে এমনিতেই চুল বাঁধুক অথবা নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বাঁধুক। আর যদি সে নামাযের মধ্যে চুল বাঁধে তবে তার নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, এটা সর্ব সম্মত ভাবে নামাযের অন্তভূক্ত কর্মের পরিপন্থী কাজ।

নামাযের মাকরূহ্ তাহ্রীমির বিষয়াদি দু'প্রকার-

(ক) কথায় সম্পৃক্ত যেমন:

(১) ইচ্ছা বা ভুলে, স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায়, সামান্য হোক বা বেশী হোক কথা বলা।
(২) ইচ্ছা বা ভুলে সালামে তাহিয়্যাহ (সম্মানার্থে সালাম বলা) করা।
(৩) ইচ্ছা বা ভুলে সালামের উত্তর দেয়া।
(৪) হাঁচি দেয়া। (ইচ্ছা করে)
(৫) দুঃসংবাদের উত্তরে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়া।
(৬) সুসংবাদে 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়া।
(৭) আশ্চর্য্য সংবাদে 'সুবহানাল্লাহ্, বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া।
(৮) নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে নামাযে লুকমা (ভূল সংশোধন করে) দেয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) নামাযে এমন কিছু চাওয়া যা মানুষ থেকে চাওয়া হয়। যেমনঃ "হে আল্লাহ্! অমুক মহিলার সাথে আমাকে নিকাহ্ করে দিন অথবা আমাকে হাজার টাকা দিন।"
(১০) আহ্! উহ্ অথবা উফ্ বলা।
(১১) শুধু কুরআন শরীফ থেকে দেখেই নামায পড়া।
(১২) কুরআন শরীফ অশুদ্ধ পড়া। (অর্থ বিগড়ে যাওয়া বা বিকৃত বিশ্লেষণ বুঝায়)

(খ) কাজে সম্পৃক্ত যেমন:
(১) অতিরিক্ত কাজ। (যা নামায বহির্ভূত)
(২) জেনে বা ভুলে পানাহার করা।
(৩) কোন অসুবিধে ব্যতীত ক্বিবলা থেকে বক্ষ ফিরিয়ে নেয়া।
(৪) দু'কাতারের সমপরিমান জায়গা অনর্থক একবারে চলা।
(৫) ইমামের সামনে চলে যাওয়া।
(৬) তিন শব্দের সমান নামাযে লিখা।
(৭) ব্যথা ও দুঃখে কাঁদা (ইচ্ছাকৃত ভাবে)।
(৮) না বালেগ নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।
(৯) নামাযে নামাযি নয়, এমন লোকের কথা মান্য করা।
(১০) পুরুষ মহিলা সম্মিলিত জামাতে নামাযে মহিলাকে সামনে নিয়ে দাড়ানো (হারামাইন শরীফাইনে)।
(১১) ইমামতের অযোগ্য লোককে নায়েবে ইমাম নির্ধারণ করা।
(১২) ইমামের নামায ভঙ্গ হওয়ায় খলিফা নির্ধারণ করা ব্যতীত ইমাম মসজিদের বাইরে চলে যাওয়া।
(১৩) হাদস্ এর পর নামাযে (মুসল্লি) একটি মাত্র রুকন আদায়ের সময় পরিমাণ হাদস্ স্থলে অবস্থান (মাকরূহে তাহরীমি) করা।

উপরোক্ত কথায় ও কাজে সম্পৃক্ত মাকরূহ্ তাহরীমি সমূহ মুসল্লী কর্তৃক সম্পাদিত হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

নামাযে একাগ্রতা, চিৎকার, কান্না প্রসঙ্গ :

সুপ্রিয় পাঠক! উপরোল্লিখিত কথায় ও কাজে সম্পৃক্ত মাকরূহে তাহরীমি (নামাযে সংগঠিত অবৈধ এবং নামায নষ্ট করে পুনঃবার পড়তে হবে) সংক্রান্ত লিখার ক্রমসংখ্যা ১০ এবং কাজে ক্রম সংখ্যা ৭ প্রেক্ষিত সকলেই

অবগত যে নামায আদায়ে প্রথমত; আমরা যা করি; তার নাম তাকবিরে তাহ্রীমা। যার অর্থ শরীর এবং রূহ্ উভয়ই পৃথিবীতে অবস্থান আছে বটে কিন্তু তাকবিরে তাহ্রীমা দ্বারা ঐসব কিছু বা এর আনুসাঙ্গিকতা প্রয়োজনীয়তা নামায আদায়কালীন সময়ে মুসল্লী ব্যক্তি নিজের জন্য হারাম বা অবৈধ ঘোষণাই হচ্ছে তাকবিরে তাহ্রীমা।

এছাড়া হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা নির্দেশিত যে নামায সহ সকল প্রকার ইবাদত এমনভাবে করতে হবে মুসল্লী আল্লাহু জাল্লা মাজদুহুকে না দেখলেও নিরাকার আল্লাহ্ মুসল্লীকে দেখছেন এই মন-মনন নিয়ে ইবাদত বন্দেগী করা।

অতএব, খালেকে কায়েনাত আল্লাহু জাল্লা শানুহুর কাছে সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে নামায। তাই নামাযরত মুসল্লির অবস্থা ও অবস্থান কোন ধরণের হওয়া চাই তা বিজ্ঞ পাঠকই নিম্নোক্ত ঘটনার আলোকে বিবেচনা করবেন।

সুপ্রিয় পাঠক ও যে কোন দ্বীনদার মুসলমান ভাইয়ের মানসপটে ঐতিহাসিক এই ঘটনা গাথা আছে বলে মনে করি যে, ইসলামী ইতিহাসের ঐতিহাসিক খায়বার যুদ্ধে বিজয়ী হযরত মাওলা আলী শাহেন শাহে বেলায়ত মাওলা আলী মুশকিল কোশা কাররামাল্লাহু ওয়াজহা ঐ যুদ্ধে শত্রুবাহিনী কর্তৃক তাঁর পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর ব্যথার কারণে তাঁর পা মোবারক হতে ঐ তীর বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। সাথীগণ তীরবিদ্ধ হযরত আলী (রা.)'কে ঐ অবস্থাতেই রেখে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি নামাযরত হলে তাঁর পা হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহচরগণ তাঁর বিদ্ধ তীরকে বের করে নিয়েছিলেন।

এখানে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ব্যাথাতুর হযরত আলী (রা.) পা হতে তীর বের করার সময় সাথীগণ হযরত আলী (রা.)'র কাছ হতে ব্যথা অনুভবের কোন লক্ষণই দেখলেন না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা.) নামায শেষ হলে তাঁর পা থেকে তীর বের করার কথা বলা হলে শাহেন শাহে বেলায়ত, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী মুশকিল কোশা (রা.) উত্তর করেছিলেন আমার তো বিদ্ধ তীর বের করা সম্পর্কে লেশমাত্রও বোধ হয় নি।

অনুরূপভাবে হযরত ওরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (র.) এর পায়ে গ্যাংগ্রীণ রোগ হওয়ার ফলে চিকিৎসকরা তাঁর পা মুবারক কেটে ফেলার জন্য অপারেশনের পূর্বে Senseless করার জন্য (অনুভূতিহীন) Anesthesia

pdf By Syed Mostafa Sakib

অ্যানেস্থেসিয়া হিসেবে এক গ্লাস মদ পান করানো প্রয়োজন বলা হলে তিনি শুনে চিকিৎসকদের কথাকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে বললেন,কিভাবে আমি মদ পান করব অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কিতাবে মদ পান হারাম করেছেন। বরং তোমরা আমাকে ধরে নামাযে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি যখন সিজদায় যাব তোমরা তোমাদের কাজ সেরে নিবে। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং যখন সিজদায় গেলেন, চিকিৎসকরা সিজদারত অবস্থাতেই তাঁর পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন অথচ তিনি একটুও নড়াচড়া না করে স্থির রইলেন। সুবহানাল্লাহ।[৯৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (র.) নামাযে দাঁড়ালে গাছের খুঁটি মনে করে তাঁর মাথায় ও কাঁধে পাখি বসে পড়ত। সুবহানাল্লাহ। শাহিনশাহে নবুওয়াতের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হযরত সিদ্দীকে আকবর (র.) এর নামাযও এরকমই ছিল।[৯৮]

প্রখ্যাত তাবেয়ি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রা.) যখন নাকি খোলা মাঠে নামাযে দাঁড়াতেন, তাঁর মাথায় পাখি আস্তবৃক্ষ মনে করে বসত আবার চলেও যেত। পাখিরাও বুঝত না যে, খোলামাঠে দণ্ডায়মান ইনি কি মানব না বৃক্ষ।

আসলে ঈমানের দাবী ও তাই। অতএব প্রত্যেক মুমিন নামাযের মধ্যে একাগ্রতা ও এখলাছকে উপরোক্তভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে নামায কেন প্রত্যেক রিয়াযত বন্দেগীতে অনুসরণ অনুশীলন এর প্রচেষ্টা চালানো উচিত বলে মনে করি।

কিন্তু দুঃখ লাগে বর্তমান আমাদের সমাজে এমন মুসল্লিও দেখা যায় যে, তাদের ঈমানের সতেজতার কারণে!!! নামাযরত অবস্থায় সপ্রণোদিতভাবে চিৎকার করে উঠে। আবার নাকি কেউ কেউ বা জমাতে নামাযরত অবস্থা হতে দৌড়ে গিয়ে গাছে উঠে পড়ে এবং চিৎকার করতে থাকে। মজার ব্যপার হচ্ছে, তারা নাকি কাঁটাবিহীন গাছে ওঠে। কাঁটাযুক্ত গাছকে এড়িয়ে যায় আবার কিছুক্ষণ পরে ওখান থেকে নেমে এসে জামাতে সামিল হয় এর দ্বারা ঐ গাছে আরোহণকারী ব্যক্তির নামায তো যাবেই; অগ্র পশ্চাতে দাঁড়ানো মুসল্লিদের

[৯৭] .তারীখে দামেশক-৪০/২৬, সিয়রু আলামিন নুবলা-৪/৪৩১।
[৯৮] . মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৭২৪৫।

নামাযের অবস্থার ফায়সালা বিজ্ঞ পাঠকের বিবেকেই দিলাম। এগুলো নিছক ভণ্ডামি, গোমরাহী, লৌকিকতা ছাড়া বৈ কি?

প্রকাশ থাকে যে, নামাযরত অবস্থায়, ইমাম সাহেবের তিলাওয়াতে কুরআনের প্রেক্ষিতে মুসল্লির অবচেতনা বা বেহেস্ত দোযখের শান্তি, শাস্তির কথা তিলাওয়াতে কুরআনে পাকে আসার কারণে মুসল্লির কান্না এসে গেলে ফিকুহশাস্ত্রবিদগণ ঐ রকম কান্নাকে নামায ভঙ্গের কারণ হিসেবে নেন নি। কারণ এ কান্না অনিচ্ছাকৃত।

এতদ্ব্যতীত নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদিও নামাযে মাকরূহ (মাকরূহে তাহ্যীহি বা গুনাহ্) বা অপছন্দনীয় যেমন-

(১) কোন ওয়াজিব বা সুন্নাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া।
(২) স্বীয় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা।
(৩) অনর্থক কষ্করাদি উলট-পালট করা।
(৪) আঙ্গুলের মটকা ফুটানো এবং এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করানো।
(৫) কোমরে হাত দেয়া এবং ঘাড় ফিরিয়ে তাকানো।
(৬) নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু দন্ডায়মান রেখে বসা।
(৭) সিজদার সময় দু'হাতের নিম্নভাগ ভূমিতে বিছিয়ে দেয়া।
(৮) দু'হাতের নিম্নভাগ থেকে জামার আস্তিন গুটিয়ে নেয়া। (নামায রত অবস্থায়)
(৯) জামা গায়ে দেয়ার মত শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্বেও কেবল পায়জামা বা লুঙ্গি পরে নামায পড়া বা খালি শরীরে নামায আদায় করা।
(১০) ইশারায় সালামের জবাব দেয়া। (নামাযরত অবস্থায়)
(১১) কোন অসুবিধে ব্যতীত আসন পিঁড়ি হয়ে বসা।
(১২) পুরুষের মাথার চুল বাঁধা।
(১৩) রুমাল দিয়ে মাথা বাঁধা এবং মাথার মধ্যভাগ খোলা রাখা। (পুরুষের বেলায়)
(১৪) সিজদায় যাওয়ার সময় কাপড় গুটানো। (পুরুষের বেলায়)
(১৫) যে কোন পোষাক নিয়ম মাফিক না পরে কেবল শরীরের উপর ঝুলিয়ে রাখা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৬) শরীরের উপর এভাবে কাপড় জড়ায়ে নেয়া যে, দু'হাত বের করা না যায়

(১৭) ডান বগলের নীচে কোন কাপড় দিয়ে তার দু'মাথা বাম কাঁধের উপর দেয়া অথবা তার বিপরীত করা।

(১৮) নামাযের ক্বেয়াম (দাঁড়ানো অবস্থা) ব্যতীত অন্য কোন রুকনে ক্বেরআতে কুরআন পড়া।

(১৯) নফল নামাযে প্রথম রাকআত দীর্ঘ করা এবং অন্য সকল নামাযে প্রথম রাকআতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকআত দীর্ঘ করা।

(২০) ফরয নামাযের কোন এক রাকআতে কোন সূরা একাধিক বার পড়া।

(২১) যে সূরাটি পড়া হয়েছে তার পূর্বের সূরা পড়া।

(২২) দু'রাকআতে পঠিত দু'সূরার মাঝে এক সূরার ব্যবধান রাখা।

(২৩) ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া।

(২৪) শরীরের কাপড় বা পাখা দিয়ে একবার বা দু'বার বাতাস করা।

(২৫) সিজদা ইত্যাদিতে হাত অথবা পায়ের আঙ্গুল ক্বেবলা থেকে ফিরিয়ে নেয়া।

(২৬) রুকুতে দু'হাটুর উপর দু'হাত না রাখা।

(২৭) হাই তোলা।

(২৮) চক্ষু বন্ধ করা এবং আকাশের দিকে চক্ষু তোলা।

(২৯) আড়মোড়া দেয়া।

(৩০) এমন কোন কাজ করা, যদ্বারা নামাযরত লোকটিকে নামাযরত নয় বলে মনে হয়।

(৩১) উকুন ধরা এবং তা মারা।

(৩২) নাক ও মুখ ঢেকে রাখা।

(৩৩) মুখের মধ্যে এমন কিছু রাখা যা সুন্নাত মোতাবেক ক্বেরাআত পড়তে বাধা সৃষ্টি করে।

(৩৪) পাগড়ীর পেঁচের বা লেছের (শামা) উপর সিজদা করা।

(৩৫) নাকের কোন অসুবিধে ব্যতিরেকে কেবল কপাল দ্বারা সিজদা করা।

(৩৬) রাস্তায়, গোসল খানায়, শৌচাগারে, কবরস্থানে এবং অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের মালিকানাধীন জমিতে নামায পড়া।

(৩৭) নাজাসাতের নিকটবর্তী কোন স্থানে অথবা পায়খানা বা পেশাবের বেগ চেপে রেখে অথবা পেটের বায়ু চেপে রেখে অথবা নামাযের বিশুদ্ধতার অন্তরায় হয় এ পরিমান নাজাসাত সহকারে নামায পড়া। কিন্তু যদি নামাযের ওয়াক্ত অথবা নামাযের জামাআত ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে। তবে এ অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ হবে না। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত বা জামাআত ছুটে যাওয়ার ভয় না থাকে তবে পায়খানা পেশাব সেরেই নামায পড়া মুস্তাহাব।

(৩৮) ময়লা বা তুচ্ছ বা ফাটা ছেড়া কাপড় পরে নামায পড়া।

(৩৯) খোলা মাথায় নামায পড়া। তবে বিনয় ও নম্রতার উদ্দেশ্য হলে মাকরূহ নয়।

(৪০) এমন খাবারের উপস্থিতিতে নামায পড়া, যার প্রতি সে আগ্রহী হয়।

(৪১) এমন কোন জিনিষের উপস্থিতিতে নামায পড়া, যা মনকে আকৃষ্ট করে এবং মনের একাগ্রতা নষ্ট করে।

(৪২) আয়াত এবং তাসবীহ হাতে গণনা করা। (নামাজ রত অবস্থায়)

(৪৩) মেহরাবে অথবা (এক হাত উঁচু) ভিন্ন কোন স্থানে অথবা জমিনের উপর ইমামের একাকী দাঁড়ানো।

(৪৪) এমন সারির পিছনে দাঁড়ানো, যার মধ্যে ফাঁকা রয়েছে।

(৪৫) এমন পোষাক পরিধান করা যাতে ছবি রয়েছে।

(৪৬) মাথার উপরে অথবা পিছনে অথবা সামনে অথবা পার্শ্বে কোন ছবি থাকা। তবে যদি অতি ক্ষুদ্র হয়, অথবা মাথা কাটা হয় অথবা নিস্প্রাণ কোন জিনিষের ছবি হয়, তবে মাকরূহ হবে না।

(৪৭) সামনে চুলা বা পাথর থাকা, যাতে জ্বলন্তআঙ্গার রয়েছে।

(৪৮) সামনে লোক জন ঘুমিয়ে থাকা।

(৪৯) নামাযের মধ্যেই কপাল থেকে এমন ধুলু বালি মুছে ফেলা, যা কোন অসুবিধে (মুসল্লির) করছেনা।

(৫০) কোন সূরাকে এভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া যে, নামাজি ব্যক্তি সে সূরা ব্যতীত অন্য সূরা পড়ে না। তবে যদি সহজের জন্য অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্বেরাআতের বরকত হাসিলের জন্য পড়ে, তবে মাকরূহ হবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫১) যেখানে নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে লোকজনের যাতায়াতের সম্ভাবনা আছে, এমন জায়গায় "সুতরা" (বাঁশের /লাটির সাদৃশ্য বস্তু) ব্যবহার না করা।

নামাযে সুতরা বা আড়াল স্থাপনের গুরুত্বঃ

উল্লেখ্য যে, খোলা মাঠে বা লোকজনের যাতায়াতের সম্ভাবনা আছে এমন জায়গায় কেউ নামায আদায় করতে গেলে তার উপর সামনে ছুতরা (আড়াল) গেড়ে দেয়া আবশ্যক। কেননা হাদীস শরীফে ছুতরার বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র.) বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

অর্থাৎ- "তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন সামনে ছুতরা দিয়ে নামায পড়ে, আর সামনে দিয়ে কেউ যাতায়াত করতে চাইলে তাকে যেন যেতে দেয়া না হয়। এর পরেও কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে চাইলে প্রয়োজনে সে যেন তার সাথে মারামারি করে। কেননা সে শয়তান"। [৯৯]

ছুতরার সাইজ সম্পর্কে ফুকহায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে, যার দৈর্ঘ হবে একহাত লম্বা আর মোটা হতে হবে কমপক্ষে হাতের আঙ্গুলের সমান।

আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এসেছে,

أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُهَا ذِرَاعًا فَصَاعِدًا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ الْإِصْبَعِ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو

অর্থাৎ- ছুতরার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হচ্ছে একহাত বা এর অধিক লম্বা হওয়া আর ঘণত্বের দিক দিয়ে আঙ্গুলের সমান হওয়া উচিত। [১০০]

[৯৯]. ইবনু মাজাহ-৯৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান-২৩৬৯।

[১০০]. আল-বাহরুর রায়েক-২/১৮

মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা

নামাযরত মুসল্লীদের সম্মুখ দিয়ে গমনাগমন করা শক্ত গুনাহ। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীস প্রণিধানযোগ্যঃ

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، أَوْ «أَرْبَعِينَ شَهْرًا»، أَوْ «أَرْبَعِينَ سَنَةً»

অর্থাৎ- হযরত বুসর ইবনে সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (র.) হযরত আবু জোহাইম (র.)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে থেকে। মুসল্লীদের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে কি গুনাহ হয় এ সম্পর্কে কি শুনেছেন? আবু জোহাইম (র.) উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যে ব্যক্তি যাতায়াত করে সে যদি জানত এতে কি পরিমান গুনাহ, তা হলে সে ব্যক্তি মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ দিন/মাস/বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা বা দাড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। বর্ণনা কারী বলেন, চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস বলেছেন না চল্লিশ বছর বলেছেন আমার জানা নেই। [১০১]

ফরয নামাযের ইতিকথা:

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের জন্য সামাজিক এবং মহৎ সভ্য মু'মিন মানব হিসাবে আমরা যে কর্মগুলো সম্পাদন করি ঐ সাধারণ কাজগুলো এমনভাবে প্রবর্তন করেছেন যে, প্রত্যেকটা আমল কর্মই আল্লাহ্‌র স্মরণে যেন ভরপুর থাকে। যেমন নবজাত শিশু ভূমিষ্ট হলে আযান দেয়ার প্রথাটা ঠিক তারই অনুসরণ

[১০১]. সহীহ বুখারী-৫১০, সহীহ মুসলিম-৫০৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাত্র। কেননা যার প্রথম ভাল, আশা করা যায় তার শেষ ও সৎ, মহৎ হবে তাই বাচ্চার কানে আযান ইকামত দিতে হয়।

- তদরূপ নামাযের রাকাতসমূহের ভিন্নতার মধ্যে ও শরিয়ত প্রবর্তক এমন স্মরণীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে ওই রাকাতসমূহ দ্বারা উম্মত যেন অতীত আম্বিয়া (আ.)-এর স্মৃতি সমূহ এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বস্থতা-আন্তরীকতা আরো বৃদ্ধি পায়।
- যেমন ধরুন ফযরের নামাযের সময়ও দু'রাকাত ফরয নামায। এতে হযরত আদম (আ.)-এর স্মরণই নিহিত। কেননা তিনি পৃথিবীতে রাত্রিকালীন এসেছিলেন ফলে তিনি চিন্তিত হলে সকাল উদিত হলো অতঃপর তিনি দু'রাকাত কৃতজ্ঞতা আদায়ে নামায পড়েছিলেন, আর উম্মতে মুহাম্মদি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র জন্য তা ওয়াক্তে ফযর ও নামাযে ফযর হলো।
- এভাবে যোহরের নামাযের বেলায় মুফাস্‌সিরিনরা বলেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে (আ.) যে কোরবানী দেয়ার মানসে নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর পরিবর্তে স্বর্গীয় দুম্বা কুরবানীকৃত পেয়েছিলেন। প্রাণপ্রিয় পুত্রের প্রাণ রক্ষাও হয়েছিল এবং তাঁর কোরবানী ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয়েছিল আল্লাহর ঐ কঠিন পরীক্ষায় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি চার রাকাত শুকরানা নামায পড়েছিলেন। অতঃপর আমাদের জন্য তা যোহরের নামায এবং যে সময়ে এ কোরবানিটা পেয়েছিল ওই সময় হলো যোহরের সময়।
- হযরত ওযায়র (আ.) শত বৎসর পর জীবিত হয়েছিলেন আসরের সময়ে এবং অনুকম্পা আদায়ে তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) তাঁর তাওবা কবুল হওয়ার প্রেক্ষিতে সূর্য ডুবার সাথে সাথে চার রাকাত এর নিয়তে শুকরীয়া নামায আদায় শুরু করেছেন: কিন্তু তৃতীয় রাকাতে বসে গিয়েছিলেন এবং সাহু বশতঃ সালাম ফিরায়ে ছিলেন। তাই মাগরিবের নামায হলো।
- আর হাবীব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং চার রাকাত এশার নামায আরম্ভ করেছিলেন। উম্মতের জন্য চার রাকাত এশা ফরয হলো। (তাহাবী শরীফ)

নামাযের ভিতরে বিশেষ লক্ষ্যণীয়:

- নামাযে যদি কেয়ামে বা দাঁড়ানো অবস্থায় হাই আসে ডান হাতের পিঠ দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। বামহাত সরাবে না।
- কাওমায় অর্থাৎ রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায়, দুই সেজদার মধ্যখানে, জানাযায় বা কা'দায় তাশাহুদের বৈঠকে বাম হাত ব্যবহার করবে তদ্রুপ চুলকাতেও উপরোক্ত নিয়ম পালন করবে। তবে নামাযরত অবস্থায় কোন অংগ চুলকাতে হলে পুরা হাতে নয়, দুই আঙ্গুলে, তাও এক রোকনে তিন বারের বেশী নয়।

আকসামে সালাত:

নামায কয়েক প্রকারের যথা- ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাতে মাওয়াক্কাদা, সুন্নাতে যায়েদা ও নফল।

- ফরযে আইন: পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায সমূহ যথা-ফযরের দু'রাকাত, যোহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাত, মাগরিবের তিন রাকাত, এশার চার রাকাত এবং নামাযে জুমায় দু'রাকাত।
- ফরযে কেফায়া, (চার তকবীরে সাথে জানাযার নামায)।
- ওয়াজিব: বিতিরের তিন রাকাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দু'রাকাত নামায, তাওয়াফ শেষ করে দু'রাকাত, তাছাড়া কোন নামাযের মানত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব, এবং নফল নামায শুরু করে কোন কারণে ভঙ্গ হলে/করলে তা পুনরায় ক্বাযা করা ওয়াজিব।
- সুন্নাতে মাওয়াক্কাদা: ফযরের সময় ফরযের পূর্বে দু'রাকাত। জোহরের সময় ফরযের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত: মোট ছয় রাকাত। মাগরিবের পূর্বে ফরয নামাযের পর দু'রাকাত। এশার ফরয নামাযের পর দু'রাকাত। জুমার ফরযের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত। রমজান শরীফে বিশ রাকাত 'সালাতে তারাবী' ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।
- সুন্নাতে জায়েদা: আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত। এশার ফরযের পূর্বে চার রাকাত। বিতিরের নামাযের পর দু'রাকাত শফিউল বিতিরের নামায।
- তাহাজ্জুদের নামায, কমপক্ষে দু'রাকাত উর্দ্ধে বার রাকাত: এবং মধ্যম আট রাকাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবন চরিত্রের মধ্যে আমি পড়েছি যে, একদা হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ গঞ্জে শাকার (রাহ.) তাঁর মাতা সাহেবার কাছে দোয়া চাইতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আম্মাজান! দোয়া করবেন আমার যেন সালাতে তাহাজ্জুদ ক্বাযা না হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ্! আমার আজো কোন তাহাজ্জুদের নামায ক্বাযা হয় নি।' উত্তরে মা বলেছিলেন, 'প্রিয় বৎস! আসলে সেটা তোমার কোন কৃতিত্ব নয়; আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুক। ওটা কিন্তু আমারই অবদান। যেহেতু তোমার জন্মের পর হতে তুমি যতদিন আমার দুধ পান করেছিলে; আমি কখনো বেওযুতে তোমাকে দুধ পান করাই নি।' সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের মা বোনদেরও বাবা ফরিদ (রাহ.)'র মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন। আমিন।

এহ্রাম বাঁধার পূর্বে দু'রাকাআত। সূর্য গ্রহণের সময় দু'রাকাত, চন্দ্র গ্রহণের সময় দু'রাকাত। নফল নামায, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত: ইশরাক, সূর্য উদয়ের পর মাকরূহ সময় অতিক্রম করলে দু'রাকাত। (সে সময় সূর্য হলুদ বর্ণ ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়)

সালাতুদ্দোহা বা চাশত, অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠার পর হতে ঠিক স্থীর হওয়ার আগ পর্যন্ত, চার রাকাত হতে বার রাকাত পর্যন্ত। সুন্নাতুজ্জাওয়াল, সূর্য পশ্চিম দিক ঢলিবার পরক্ষণেই চার রাকাত। তাহিয়াতুল ওয়াযূ। ওযু ও গোসল করার পর শরীর বা অযুর অঙ্গ শুকাবার পূর্বে দু'রাকাত, তাহিয়াতুল মসজিদ, মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে দু'রাকাত। কিন্তু এ দু'নামায মাকরূহ সময় হলে পড়বেন না। সালাতুল আওয়াবীন, মাগরিবের সুন্নাতের পর তিন নিয়তে ছয় রাকাত। সালাতুত্ তাস্বীহ্, চার রাকাআত। সালাতুস্ সাফর, বিদেশে যাবার সময় ও ফিরে এসে নামাযের মাকরূহ সময় না হলে দু'রাকাআত। সালাতুল কতল, যদি কোন মুসলমান নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, তাহাকে হত্যা বা কর্তন করা হবে, তাহা হলে দু'রাকাত নামায স্বীয় মাগফেরাত কামনায় পড়বে।

❖ সালাতুল্ মুসীবত: যদি ভীষণ ঝড় তুফান আরম্ভ হয়, বা বজ্র পড়ে, আকাশে অসংখ্য তারকা ছুটে, বরফ পড়ে, অতি বৃষ্টি হয়, বন্যা হয়, বড় রকমের মহামারী রোগ দেখা দেয়, শত্রুর ভয় হয়; কোন প্রকার বিপদাপদ দেখা দেয়: বা অভাব দেখা দেয়, তাহা হলে নফল নামায পড়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট মুক্তি কামনায় নামায পড়া মুস্তাহাব। সালাতুল ইসতিসকা, একা একা দু'রাকাত। সালাতুল

হাজাত, দু'রাকাত। সালাতুল এস্তেখারা, দু'রাকাত। সালাতুত তাওবা, দু'রাকাত।

❖ এ ছাড়া লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল আশুরা, লাইলাতু ঈদিল ফিত্র, লাইলাতু ঈদিল আযহা, মুহর্রম মাসের প্রথম দশ রাত্রিতে, জিল্হজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত্রিতে, পবিত্র মিরাজ রজনীতে এবং বৎসরের বরকতময় রাত্রি সমূহে নফল নামায পড়া অনেক পূণ্যের কাজ।

❖ প্রকাশ থাকে যে, নফল নামায সমূহ জামাআত সহকারে পড়া মাকরূহ। হানাফি মাজহাব অনুসারী সকল ওলামাগণ এ কথার উপর একমত যে, নফল নামায আহ্বানের মাধ্যমে জামাআত সহকারে পড়া মাকরূহ [১০২]। (তাছাড়া উক্ত মাসয়ালা সংক্রান্ত আমি অধমের সাথে ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত শেরে বাংলা (রহ.)'এর সাথে অনেক বিতর্ক হয়েছিল। পরবর্তিতে তিনি আমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করে ছিলেন। এবং তাঁর সকল অনুসারিদের নফল নামায জমাতে পড়া মাকরূহ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমার লিখিত ফতোয়ায় বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের অনেক বিখ্যাত মুফতি ওলামাদের অভিমত সহ দস্তখত রয়েছে যা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ঐ সময় আমি "সত্যের প্রতি আহবান" নামক বই এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রণ করেছিলাম। পরবর্তীতে মুহতারম হুজুর ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.) আমার উস্তাদ, মুর্শিদ, মাওয়া এবং অন্যতম রাহবুর পাথেয় হবার কারণে আদবান দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ হতে আজো বিরত আছি আল-হামদু লিল্লাহ। স্মরণতব্য যে, হুজুর গাজীয়ে মিল্লাতের লিখিত অনেক কিতাবও রয়েছে এবং সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অনেক সাহাবা ও বুজুর্গানে দ্বীনগণের জীবনালেখ্য উল্লেখ সম্বলিত একটি হামদ-নাতের একটি কিতাব 'দীওয়ানে আযিয' নামে রয়েছে। তাঁর বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ফাতওয়ার কিতাব হচ্ছে 'ফাতওয়ায়ে আযিযিয়া'। উক্ত কিতাবটি মূলতঃ আদর্শবান সুন্নী ঘরানায় প্রচলিত ও অনুশীলিত

---

[১০২]. আল-মাবসূত লিল-ইমাম মুহাম্মদ-১/৪৪৩, আন-নুকাতু লিস-সারাখসী-১/১৬৯, বাদায়ে'-১/২৭৫, আল-মুহীত-১/৪৩৮, বাহরে রায়েক-১/৩৬৬, আলমগীরী-১/৮৩, দুররে মুখতার-২/৪৫,

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়গুলো দালীলিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যা আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের জন্য অতি মূল্যবাণ প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঐ ফাতওয়ার কিতাবে নফল নামায সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি। যেহেতু আমার সাথে ইতিপূর্বে জামায়াতে না পড়া সংক্রান্ত বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়ে গিয়েছিল। তবে দীওয়ানে আযিয' কিতাবটি যেহেতু আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনালেখ্য এবং আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.) যে সকল বুজুর্গের সাক্ষাত লাভ অথবা মাজার যেয়ারত বা ফুয়ূযাত বারাকাত হাসিল করেছেন ঐ সকল বিষয়ের উপর লিখিত একটি হামদ ও নাতের কিতাব। ঐ কিতাবকে আমরা কোন অবস্থাতেই ফাতওয়ার কিতাব বা তাঁর শরয়ী মাসলা মাসায়িলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের কিতাব মনে করতে পারিনা। এছাড়া জোহরের দু'রাকাত সুন্নাতের পর দু'রাকাত ও এশার দু'রাকাত সুন্নাতের পর দু'রাকাত, মাগরিবে সুন্নাতের পর দু'রাকাত এ সকল নফল নামায সমূহ দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম।

নামায আদায়ের পদ্ধতি:

প্রথমে সোজা ক্বিবলামুখী হয়ে উভয় পা সোজা ক্বিবলামুখী করে উভয় পায়ের মধ্যখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়ানোকে আরবীতে 'ক্বিয়াম' বলা হয়।

নামাযে "ক্বিয়াম" সম্পর্কিত বিভ্রান্তিমূলক বিশেষ ব্যাখ্যার অপনোদন:

মাযহাব অনুসরণকারীদের কোন আলেমে দ্বীনের একথা অজানা নয় যে, নামায আদায়ে দাড়ানো, রুকু, সেজদা, কুয়ুদ, তাশাহুদ, কুয়ুদে আখিরা সালাম ইত্যাদি পালনে চার বরহক ও অনুস্বরণ কর্তব্য মাযহাবের নীতিমালার মধ্যে কোন মত প্রার্থক্য নেই। শুধু মাত্র গুটি কয়েক বিষয় যেমন আমিন বড় করে বলা, ইমামের পিছনে মুক্তাদি কিরাত পড়া বা না পড়া, তাকবির সমূহে হাত তোলা, না তোলা ইত্যাদি গুটিকতেক বিষয়ে মত প্রার্থক্য আছে। তবে ক্বিয়ামে সালাতে (নামাযে দাড়ানো) দু'পায়ের মাঝে চার আংগুলের অধিক ওযর বশতঃ ছাড়া ফাঁক রাখা মাকরুহ।

পরিতাপের সহিত পাঠক খেদমতে আরজ করছি যে, যারা মাযাহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করেনা বা "গাইরে মুকাল্লিদ" তারাই নামাযে দাড়ানোর মধ্যে দু'পায়ের মাঝে চার আংগুল অধিক ফাঁক রাখেন। এজন্য যে

পেট থেকে যদি বাতাস (বায়ু) বের হয় তা যেন অনুভব করতে না পারে। কারণ দাড়ানো অবস্থায় বায়ু বের হলে আর ঐ সময় যদি দু'পায়ের মাঝে অধিক ফাঁক থাকে তাহলে বায়ু বের হল কিনা তা অনুভব করতে না পারা স্বাভাবিক। সেজন্য অট্টহাসি দেয় এমন অযু ওয়ালা লোক নামাযরত অবস্থায় অট্টহাসি দিলে ওযু নষ্ট হবে। ঐ নামাযকে দোহরাতে হবে এবং নামায আদায়ে পুনঃঅযু করতে হবে। এ সম্পর্কিত ঐ শ্রেণীর লোকদের হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র অপব্যাখ্যার জবাব এবং মর্ম না বুঝার খণ্ডন এই গ্রন্থে লিখেছি আশা করি পড়বেন।

তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা সহ নামায আদায়ের নিয়ম:

এভাবে দাঁড়ানোর পর- ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু ..... পড়বে। অতঃপর নিয়ত পড়ার পর (পরিপূর্ণ পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার সাথে হাত উঠানোর সাথে সাথে মুসল্লি সৃষ্টি জগতের স্রষ্টার কাছে নম্রতা অপারাগতা স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ-সম্মান ইত্যাদির ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ-পরিবর্জন করছে এই মর্মে) "আল্লাহু আকবর" তাকবীর বলবে।

মনে রাখতে হবে, নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবর' বলার সময় (পূর্বে নয়) উভয় হাতের তালুদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধবিহীন ক্বিবলামুখী রেখে উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলীর অগ্রভাগ কানের লতির (কর্ণমূলের) সাথে লাগাবে এবং 'আল্লাহু আকবর' বলা শেষ হবার পূর্বেই 'পুরুষ' নাভীর নীচে ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বাম হাতের কব্জির উপর গিরা লাগিয়ে বাঁধবে বা গ্রন্থি বন্ধন করবে, আর মেয়ে লোকেরা একই নিয়মে হাত উঠিয়ে স্বীয় স্কন্ধের সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ লাগাবে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলা শেষ হবার পূর্বে বুকের উপর একই নিয়মে হাত বাঁধবে। কিন্তু দো'পাট্টা (ওড়না) ইত্যাদির বাইরে হাত আনবেনা বা রাখবেনা।

প্রকাশ থাকে যে, ইমামুদ দুনিয়া ফিল ফিক্বাহ হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত (র.) এর মতে নামাযে তাকবীরে তাহরিমার পর উপরোক্ত নিয়মে হাত বাঁধার দর্শন ও যৌথিক কারণ এই যে, তাঁর মতে মানবের হৃদয়ের কুমন্ত্রণার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে "নাভি"। তাই তিনি তাকবীরে তাহরিমার পর নাভি ও যেন গ্রন্থিবন্ধনে রতবস্থায় চেপে ধরে রাখা মসনুন করেছেন। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রাহ.) এর দৃষ্টিকোণে কুমন্ত্রণার উৎপত্তিস্থল হলো সিনা বা কলব। ফলে তাঁরা তাকবিরে তাহরিমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর সিনায় হাত বাঁধাকে মসনুন করেছেন। এভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) এর মত হচ্ছে, যেহেতু নামায খালেকে কায়েনাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়। আর তাকবিরে তাহরিমার মাধ্যমে তা শুরু করা হয়। অতএব তাহারিমা মানে বান্দা নিজের জন্য সবকিছু নিজেই অবৈধ ঘোষণা করা বা সৃষ্টি কর্তার দরবারে আত্মসমর্পণ করা। ফলে তিনি তাহরিমার পর হাত ছেড়ে দেয়ার নিয়ম প্রচলন করেছেন। তার মানে হাত আত্মসমর্পণের সময় উপরের দিকে তোলা হয়। এখানে নিচের দিকে সোজা হাত ছেড়ে দিয়ে সানা, সুরা, ক্বিরাত আরম্ভ করাকে মসনুন করেছেন।

এভাবে 'তাকবীরে তাহ্‌রিমা' আদায়ের পর মুসল্লি 'দোয়ায়ে সানা' অর্থাৎ এই মর্মে স্বীকার উক্তি দেবে যে, হে প্রভূ! আপনি পবিত্র নির্দোষ সত্তা- আমি তোমার করুনা নেয়ামতের দান ও কৃপা প্রার্থী। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই অর্চনা-বন্দেগী করছি। এবং এও স্বীকার উক্তি দিচ্ছি যে প্রভূ তুমি ছাড়া আমার উপাস্য বন্দেগী উপযুক্ত কেউ নেই। তুমিই সৃষ্টি কর্তা-লালন-পালনকর্তা এরপর মুসল্লি (নামায আদায়কারী) 'তাউজ' পড়ে মহান প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনার পর মাবুদে বরহক রহমান রহীমের নাম লয়ে (তাসমিয়া আদায় করে) সূরা ফাতেহা ও ক্বিরআত শেষ করে 'আল্লাহু আকবর' বলে রুকু করবে।

রুকু অবস্থায় পৃষ্ঠদেশ, মাথা ও পাছাদ্বয় সমান অবস্থায় রেখে হাত হাঁটুর উপর রাখবে যেন শরীরের ভার হাতের মাধ্যমে হাটুর উপর থাকে। এমন সময় আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নীচে থাকবে। বাহুদ্বয় বগলদ্বয় থেকে পৃথক রাখবে। আঙ্গুলগুলো আপন অবস্থায় রাখবে; নড়াচড়া করবে না। মেয়ে লোকেরা আঙ্গুলগুলো ও বাহুদ্বয় মিলিয়ে হাঁটুর উপর হাত রাখবে।

'রুকু'র তাস্‌বীহ শেষ করে 'সামি আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্' বলে হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদু' বলবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'ক্বাউমাহ্' বলে।

তারপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সিজদায় যাবে। সিজদা শুদ্ধ হওয়ার মসনুন নিয়ম হচেছ প্রথমে হাটুদ্বয় এরপর দু'হাত মুষ্টিবদ্ধহীন মাটিতে রাখবে। এরপর মাথা (কপাল) ও নাক মাটিতে কিবলা মুখী রাখবে। দু'পায়ের আঙ্গুল সমুদয় জায়ে নামায হতে পৃথক না হয় মত কিবলা মুখী রাখবে। সিজদারত অবস্থায় উপরোক্ত শরীরের ঐ আট অংশ বিনা কারণে বা ওজরে নাড়া ছাড়া করতে পারবেনা। সার কথা এই যে, ঐ আট অংশ নামাযের বন্দেগীর নিয়তে মাটিতে/জায়নামাযে প্রতিস্থাপন করাকে 'সিজদা' বলা হয়।

সিজদারত অবস্থায় উভয় পায়ের সমস্ত আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগাবে। ও আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো ক্বিবলার দিকে রাখবে। আর নাক ও কপাল মাটিতে লাগাবে। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর লাগিয়ে রেখে দু'হাত দু'কানের বরাবর করে এমনভাবে মাটিতে রাখবে যেন বুক, পেট ও উরু মাটি থেকে পৃথক থাকে। আর আঙ্গুলের মাথাগুলো ক্বিবলার দিকে থাকে। মেয়ে লোকেরা উভয় পা এক সাথে একত্রিত করে ডান দিকে বের করে রাখবে এবং হাত ওই নিয়মে: তবে বুক ও পেট উরুর সাথে লাগিয়ে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে। উপরোক্ত মসনুন তরিকায় সিজদা করলে নাক ও কপালে শরিরের ওজনও কালোদাগ পড়বেনা এবং আচড় বা ঘসাও লাগবেনা।

নামায আদায়ের কতিপয় মাসায়েলঃ

- সিজ্‌দায় তাস্‌বীহ্ আদায় করার পর ডান পা সিজদারত অবস্থায় যেভাবে ক্বিবলামুখি ছিল পায়ের আঙ্গুল সমূহ ও সে অবস্থায় বহাল রেখে বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর সোজা হয়ে বসে যাবে তবে বাম পায়ের একটা আঙ্গুল তর্জনী হলেও ক্বিবলার দিকে রাখতে হবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'জলসাহ্' বলা হয়।
- এমতাবস্থায় হাত হাঁটুর উপর রাখবে। হাতের আঙ্গুল নিজ অবস্থায় ও আঙ্গুলের মাথা ক্বিবলামুখী থাকবে। 'তাশাহ্‌হুদ' পাঠ করার সময়ও ঠিক এই নিয়মে বসবে। ওই বসাকে 'ক্বা' দাহ্' বলা হয় এই পদ্ধতি শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য।

মেয়ে লোকেরা জাল্‌সায় ও ক্বা'দায় উভয় পা সিজদাবস্থায় বহাল রেখে পাছার উপর বসবে।

সিজদা আদায় করার পর মাটিতে ভর না করে শরীরের উপর ভর করে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, বসবে না। ক্বাউমার পর সুরা ক্বিরাত, রুকু যথানিয়মে আদায় তেলাওয়াত করে সিজদায় যাবার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক ও সর্বশেষে কপাল মাটিতে লাগাবে। সিজদা থেকে পরবর্তী রাক্‌আতের জন্য উঠার সময় তার বিপরতি: অর্থাৎ প্রথমে কপাল তারপর নাক, তারপর হাত পরিশেষে হাঁটুদ্বয় উঠাবে। এ নিয়মে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্'আত শেষ করতঃ আখেরী রাক্'আতে তাশাহ্‌হুদ, দুরূদ ও দো'আএ মা'সূরা পাঠ করে 'সালাম' ফেরাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এখানে অতীব দুঃখের সাথে পাঠক সমাজের অবগতির জন্য বলতে হচ্ছে যে, আমাদে দেশের সরলমনা মানুষেরা মনে করেন যে, অতিরিক্ত নামায পড়লে তার কপালে দাগ পড়ে যায় এবং এটাই নামাযীর চিহ্ন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আসল কথা হচ্ছে যারা সিজদা করতে জানেন না অথবা সিজদায় গিয়ে কপাল ঘসে মাটির সাথে, ঐ কারণে তাদের কপালে এ রকম দাগ পড়ে যায়। সাধারণতঃ কওমী ওহাবী-দেওবন্দী তাবলিগী আক্বীদার লোকদের মধ্যে এ ধরণের প্রবণতা (চিহ্ন) বেশি পরিলক্ষিত। সুতরাং সুন্নাত সম্মতভাবে সিজদা আদায় করার উপরোক্ত পদ্ধতি শিক্ষা অনুসরণ ও অনুশীলন করাই হবে এ ক্ষেত্রে অত্যন্তফলদায়ক।

সেজদায় পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা ও জায়নামাযে প্রতিস্থাপন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

প্রকাশ থাকে যে, পায়ের দশ আঙ্গুল হতে যে কোন একটি আঙ্গুল জমিনে/জায়নামাযে প্রতিস্থাপিত রাখা (সেজদারত বা নামাযরত অবস্থায়) ফরয বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব দুররে মুখতারে বলা হয়েছে, وَوَضْعُ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَرْطٌ অর্থাৎ "উভয় পায়ের অন্তত একটা আঙ্গুল মাটিতে স্থির রাখা ফরয"১০৩। এছাড়া দশ আঙ্গুলের পেট সেজদারত অবস্থায় মাটিতে প্রতিস্থাপিত রাখা এবং কিবলার দিকে রাখা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং না রাখা মাকরুহ। (রদ্দুল মোখতার, দুররে মোখতার)। এভাবে দু'পায়ে তিন তিনটি আঙ্গুলের পেট জায়নামাযে প্রতিস্থাপন এবং ক্বিবলার দিকে রাখা ওয়াজিব। অতএব নামাযরত থেকে সিজদায় গিয়ে পা নিয়ে খেলা করা বা মোটকা পোটানো নাজায়েজ ও অবৈধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

'ক্বিয়ামের' অবস্থায় সিজদার জায়গার দিকে, 'রুকুতে' উভয় পায়ের পাতার দিকে, 'ক্বাউমা'র অবস্থায় বুকের দিকে, 'সিজদাতে' নাকের অগ্রভাগের দিকে, 'জালসা' ও 'ক্বা'দায়' কোলের দিকে, 'সালাম' ফেরানোর সময় ডান স্কন্ধ ও বাম স্কন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখবে। অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাবে না।

১০৩. দুররে মুখতার-১/৪৪৭।

নামাযান্তে দোয়া মুনাজাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :

বেশ পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক বিপথে চালিত ওলামা লামাযহাবী কওমি ওহাবী জামাতি দেওবন্দি আক্বিদাপোষণ কারিরা নামাযের পরে মুনাজাতের বিরোধিতা করেন। এবং নিজেরাও করেনা অনুসারিদেরও মুনাজাত করা থেকে বিরত রাখেন এবং মুনাজাত কারীদের গাল মন্দ করেন এবং অজ্ঞতাবশতঃ কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি কাজ বলে নামাযান্তে মুনাজাত অবৈধ বলেন। তাই আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদাপোষণকারী আলেম, পাবলিক, সর্বসাধারণ, মুসলমানদের খেদমতে জানাতে চাই যে, নামাযান্তে মুনাজাতের বিধান কুরআন সুন্নাহ্ ও শরীয়ত সম্মত। বিরোধিদের বক্তব্য সত্যের অপলাপ ও সৎকর্মে বাধা দেয়ারই সামিল। নামায শেষে দোয়া করার অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ তো باب ما يقول الرجل إذا سلم বা 'নামায শেষে কি দোয়া করবে' এভাবে একটি অধ্যায়ও লিখেছেন। সে অধ্যায়ের একটি হাদীস হল-

عن علي بن أبي طالبٍ قال: كان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إذا سَلَّمَ مِن الصَّلاة قال: "اللَّهُمَّ اغفر لي ما قَدَمتُ وما أخرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ، وما أنتَ أعلمُ به مني، أنت المُقدِّم والمُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت"

অর্থাৎ "হযরত আলী ইবনু আবি তালেব. রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন এ দোয়া করতেন,

"اللَّهُمَّ اغفر لي ما قَدَمتُ وما أخرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ، وما أنتَ أعلمُ به مني، أنت المُقدِّم والمُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার পূর্বাপরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল গোনাহ-খাতা ক্ষমা কর। আমি যা অন্যায় করেছি আমাকে ক্ষমা কর। তুমিই আমার চেয়ে ভাল জান। তুমিই আদি, তুমিই অন্ত। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই।" [১০৪]

তাই নামায শেষে দো'আ-মুনাজাতের সময় উভয় হাত এভাবে উঠাবে যেন হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাঁধের উপরে না উঠে। হাতের তালু আকাশের

১০৪. সুনানে আবু দাউদ-১৫০৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিকে থাকবে কিছুটা চেহারার দিকে থাকবে। উভয় হাতের মধ্যখানে সামান্যটুকু ফাঁক থাকবে। দো'আ-মুনাজাতের সময় আকাশের দিকে তাকাবে না। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»

অর্থাৎ- হযরত ওমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই দোআর জন্য হাত মুবারক উঠাতেন উভয় হাত মুবারক দ্বারা মুখমণ্ডল মসেহ করা ছাড়া নামাতেন না"[১০৫]।

জাম'আতে 'দো'আ' করার সময় উচ্চ স্বরে দো'আ করা ও শ্রোতাগণ 'আমীন' আমীন' বলা সুন্নাত। এতে সমস্ত শরিয়ত বেত্তাগণ একমত। চাই তা ফরয নামাযের পর বা সুন্নাত নফলের পরে হউক। অত্যন্ত আফসুসের বিষয় যে, আমাদের মাঝে সাধারণ লোক তো বটেই অনেক আলেমকেও দেখা যায় যে, তারা মুনাজাতের সময় হাত উঠালেও মুনাজাত অবস্থায় আঙ্গুলের মটকা ফুটায় বা হিন্দুদের"নমস্তে" ও উপাসনার আদলে দুই হাতকে মিলিয়ে মিনতি জানায় যা সুন্নাতের বরখেলাফ ও অবশ্য পরিত্যাজ্য।

নফল নামায অবশ্য সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে বসে পড়া জায়েয। তবে এতে সওয়াব কম পাবে। হ্যাঁ, বিত্‌র নামাযের পর 'শাফে-উল-বিত্‌র'-এর নামায বসে পড়া উত্তম। এতে সওয়াবও পূর্ণ পাওয়া যাবে বলে শরীয়ত বেত্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর নিম্নোক্ত হাদীস প্রণিধানযোগ্য:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ"

অর্থাৎ "হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতির নামাযের পর দু'রাকআত নফল নামায হালকাভাবে বসে বসে আদায় করতেন।[১০৬]

[১০৫]. জামে' তিরমিযী-৩৩৮৬, মুসনাদে বায্যার-১২৯, মু'জামে আওসাত-৭০৫৩, মুসতাদরাকে হাকেম-১৯৬৭, শরহুস সুন্নাহ-১৪০০।

[১০৬]. সুনানু ইবনু মাজাহ-১১৯৫, জামে' তিরমিযী-৪৭১, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৪৮২২, মুনিয়াতুল মুসল্লী-৩১৩।

নামায বসে বসে আদায় করলে, তাশাহ্হুদের বৈঠকের মতই বসবে। রুকুতে পাছাদ্বয় পায়ের উপর থেকে উঠাবে না। তবে এতটুকু মাথা ঝুঁকাবে যেন হাঁটুর বরাবর অপেক্ষা বেশী না ঝুঁকে।

বিতিরের নামাযের বয়ান:

বিতিরের নামায তিন রাকাত এবং উহা মুক্বীম মুসাফির সকলের উপর ওয়াজিব। কোন কারণে তা আদায় করতে না পারলে ক্বাযা দিতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, ওজর বশতঃ মৃত ব্যক্তির কাযা নামায এর কাফফারা আদায়ের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথে বিতির নামাযকেও এক ওয়াক্ত হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেহ ৬ ওয়াক্ত নামায হিসাব করতে হবে।

উহার তিন রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে ক্বিরাআত পাঠ করা ফরয। তৃতীয় রাকাতে ক্বিরাআত শেষে তকবীর বলে তাকবিরে তাহ্‌রীমার মত কান পর্যন্তহাত উঠাবে। তারপর নামাযের মত নাভির নীচে হাত বেঁধে দো'আয়ে কুনুত পড়বে। দো'আয়ে কুনুত পড়া ওয়াজিব। দো'আ কুনুত ইমাম, মুক্তাদী প্রত্যেকে নীরবে পড়বে। বিতির নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে দো'আ কুনুত পড়বে না।

❖ হ্যাঁ কোন মারাত্মক বিপদের সময় "কুনুতে নাজেলা" পড়তে পারে। তাও রুকুর আগে পড়বে[১০৭]।

কুনুতে নাযেলার বিবরণ

কুনুত দুই ধরণের রয়েছে। একটি হলো সবসময় নামাযের মধ্যকার দোয়া হিসাবে পড়া, যাকে কুনুতে রাতেবা বলা হয়। আর অপর হলো কখনো কখনো প্রচণ্ড বিপদ মহামারি ও ব্যপক দুর্যোগকালে নামাযে একধরনের কুনুত পড়া, যাকে কুনুতে নাযেলা বলা হয়। এই দু ধরনের কুনুতের ব্যাপারে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় সবসময় নামাযের মধ্যকার দোয়া হিসাবে ফজরের নামাজে আর রমজান মাসের শেষ অর্ধেকে বিতির নামাজে কুনুতে রাতেবা পড়া হবে। আর প্রচন্ড দুর্যোগ কালে পাঁচ

[১০৭]. দুররে মুখতার-২/৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়াক্ত নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়া হবে। আবার দুর্যোগ শেষ হয়ে গেলে তা বর্জন করে দিবে। [১০৮]

পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কিরাম বলেন, নামাজের অযিফা হিসাবে শুধু বিতির নামাজে বৎসরের সব সময়-ই কুনুতে রাতেবা পড়বে। অন্য কোন নামাজে নয়। আর প্রচন্ড দুর্যোগকালে শুধু ফজরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়বে অন্য কোন নামাজে নয়।

আমাদের মাযহাবে যে ফজরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়ার অনুমোদন রয়েছে তার প্রমাণ হল হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলোর বর্ণনা। তা হচ্ছে :

১. আল্লামা মোল্লা কারী হানাফী (রহঃ) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে লিখেন,

اذا طبق علمائنا علي جواز القنوت عند النازلة

অর্থাৎ, আমাদের (হানাফী) উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, প্রচন্ড বিপদের সময় কুনুতে নাজেলা পড়া জায়িয। [১০৯]

২. ফাতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে:

وَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ اهـ وَكَذَا مَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْبَنَانِيَّةِ: إذَا وَقَعَتْ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْغَايَةِ: قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: فَتَكُونُ شَرْعِيَّتُهُ: أَيْ شَرْعِيَّةُ الْقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ مُسْتَمِرَّةً، وَهُوَ مَحْمَلُ قُنُوتِ مَنْ قَنَتَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: إنَّمَا لَا يَقْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ

[১০৮]. কিতাবুল উম-/২০৫।

[১০৯]. মিরকাতুল মাফাতীহ-৩/১৭৮।

أَوْ بَلِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِلنَّوَازِلِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ إلَّا الشَّافِعِيُّ،

ফাতওয়ায়ে শামীর উল্লিখিত বক্তব্যের সারকথা হল ,হানাফী মাযহাবে প্রচণ্ড ও ব্যাপক বিপদ ও দুর্যোগ কালে ফজরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়ার অনুমোদন রয়েছে। তাই তো অনেক সাহাবী থেকে পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম তাহাবী (রহ.)-ও এই মত পোষণ করেছেন। [১১০]

৩. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লামেউদ্ দারারীতে উল্লেখ আছে:

و اما الثاني في اختلافهم في قنوت غير الوتر فعلم مما سبق انه مشروع عند الشافعية و المالكية في الفجر خاصة في جميع السنة و قنوت الفجر عند النازلة عند الحنفية و الحنابلة ..الخ.

و في اللامع: القنوت في الفجر في النازلة و لا حاجة الي القول بنسخه بل هو معمول عند النازلة فلا ينافي مذهبنا لورود شيئ من الروايات انه صلي الله عليه و سلم دام علي قنوت الفجر و تعد الركوع الي اخر ايام حياته لانا نقول كذالك اذا نزلب بالمسلمين نازلة... فمن اطلق النسخ و هو دوام الاستمرار في كل يوم بدون تخصيص بالنازلة – اللامع مع حاشيته

আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে,হানাফী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাবে ব্যাপক ও প্রচন্ড দুর্যোগ কালেই ফজরের নামাযে কুনুতে নাজেলা পড়ার অনুমতি রয়েছে। অন্য নামাজে নয়। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রহঃ) এর মতে সব সময়-ই ফজরের নামাজে কুনুত পড়া যবে। প্রচণ্ড দুর্যোগ কালে কুনুতে নাজেলা পড়ার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে আমাদের মাযহাবে। সুতরাং এটা রহিত হয়ে যাওয়ার কওল যথাযথ নয়। যারা রহি হওয়ার কথা বলেছেন,

[১১০]. ফাতওয়ায়ে শামী-২/১১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল দুর্যোগ ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় ফজরের নামাযে কুনুত পড়া রহিত হওয়া। [১১১]

৪. আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাজলুল মাজহুদে রয়েছে :

و هو صريح في ان قنوت النازلة عندنا بصلوة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرنة او السرية و مقاده ان قومهم بان القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ اصله كما نته عليه نوح الندي قوله في الكل ان هذا لم يقل به الا الشافعي و عزاه في البحر الي جمهور اهل الحديث فكان ينبغي عزوه اليهم لئلا يوهم انه قول في المذهب انتهي - و قال الطحطاوي في حاشية الدر المختار بعد نقل كلام صاحب البحر و الذي يظهر لي ان قوله في البحر و ان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلوة الجهر تحريف من النساخ و صوابه الفجر

অর্থাৎ আমাদের হানাফীদের মতে সাধারণত বিতির নামাযে আর প্রচণ্ড বিপদের সময় শুধুমাত্র ফজর নামাযে কুনুতে নাযেলা অনুমোদিত।[১১২]

৫. মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদের হাশিয়ায়ে উল্লেখ রয়েছে :

لا نزاع بين الائمة في مشروعية القنوت ولا في مشروعية النازلة انما النزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة

অর্থাৎ, দুর্যোগ কালে কুনুতে নাজেলা পড়া যাবে, এই ব্যাপারে ইমামদের কোন মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হল দুর্যোগ ছাড়াও (ফজরে) পড়া যাবে কি না - তাতে। [১১৩]

এমনি ভাবে ফাতহুল কাদীরে রয়েছে: [১১৪]

---

[১১১]. আল-লামেউদ দুরারী-২/৫৩।

[১১২]. বাযলুল মাজহূদ-২/৩৩৪।

[১১৩]. মারাকিউল ফালাহ-২০৬, নাসবুর রায়াহ-২/১৩৩, মাআরেফুস সুনান-২/১৭।

[১১৪]. ফাতহুল কাদীর-১/৩৭৯।

إن القنوت للنازلة مستمرة لم ينسخ و به قال جماعة من اهل الحديث و حملوا عليه حديث ابي جعفر عن انس ما زال يقنت حتي فارق الدنا اي عند النوازل و ما ذكرنا من حديث ابي مالك و ابي هريرة و انس و باقي اخبار الصحابة لا يعارضه بل انما تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر سوي حديث ابي حمزة حيث قال لم يقنت قبله ولا بعده و كذا حديث ابي حنيفة فيحب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهد او ذالك ان هذا الحديث لم يؤثر عنه من قوله ان لا قنوت في؟ نازلة بعده هذه بل لمجرد العدم بعدها يستدعي القنوت فتكون شرعيته مستمرة و هو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته صـ و بان يظن رفع الشرعية نظرا الي سبب تركه صـ هو انه لما نزل قوله تعالي- ليس لك من الامر شيئ – ترك – و الله سبحانه اعلم

অনুরূপভাবে এলাউস সুনানে রয়েছে:

ان قنوت النوازل لم ينسخ بل هو مشروع اذا نزل بالمسلمين نازلة ان يقنت الامام في الفجر

অর্থাৎ, কুনুতে নাজেলা রহিত হয়নি বরং তা এখনো বহাল রয়েছে। মুসলমানদের দুর্যোগ কালে ফজরের নামাজে ইমাম কুনুত পড়বে। [১১৫]

এ সব কিতাবের আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, হানাফী মাযহাবে মুসলমানদের প্রচন্ড ব্যাপক দুর্যোগ কালে কুনুতে নাযেলা পড়ার অনুমতি রয়েছে। তাও কেবলমাত্র ফজরের নামাযে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, লা-মাযহাবীরা মনগড়াভাবে সারা বছর কুনুতে নাযেলা পড়ে থাকে। যার শরয়ী কোন ভিত্তি নেই।

---

[১১৫]. ই'লাউস সুনান-৬/৮১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হারামাইন শরীফাইনে বিতির নামায সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

সুপ্রিয় পাঠক সমাজকে পবিত্র রমজানুল করীমের বিতির নামায জামাত সহকারে আদায় সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করছি যে, প্রথমতঃ এই গ্রন্থখানা আমাদের হানাফী মাযহাবের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং মাসআলাগুলো হানাফী মাযহাব অনুসারীদের জন্য। কিন্তু হানাফী মাযহাব ছাড়াও আরো তিনটি বরহক মাযহাব রয়েছে। সেগুলোও বরহক বৈধ ও ইসলামী শরীয়ত স্বীকৃত মাযহাব। যদিও পৃথিবী জুড়ে হানাফী মাযহাব অনুসারী বেশী। কিন্তু কোন কোন জায়গায় ওই তিন মাযহাবের সংখ্যাধিক্যও রয়েছে। যেমন পবিত্র হারমাইন শরীফাইনে ও আরব গালফে। তাই এই সকল স্থানে ঐ তিন মাযহাবের কোন এক মাযহাবের অনুসারী ইমামের পিছনে আপনি ইক্তেদা করলে সওয়াব (শুধুমাত্র সালাতে ইশার পর তিন রাকাত বিতির নামাযের ক্ষেত্রে) পাবেন, কিন্তু আপনার উপর হওয়া ওয়াজিব আদায় হিসাবে গণ্য হবে না।

অতএব, জামাত শেষে আপনি পুনঃরায় ঐ ওয়াজিব সালাতে বিতর গাইরে জামাতে (একা) আদায় করতে হবে। যেমনটি করবেন না অন্যান্য নামায গুলোর মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন: অন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আপনি তাঁদের পিছনে ইক্তেদা (জামাত সহকারে) করতে পারবেন; এবং আপনার নামাযও শুদ্ধ হবে দুহরাতেও হবে না। তবে শুধুমাত্র সালাতে আসর তাদের ঐ সময়ে আমাদের হানাফী মাযহাব মতে ওয়াক্ত না হওয়ার কারণে আযান এবং নামায কিছুই শুদ্ধ হবেনা।

ফলে সালাতে আসর তাদের পেছনে ইকতেদা করলে নফল হিসেবে সওয়াব পাওয়া যাবে বটে, তবে সালাতে আসরের ফরযিয়ত আপনার যিম্মায় থেকে যাবে। যা ওয়াক্ত হলে আপনাকে একাকি আদায় করতে হবে। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আপনি করবেন না। যেহেতু আপনি হানাফী মুসল্লী। যেমনটি ধরেন- নামাযে সুরা ফাতেহা তিলাওয়াতের পর "আমিন" বড় করে পড়বেন-না, রুকু সেজদায় যাওয়ার তাকবীরে আপনি তাকবিরে তাহরিমার মত হাত উঠাবেন না; সালাতে ঈদাইনে ১ম রাকাতে অতিরিক্ত ৩ তাকবিরে হাত উঠাবেন এবং ২য় রাকাতে অতিরিক্ত ৩ তাকবিরে হাত উঠাবেন বাকী তাকবির গুলোতে হাত উঠাবেন না। এ দ্বারা আপনার নামায শুদ্ধ ও আদায় হয়ে যাবে। পূনরায় আর পড়তে হবে না। মনে রাখতে হবে শুধু মাত্র রমযানের বিতরের নামাযই পুনরায় আদায় করতে হবে; এবং আপনি হানাফী হয়েও অন্য তিন

- যদি দোয়ায়ে কুনুত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকুতে গিয়ে স্মরণ হয়, তবে না রুকুতে পড়বে, না দাঁড়িয়ে পড়বে বরং নামায শেষে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে।
- বিতিরের নামায শুধু রমজান মাসে জমাআতে পড়া মোস্তাহাব ও উত্তম, অন্য মাসে/সময়ে জমাআতে পড়া মাকরূহ।
- প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র রমজান মাসে ইশার নামায কেউ জামাত সহকারে না পেলে একা সালাতে ইশা আদায় করতঃ বিতির নামাযের জামাতে শামিল হতে পারবে।
- তাছাড়া মুসল্লি সালাতে তারাবিহ্ পূরোটা আদায় না হলেও বিতির জামাত সহকারে আদায় করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, রমজান গাইরে রমজান যে কোন সময় সালাতুল বিতির আদায়ের পর যে কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়া বৈধ ।
- বিতিরের নামাযের সালাম ফিরাবার সঙ্গে সঙ্গে সুবহানাল মালেকিল কুদ্দুস, তিনবার পড়বে শেষবারে প্রথম দু'বার অপেক্ষা কিছুটা শব্দ করে টেনে পড়বে।
- বিতিরের নামাযের পর বসে দু'রাকাত নফল নামায পড়া (শাফেউল বিতির) মুস্তাহাব। [১১৬]
- বিতিরের নামায শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী মাজহাবের ইমামের পিছনে পড়তে পারা যায় যদি দ্বিতীয় রাকাতের পর সালাম না ফেরায়, নতুবা নয়। ওই অবস্থায় কুনূত ইমামের সঙ্গে পড়বে। অর্থাৎ তৃতীয় রাকাতের রুকু হতে দাঁড়ায়ে যখন ওই তিন মাযহাবের অনুসারী কোন ইমাম কুনুত পড়ে যেমন কোন হানাফী মুক্তাদী; শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের এক্তেদা করে এবং সে আপন মাযহাব অনুযায়ী কুনুত পড়ে; তখন হানাফী মাযহাবের মুক্তাদী কুনুত পড়বে না, বরং হাত বেধে নিরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। (দোররে মোখতার)

[১১৬] . আল-হুজ্জাত্ আলা আহলিল মদীনাহ লিল-ইমাম মুহাম্মদ-১/১৯৬, ইনায়া-২/৫৪১, তাহতাভী-১/৪০৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযহাবের অনুসারী ইমামের পিছনে ইকতেদা করা বৈধ ও শরীয়তে ইসলামী কর্তৃক অনুমোদিত।

আলহামদু লিল্লাহ্! আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সকল মসজিদেই হানাফী মাযহাব অনুসারী ইমাম ও সকল মুসলিমই হানাফী ধর্মমতে বিশ্বাসী। তাই বিশেষ করে উপরোক্ত মাসয়ালা দেশের বাইরে স্ববিশেষভাবে হারামাইন শরীফাইনে জিয়ারত নসিব হলে উপরোক্ত মাসয়ালা গুলো খেয়াল রাখবেন।

আযান অধ্যায়

মাইকযোগে আযান ও একামতের বয়ানঃ

২য় হিজরী হতে আযানের প্রথা শুরু হয়। আযান সুন্নাতে মাওয়াক্কাদা-এ-ওয়াজেবা এবং মুসলমানের জাতীয় প্রতিক। মোয়াজ্জিন অবশ্যই আকেল, বাগেল ও মুসলমান হতে হবে। সুতরাং নাবালেগ ও পাগলের আযান মাকরূহ। এবং অমুসলিম ও বদ আক্বীদার অনুসারির আযান মোটেই দোরস্ত হবে না। আযান স্পষ্ট ও উচ্চস্বরে দেয়া সুন্নাত এবং শরীয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সুতরাং মাইকের মাধ্যমে আযান দেয়া উত্তম।

অতএব, কুরআন, হাদীস, এজমা, কেয়াস শরীয়তের চার মূল ভিত্তির আলোকে বা সুষ্ঠ যুক্তিতে অবৈধ, নাজায়েয, হারাম বা শিরিক হওয়ার কোন কারণ নেই। বৈদ্যুতিক মাইকের আগুনে আযান জ্বলে যায় মন্তব্য এক শ্রেণীর সমাজে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী ওলামাদের উক্তি দম্ভ পাগলামী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও হাস্যকর। কারণ মাইকের দ্বারা আযান জ্বলে না; বরং সুস্পষ্ট ও বড় হয়ে দূর পর্যন্ত পৌছে। আগুন নূরকে জ্বালাতে পারে না। আগুনের শক্তির চেয়ে নূরের শক্তি কোটি কোটি গুণ বেশী।

যারা এ সমস্ত অসার যুক্তি দিয়ে মাইকে আযান দেয়াকে অবৈধ বলে ফতওয়া দিয়ে সরলমনা মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করে তারা কিন্তু চোখে চশমা দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং ফতওয়া দেয়। আওয়াজ শোনার সুবিধার জন্য মাইকের ব্যবহারকে তারা হারাম বললেও দেখার সুবিধার জন্য চশমার ব্যবহারকে অবৈধ বলতে শোনা যায়না। অথচ উভয়টাই বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

অতএব, ইবাদত-বন্দেগী, তেলাওয়াতে কুরআন আযীম এর ক্ষেত্রে মাইক ব্যবহার হারাম বলে যারা ফতওয়া দেয় তারা রাফেযী সম্প্রদায়ভুক্ত বরং আরো নিকৃষ্ট। কেননা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করা

কুফরির নামান্তর। এ সমস্ত লোকদের পেছনে নামায পড়লে নামাযই শুদ্ধ হবেনা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আযান, ইকামত শবীনা খতমের কুরআন তিলাওয়াত এবং বড় জামাআত যথা জুমআ, ঈদাইন ও সালাতুল জানাযায় উপস্থিত সকল মুসল্লীদেরকে শোনানোর সুবিধার্থে মাইক ব্যবহার করা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। আর রাফেযী সম্প্রদায়ের প্রথম আক্বীদাই হল জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা।

- বিনা অজুতে আযান দেওয়া মাকরূহ। এতে আযান হয়ে যায়, কিন্তু মোয়াজ্জিন সাওয়াব পাবে না।
- মোয়াজ্জিনঃ আযানের সময় দুই কানের ভিতর শাহাদাত আঙ্গুল দেয়া সুন্নত।
- এছাড়া প্রত্যেক বড় জামাতের জন্য নামাযে মাইকের ব্যবস্থা থাকলেও মুকাব্বির রাখা সুন্নাতে মুতাওয়ারেসা, শুধু মাইকের উপর নির্ভর করা মাকরূহ। অর্থাৎ ইমাম, মুকাব্বির উভয়; মাইক ব্যবহার করতে হবে, অন্যথায় সুন্নাতের খিলাপ। কেননা শুধু ইমাম মাইক ব্যবহার করে মুকাববির না রাখা মানে একটি স্বীকৃত সুন্নাত অস্থিত্বহীন বা বিলীন করে দেয়া। তার জন্য ইমাম-মসজিদ কর্তৃপক্ষও গুনাহগার হবেন।
- 'হাইয়ালাতাইন', অর্থাৎ 'হাইয়া আলাস্সালাহ্' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় চেহারা (মুখ মন্ডল) ডান ও বাম দিকে ফেরাবে, তবে ওই সময় সিনা (বক্ষ) কেবলা হতে পরিপূর্ণ ফিরায়ে ফেলা মাকরূহ।
- আযান মুসলমানের জাতীয় নিশান হিসাবে যে কোন মুসলমান আযান শুনতে পেলে নীরব হয়ে ভক্তি সহকারে শুনা, এবং মোয়াজ্জিনের আযানের শব্দ উচ্চারণের পর পর প্রতিউত্তর দেয়া অর্থাৎ পূর্ণ আযানের শব্দ মোয়াজ্জিনের মুখে শুনার পর শ্রবণকারী ও উক্ত শব্দ উচ্চারণ করা সুন্নাত। শুধু حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ 'হাইয়া আল্লাস্ সালাহ্' ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'হাইয়া আলাল ফালাহ্' শুনে "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ লা হাওয়া ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্" বলবে এবং ফযরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'আস্সালাতু খাইরুম্ মিনান-নাওম' এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ 'সাদাক্তা ওয়া বারারতা ওয়া বিল্হাক্কে নাতাক্তা' বলবে।

সুদক্ষ, ধর্ম বিশারদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের নির্ভুল, বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন হক্কানী রব্বানী আলেমদের মতে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ এর উত্তরে ("মোহাম্মদ" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শব্দ শুনা মাত্র উভয় হাতের তর্জনীঙ্গুলির নখ একত্রিত করে চুম্বন করতঃ উভয় চক্ষুতে মসেহ করবে। প্রথম বার চুম্বন করতে, قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ কুররাতু আইনী বেকা এয়া রাসূলাল্লাহ্ ও দ্বিতীয় বার চুম্বন করতে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللهِ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইকা ওয়া সাল্লামা এয়া রাসূলাল্লাহ্ বলবে। এবং দুইবার চক্ষুতে মসেহ করার সময় اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ "আল্লাহুম্মা মাত্তেয়নী বিস্সাময়ে ওয়াল বাসারে" পড়বে।

উল্লেখ থাকে যে বর্তমানে আমাদের দেশে রেডিও, টেলিভিশনে যে আযান প্রচার করা হয় তার উত্তর দিতে হবেনা। শরীয়ত মতে আযানের উত্তর দেয়ার জন্য যে সমস্ত শরায়েত (বিধি বিধান) রয়েছে উক্ত প্রচার মাধ্যম দু'টুতে তা অনুপস্থিত। অতএব, আবশ্যকভাবে উত্তর দেয়ার বিধান নেই। যেমনিভাবে ওই প্রচার মাধ্যমে দূরের তেলাওয়াতে ক্বোরআনে পাকের, আয়াতে সিজদা তেলাওয়াত এর প্রেক্ষিতে সেজদা ওয়াজিব নহে। এর বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-তফসীরে রূহুল বয়ান, তফসীরে জালালাইনের হাশীয়া, তাহ্তাবী আলা মারাকিয়িল ফালাহ, ফতোয়ায়ে শামী, সীরতে হালবীয়া, মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে আব্দুল হাই লাকনুভী ইত্যাদি)।

আযানে "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" শুনে আঙ্গুল চুম্বন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য:

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক শুনে দুরুদ পাঠসহকারে তকবীলে ইব্হমাইন বা আঙ্গুলে চুম্বন অতঃপর চোখে ও কানে মস্হে (শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল চুম্বন) করা অত্যাধিক বরকতময়। এছাড়া ইসলামী সোনালী যুগেসহ সকল ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ উক্ত ফজিলতময়

আমল নিজেরা ও করেছেন এবং সকল মুমিন মুসলমানগণ উক্ত আমল করা সমীচিন ও উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম শুনে দরুদ সালাম "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" পড়েনা তাকে রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম "বখিল" (কৃপন) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ হিদায়ত দান করুন। আমিন।

আযান শেষ হওয়ার পর মোয়াজ্জিন ও শ্রবণকারী প্রথমে কলেমা শাহাদত:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ــــ

উচ্চারণ: আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অতঃপর দুরূদ শরীফ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَّ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সৈয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদীন ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম

অথবা যে কোন দরূদ পাক পড়া যায়। এর পর হাত উঠায়ে এই দো'আ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مُقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ وَ ارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্দাওয়াতিত তা-ম্মা, ওয়াস্ সালাতিল কায়িমাহ, আ-তি সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাতা ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'য়াতা, ওয়াব আসহু মাক্বা-মাম মাহমুদানিল লাযী ওয়াদতাহু, ওয়ারযুক্না শাফা'য়াতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ্. ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'য়াদ. বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

হাদীস শরীফে এসেছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقُلْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَسَلْ تُعْطَ»

অর্থাৎ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুয়াযযিনগণ মর্যাদায় আমাদের উপরে চলে যাচ্ছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আযানের সময় মুয়াযযিন যা যা বলে তুমিও তা তা বলবে, অতপর তা শেষ হলে তুমি দোয়া করলে তোমার দোয়া কবুল হবে।" [১১৭]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ"

অর্থাৎ "হযরত সা'আদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে এ দোয়া পড়বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। দোয়াটি হল:

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا . وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا [১১৮]

এটাই সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও আমল। তার বিপরীত আযানের পরে দুরূদ না পড়ে আযানের পূর্বে শুধু মোয়াজ্জিন সালাত ও সালাম পড়া, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ, আমল এর বিরুদ্ধাচারণ বৈ আর কি?

[১১৭]. সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-১৯৩৬, মুসনাদে আহমদ-৬৬০১, সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ী-৯৭৮৯।

[১১৮]. সহীহ মুসলিম-৩৮৬, সুনান আবু দাউদ-৫২৫, জামে' তিরমিযী-২১০।

নামায ঈমানের পরিচয়, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফরমায়েছেন, প্রত্যেক কিছুর চিহ্ন আছে, ঈমানের চিহ্ন নামায। আরও এরশাদ হয়েছে, মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নামায। নামায ফরয হওয়ার 'সবব' বা কারণ 'ওয়াক্ত"। ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায ফরয হয় না। সুতরাং ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে আযান ও হয় না। একারণে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ফরমায়েছেন, নামায ঈমানদারের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে জড়িত ও ফরয। তাছাড়া মুয়াজ্জিনের আযানের পর দুরূদ সালাম না পড়া; এবং হাত উঠায়ে দো'আ না করা, মুখে হাত মাসেহ্ না করা; এ সব আচরণ সুন্নাহ্, ফিকাহ্ শাস্ত্র বিরোধী কর্ম, সজ্ঞানে না পড়া ও না করা শরিয়ত পরিপন্থি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে উল্লেখিত দো'আ আযানের পরে পড়া হলেও তার মধ্যে রাসূলের সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফায়াত পাবার কামনার অংশ যেমন বাদ দিয়ে পড়ে, তেমনিভাবে দুরূদ সালাম ও পড়েনা; এগুলো কপট-মুর্খতা, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্বেষের সামিল। এছাড়া আযানের আগে সালাত সালাম দেয়ার নতুন প্রথাটা নিচক গোঁড়ামি, শরিয়ত নিয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ হেদায়ত করুক।

সরওয়ারে কাইনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযানের প্রথা চালু করার পিছনে কারণও এইযে, ইসলামের প্রথম যুগে যখন মুসলমানের সংখ্যাও কম ছিল এবং সকল মুসলমানদেরই রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে কাছে বসবাস বা অবস্থান ছিল, এবং নামাযের সময়ের আগে (মুসলিম সংখ্যা স্বল্পতার কারণে) তাঁরা এসে মসজিদে হাজির হয়ে থাকত। কিন্তু যখন ২য় হিজরীতে এসে মুসলমানের সংখ্যাও বেড়ে গেল, দুরদূরান্তেতাঁরা বসতি স্থাপন করতে লাগল, অপরদিকে মদীনাবাসী সাহাবা (রা.) খেজুর বাগানের কাজে, ও মক্কাবাসী সাহাবারা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে কর্মে ব্যস্ততায় প্রবৃত্ত হয়ে গেল। অনেক সময় সঠিক ও নির্দিষ্ট সময়ে নামাযের জমাআতে হাজির হতে অসুবিধা দেখা দিল। এমতাবস্থায় নামায ও জমাআতের সুনির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে অবগত করিয়েয় দেয়ার জন্যে আযানের এই সুন্দর প্রথা শরীয়ত প্রণেতা রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তন করলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ আযান দ্বারা একদিকে নামায ও জমাআতের সময় সম্পর্কে অবগত করান হয়, অপরদিকে আযানের আওয়াজ শয়তানের জন্য বড় অপছন্দ, আগুণের গোলার চেয়েও ভয়াবহ ভয়ংকর হয়, যদ্দুর আওয়াজ পৌছে তথা হতে শয়তান দ্রুত বেগে পালিয়ে যায়, সুতরাং অতদূর এলাকা হতে গজব ও বালা মুসিবত সরে যায়, এবং রহমত ও বরকত বর্ষিত হয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সৈয়দুনা হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আযানের আদেশে এরশাদ করতেন। "আরেহ্নি এয়া বেলাল" অর্থাৎ 'আযানের শব্দ উচ্চারণ করে আমার অন্তরের শান্তির ব্যবস্থা কর'। বুঝা গেল আজানের দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র অন্তরে তথা ঈমানদারের অন্তরে শান্তিও খুশীর সৃষ্টি হয়।

আযান "শেয়ারে ইসলাম" অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানের জাতীয় পরিচয়। সেজন্য কোন দেশের মুসলমান যদি আযান বন্ধ করে, অস্বীকার করে তাদের সাথে জেহাদ করা ওয়াজীব।

রাহ্মাতে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের (রা.) নিয়ম ছিল কোন জেহাদে মোজাহেদীনকে পাঠানোর সময় সেনাপতিকে এই মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, হঠাৎ গিয়ে যেন আক্রমন না করে; বরং অপেক্ষা করে দেখেন ওই এলাকায় আযান হচ্ছে কিনা। যদি আযানের শব্দ শুনা যায় ওই অঞ্চলের বাসিন্দাকে মুসলমান মনে করবে এবং আক্রমন করবে না। সহীহ্ রেওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত যে, তুফান, ভূমিকম্পন, কলেরা, মহামারি, জ্বীনের উপদ্রব ইত্যাদি গজব হতে রক্ষা পাবার জন্য উচ্চস্বরে আযান দিলে ফল পাওয়ার আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ্।

সিহাহ সিত্তার রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত সৈয়্যদুনা ফারূকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উচ্চস্বরে আযান না দেওয়ার কারণে একজন মোয়াজ্জিনকে পদচ্যুত করেছিলেন। আযানের শব্দ বড় হওয়ার জন্য কানের ভিতর শাহাদাত আঙ্গুল ঢুকানোর হুকুম। শব্দ বড় হয়ে দূরে পর্যন্তপৌছার জন্য 'মিনারা' বা আযান খানার উপর দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার আদেশ। তারপরও 'হাইয়া আলাস্সালাহ্.", 'হাইয়া আলাল ফালাহ্'-এর সময় ডানদিকে ও বামদিকে ফিরবার নিদের্শ। মক্কা, মদীনা, ইরাক, মিশর, শাম, বোখারা ইত্যাদি শহরের বড় বড় মসজিদে মিনারার উপরে মসজিদের ছাদে, উপরে ও নিচে একের পর এক অনেকক্ষণ পর্যন্তআযান দেয়ার প্রথা ছিল; মাইক যন্ত্র বের

হওয়ার আগে। স্বচক্ষে হারামাইন শরীফাইনও এবং আমাদের চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদে আমি নিজে দেখেছি।

মহা পরিতাপ ও বড় লজ্জার বিষয়; ইদানিং কিছু মুসলমান নামধারীর কানে ও অন্তরে (মাইকের) আযানের আওয়াজ বড় গজবে পরিণত হতে চলেছে; মূলতঃ তারা যে মুখুশ ধারী মুসলমান, বাস্তবে দ্বীন, ঈমান, ইসলাম ও মুসলমানের পরম ও চরম শত্রু তার প্রমাণ। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু মুসলমান সমাজের জনপদকে তাদের খপ্পর থেকে হেফাজত করুক।

একটি কথা জেনে রাখা চাই যে, আযান স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সফরের (ভ্রমন) সময় সালাতে জোহরের আযান দিয়েছিলেন। এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' এর স্থলে 'আশহাদু আন্নি মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" বলেছিলেন। যা 'আলা হযরত' ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর রচনায় 'দুররে মোখতার নামক' কেতাবও ইবনে হাজর মক্কির রেফারেন্সে উল্লেখিত কথাটা বর্ণনা করেছেন। (মেশকাতুল মাসাবীহ, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, উমদাতুলকারী, কিতাবুল আজকার, খাজিনাতুল আসরার, রেয়াজুচ্ছালেহীন, মাজালেসুল আবরার, আমালুল এয়াউমে ওয়াল্লায়লাহ, মাআরেফুস্সুনান ইত্যাদি)

তাছাড়া হুযুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়াদা দান করেছেন যে, আমি এবং উচ্চস্বরে আজান দানকারী ও আমার নাম শুনে সম্মানার্থে দরুদ সালাম পড়ে আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে কানে লাগায় ঐ ব্যক্তিদেরকে হাশরের মাঠে শাফায়াত করব, ময়দানে মাহাশর হতে তাকে টেনে জান্নাতে পৌছাব, তাকে খোঁজ করে বেহেশতীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেব। দ্বিতীয়ত, জীবদ্দশায় তার চক্ষু জ্যোতি নষ্ট হবে না।

আজানের গুরুত্ব না দিয়ে আযানের আওয়াজ কানে পৌছা সত্ত্বেও অবহেলা করে নীরব না থেকে দুনিয়াবী কথাবার্তা, গল্পগুজবে প্রবৃত্ত থাকা জঘন্য দোষ, তার মৃত্যুকালে ঈমান হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকে, আল্লাহ হিফাজত করুক আমিন। (দুররে মোখতার)

উল্লেখ্য শ্রোতাগণ আযান শুনে মুখে তার জবাব দেয়া সুন্নাত; এবং নামাযেও জমাআতে হাজির হয়ে আল্লাহ্র এই ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একামতে সালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য:

একামতের সময়ও উপস্থিত মুসল্লীগণ আযানের মত ভক্তি সহকারে ক্বিবলামুখী হয়ে বসে নিরবে জওয়াব দিবে, এবং শাহাদাতাইনের সময় তর্জনীঙ্গুলীদ্বয় ঠিক আযানের জবাবের মত চুম্বন করবে।

শুধু قَدْ قَامَتِ الصَّلَوٰةُ 'কাদ কামতিস্‌সালাত' এর উত্তরে اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা" বলবে।

একামত বলার সময় মোয়াজ্জিন এক জায়গায় কেবলামুখী দাঁড়িয়ে একামত দিবে। হাঁটা বা নড়াচড়া করবে না। ইমাম-খতিব ও মোকতাদীগণ বসা অবস্থায় একামত শুনবেন। حَيَّ عَلَى الصَّلَوٰةِ "হাইয়া আলাস্‌-সালাত" বলার সময় দাঁড়ানো শুরু করবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় সম্পুর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যাবে। এর আগে পরে দাঁড়ালে মাকরূহ হবে এবং সুন্নাতের খিলাফ।[১১৯]

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ»، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন ইক্বামত দেয়া হবে তোমরা আমাকে দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবেনা। প্রশান্তি ও স্থিরতা অবলম্বন করা তোমাদের উচিত।" [১২০]

প্রকাশ থাকে যে, প্রায় সকল মসজিদে কাতার সোজা করার জন্য রং ইত্যাদি দ্বারা লাইন এঁকে দেয়া সত্বেও বদ আক্বীদা পোষণকারী ইমাম-খতীবরা একাম'তের পরে 'কাতার সোজা কর', 'মোবাইল বন্ধ কর' এ জাতীয় খেলাফে সুন্নাত আমল আমাদের সমাজের প্রায় অর্ধেক মসজিদে চালু করে দিয়েছে। যদ্ধারা সাধারণ মুসলমানগণ গুনাহগার হচ্ছেন।

- নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দিলে; আযান শুদ্ধ হবে না। এমতাবস্থায় সময় হলে পুনঃরায় আযান দিতে হবে। [১২১]

[১১৯]. ফাতাওয়ায়ে শামী- ১/৫৭।
[১২০]. সহীহ বুখারী-
[১২১]. ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৫৩।

- মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া মাকরূহ। (তাহতাবী) তবে মাইকের ব্যবস্থা থাকলে ইমামের মেহরাবের ভিতরে দাঁড়িয়ে আযান দিলে, বাহিরে দেওয়ার হুকুম সাব্যস্থ হবে।
- জেনে রাখা আবশ্যক যে, اللهُ 'আল্লাহু' এবং اَكْبَرُ 'আকবর' শব্দদ্বয়ের اَلِفْ 'আলীফ' অক্ষরের উচ্চারণ বেশী দীর্ঘ করা এবং بَاء 'বা' অক্ষরের সাথে আলীফ যুক্ত করে উচ্চারণ দীর্ঘ করা হারাম। (শামী, আলমগীরি)। কারণ এর দ্বারা অর্থ বিকৃত হয়ে যায়।
- আযানের শব্দ কানে আসলে সমস্ত কাজ, এমনকি কুরআন তেলাওয়াত পর্যন্তবন্ধ রেখে আযানের জওয়াব দিতে হয়। (দুররে মোখতার)
- ❖ 'জুনুন'-অপবিত্রবস্থায়ও আযানের জাওয়াব দিতে পারা যায়।
- ❖ এছাড়া খোতবা শ্রবণ কালে বা প্রস্রাব, পায়খানায় বসে, বা স্ত্রী সহবাস অবস্থায় আযানের জাওয়াব দিবে না। হায়েয-নেফাস অবস্থায় জাওয়াব দেওয়া দুরস্থ আছে, তবে না দেওয়াই উত্তম। (বাহারে শরীয়ত)

জুমার খোতবার আজানেরও জওয়াব দিবে। এবং আযান শেষ হওয়ার পর হাত উঠায়ে দো'আ মুনাজাত করবে। কারণ ওই সময় খোতবা শুরু হয়নি, খোতবা আরম্ভ হওয়ার পর, কথাবার্তা বলা, নামায ও দো'আ, তাসবীহ্, তাহ্‌লীল পড়া সালাম দেয়া নেয়া নিষিদ্ধ। (সহীহ্ বোখারী শরীফ, ফয়জুল বারী, হেদায়া, বেনায়া, ছেয়ায়া, উমদাতুল রেয়ায়া, জাওহারাতুন নাইয়ারা ইত্যাদি)

সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাকে গোসল দিয়ে, তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত দেওয়া সুন্নাত। ভূমিকম্প হওয়ার সময়, অতি বৃষ্টি, তুফান, সাইক্লোন হওয়ার সময়, দেশে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী দেখা দিলে, জ্বিন পরীর উপদ্রব হলে, মুসাফেরীতে (দিশা হারায়ে) পথ হারালে ওই সব অবস্থায় আযান দেয়া মোস্তাহাব। এছাড়া, মাইয়েতের দাফনের পর কবরের পাশে আযান দেওয়া বিদআত বা ইসলামে নতুন আবিস্কার। বিষয়টি সহীহ্ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা নির্দেশ বা কোন ইমাম, মোজতাহিদ, মো'তামাদ আলাইহ ফকিহ্‌গণের রেওয়ায়েত বা আমল দ্বারা প্রমাণিত নেই। অতএব, দাফনের পর কবরে আযান দেয়া মানে মুসলিম সমাজে নতুন ফেতনা সৃষ্টি করা, যা অত্যন্ত মারাত্মক ও গর্হিত কাজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফনের পর কবরে আযান সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :

মুহ্তারাম পাঠক! দাফনে মইয়েতের পর "তালকীনে মইয়ত" বা কবর তালকীন করার বিষয়টি ইমাম মুজতাহিদ, মুতামিদ আলাইহি ফকিহ ও সালফে সালেহিন (রা.) দ্বারা কৃত আমল এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে এবং কবর তলকিনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানাযার নামায সম্পর্কিত অধ্যায়ে লিখেছি।

অতএব, যে এলাকার ইমাম খতিব আলেমের উল্লেখিত হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত তরিকা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, সে হয়ত বা কবরে আজান দিতে পারে। কিন্তু নতুন একটি পদ্ধতি প্রচলন না করে দাফনে মইয়তের পর ৪১ (একচল্লিশ) বার "সুরা মুলক" কবরের পাশে বসে পড়াই ঐ শ্রেণীর খতিবের জন্য অধিকতর উত্তম হবে বলে মনে করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সমাজকে নতুন ফিৎনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

দাফনের পর কবরে তালকীন করার বিধান

প্রকাশ থাকে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পরে কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করে দোয়া দরূদ পড়া ও মৃত ব্যক্তিকে তালকীন করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো প্রণিধানযোগ্য-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ"

অর্থাৎ হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে অবসর হলে কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন এবং সাহাবীগণকে বলতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা কামনা কর এবং দৃঢ়তার সাথে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার দোয়া কর। কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে।" [১২২]

[১২২] . সুনানে আবু দাউদ-৩২২১, মুসতাদরাকে হাকেম-১৩৭২।

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْ رَحِمَكَ اللهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلِ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ: «يَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، يَا فُلَانُ ابْنَ حَوَّاءَ»

অর্থাৎ "বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আউদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উমামাহ আল-বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন বললেন, আমার ইনতিকালের পর তোমরা আমরা সাথে সে রকম আচরণ করবে, যেরকম আচরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মৃত ব্যক্তিদের সাথে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, "যখন তোমাদের কোন ভাই ইনতিকাল করে এবং তার কবরে মাটি দিয়ে দিবে তখন তোমাদের একজন তার মাথার পাশে দাড়িয়ে বলবে, হে অমুক মায়ের ছেলে অমুক! তখন সে তা' শুনবে তবে কোন উত্তর দিবেনা। অতঃপর সে বলবে, হে অমুক মায়ের ছেলে অমুক! তখন সে উঠে বসবে। অতঃপর বলবে, হে অমুক মায়ের ছেলে অমুক! তখন সে বলবে, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, বলুন আপনি কি বলতে চান। তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমরা তা' অনুধাবন করতে পারবেনা। তখন বলবে, তুমি স্মরণ কর দুনিয়ায় যা বলতে, তুমি বল,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا

তখন মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয় পরস্পরের হাত ধরে বলবে. চল আমরা তালকীনের মাধ্যমে দৃঢ়তা দান করার ব্যক্তির কাছে গিয়ে বসবো। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে ব্যক্তির জন্য সহযোগী হবেন।" তখন একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি মৃত ব্যক্তির মায়েন নাম জানা না যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তখন মায়ের নামের পরিবর্তে হযরত হাওয়া (আলাইহাস সালাম) এর নাম উল্লেখ করে বলবে, হে হাওয়া (আলাইহাস সালাম) এর ছেলে অমুক!" [১২৩]

অপর হাদীসে এসেছে,

وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوا: إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ قُلْ: رَبِّيَ اللهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَنْصَرِفُ

অর্থাৎ "হযরত রাশেদ ইবনু সা'আদ, হযরত দ্বামারাহ ইবনু হাবীব ও হযরত হাকীম ইবনু ওমাইর (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেন, মইয়্যেতকে কবরে রাখার পর লোকজন চলে গেলে মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে ইহা বলাকে আসহাবে রাসূল রিদওয়াল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন খুবই পছন্দ করতেন, "হে অমুক! বল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ. আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তিনবার। হে অমুক! বল, রাব্বীয়াল্লাহু ওয়া দ্বীনিয়াল ইসলামু ওয়া নবীয়্যী মুহাম্মদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" অতঃপর ফিরে যাবে। [১২৪]

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ الجوهرة النيرة। বলা হয়েছে,

وَأَمَّا تَلْقِينُ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ فَمَشْرُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ

[১২৩]. আল-মু'জামুল কবীর লিত-ত্বাবারানী-৭৯৭৯. আদ-দোয়াও লিত-ত্বাবারানী-১২১৪।
[১২৪]. সুবুলুস সালাম-১/৫০১. নাইলুল আওত্বার-১৪৮৪।

অর্থাৎ কবরে মৃত ব্যক্তিকে তালক্বীন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের মতে অনুমোদিত। [১২৫]

উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মোল্লা-মুনশির আক্রমন থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই সুন্নাতও রেহাই পায়নি। তারা কবরে তালক্বীন করাকে বিদআত বলে থাকে। আবার আরেক শ্রেণীর মোল্লারা কবরে তালক্বীন করার এই সুন্নাতকে বাদ দিয়ে কবরে আযান দেয়ার কুপ্রথা চালু করেছে। তারা নাকি আযান দিয়ে কবর থেকে শয়তান তাড়ায়, অথচ আমরা জানি যে, কবরে শয়তান নয়, বরং মুনকার-নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয় আগমন করেন। তারা কি ফেরেশতাদ্বয়কে শয়তান মনে করছে? কবরে শয়তান ঢুকতে পারে বা মৃত ব্যক্তিকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে এমন উদ্ভট কথা তারা কোত্থেকে আবিষ্কার করে আমার বোধগম্য নয়। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়ত করুন।

- ❖ জুমার খোৎবা শেষ হওয়ার পর ইমাম ও মুক্তাদী বসা অবস্থায়ই প্রত্যেক জামাতে শরীক মুসল্লী নামাযের একামত শুনবে এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় দাঁড়াবে। [১২৬]
  একামত শেষ হওয়ার পর ইমাম কাতার সোজা করার কথা বলবে যেহেতু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা নামায কায়েম করারই নামান্তর"। [১২৭]
  অতঃপর ইমাম নামায শুরু করবেন।
- ❖ আমাদের দেশের কতিপয় ওহাবী ও মওদূদী গাইরে মুকাললিদ পন্থী ইমাম মসজিদে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে উপরোক্ত বর্ণনার ফোকহায়ে কিরামদের প্রতিষ্ঠিত আমল ও স্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও "একামত' বলার আগে দাঁড়িয়ে যায় এবং উল্লেখিত আমলের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনা, এবং তাদের দেখাদেখি কিছু সুন্নি মসজিদেও এ রকম তরিকা দেখা যায়। অতএব, এটা লা-মাযহাবী, ওহাবী, মওদুদীপন্থী হওয়ারই চিহ্ন। এ থেকে বিরত থাকা এবং ইকামতে মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাল

[১২৫]. আল-জাওহারাহ-১/১০২, দুরারুল হুক্কাম-১/১৬০।
[১২৬]. ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৪৭৯, আলমগীরি-১/৫৭।
[১২৭]. বুখারী শরীফ-৭২৩, মুসলিম শরীফ-৪৩৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফালাহ" বলার সময় দাঁড়ানোই মসনুন পন্থা ও 'সুন্নি ইমাম' হবার প্রতীক।

- মুক্তাদীগণ ইমামের প্রথম 'তাকবীরে তাহরীমার' সাথে সাথেই নিয়ত বাঁধবে। অবহেলা করে দেরী করলে সারা পৃথিবী দিলেও সেই ফজিলত তূল্য হবে না। যেহেতু হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে চল্লিশ দিন যাবত তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায় করবে, তাকে জাহান্নাম ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি দেয়া হবে"। [১২৮]
  অপর হাদীসে এসেছে, "ইমামের পেছনে তাকবীরে উলা পাওয়াটা একশত উট কুরবানী করার চেয়ে উত্তম"। [১২৯]
- অনেক মুসল্লি আবার ইমাম-তাকবীর বলার পরও আরবী নিয়ত পড়তে পড়তে ওদিকে ইমাম 'দো'আ এ সানা' পড়ে ক্বিরাআত শুরু করে দেয়, এটা বড় ভুল। কারণ আরবীতে নিয়ত পড়া মোস্তাহাব, আর দো'আয়ে সানা পড়া সুন্নাতে মাওয়াক্কাদাহ। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে, যদি আরবী নিয়ত পড়ে ইমাম ক্বিরাআত শুরু করার আগে 'দো'আ এ সানা' পড়তে না পারার আশংকা হয়, তবে আরবী নিয়ত না পড়ে, শুধু "আল্লাহু আকবর" বলে দো'আ এ সানা পড়বে। এতে অন্তরের নিয়তই যথেষ্ট হিসাবে বিবেচিত হবে।

মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় যে দো'আ পড়বে:

اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহীল কারীমি ওয়া সুলতানিহীল কদীমি, মিনাশ্ শাইত্বানির রাযীম।

মসজিদে ঢুকার সময় ডান পা আগে ঢুকায়ে এ দো'আ পড়বে:

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ و افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ نَوَيْتُ سُنَّةَ الاِعْتِكَافِ مَا دُمْتُ الْمَسْجِدَ ـ

[১২৮]. সুনানু তিরমিযী-২৪১।
[১২৯]. আত-তারগীবু ফী ফাযায়িলিল আ'মাল-১০৬।

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ্ ওয়াস সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াফ তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা, নাওয়াইতু সুন্নাতাল ই'তিকা-ফি মা দুমতুল মাসজিদা।

মসজিদে ঢুকার পর পড়তে হয় যে দো'আ:

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ: আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন।

মসজিদ হতে বের হবার সময় পড়বে:

بِسْمِ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ

উচ্চারণ: বিছমিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা মিন ফাদ্লিকা ওয়া'সিমনি মিনাশ শায়তান।

ফরয নামাযের সালাম ফিরায়ে উচ্চস্বরে নিম্নলিখিত দো'আ পড়বে:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ وَ أَنْتَ وَسِيْلَتِيْ خُذْ بِيَدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَ عَلٰى آلِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ اَهْلِ بَيْتِكَ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ ـ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইউন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহীল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, কাদ দ্বাক্বাত হীলাতি ওয়া আন্তা ওয়াসীলাতি খুয্ বিয়াদী ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইকা ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ওয়া আযওয়াজিকা ওয়া আহলি বাইতিকা ওয়া বা'রাকা ওয়া সাল্লামা। প্রকাশ তাকে যে, মাগরিবের নামাযের ফরয শেষে "ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" পর্যন্ত পড়বে। যেহেতু মাগরিবের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সময়টা স্বল্প তদুপরি ফরযের পরে দু'রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রয়েছে। তাই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাকে মুস্তাহাবের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

ঘর হতে বাহিরে যাওয়ার সময় বিনা অযু যাবে না, ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দো'আ পড়বেঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ـ

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

ঘরে ঢুকার সময় পড়বেঃ

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ ـ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মু'লাজি ওয়া খায়রাল মুখ্‌রাজি।

বিতিরের নামাযের সালাম ফিরায়ে এই দো'আ উচ্চস্বরে তিন বার পড়বেঃ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ـ

উচ্চারণ: সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস।

যে সকল কারণে নামায ফাসেদ 'নষ্ট' হয়:

১. জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কথা বললে; নামায বহির্ভূত অর্থবোধক এক শব্দ ও উচ্চারণ করলে নামায ভঙ্গ হবে। অবশ্য অর্থহীন কোন শব্দ উচ্চারণ করলে নামায ভঙ্গ হবে না।
২. ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সালাম বা সালামের জওয়াব বা উত্তর দেয়া।
৩. মোসাফাহা বা হ্যাণ্ডশেক করলে।
৪. বিনা প্রয়োজনে নামাযে কাশলে, তবে ওযর বশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে কাশি এসে গেলে, বা না কাশিয়া ক্বিরাআত ইত্যাদি পড়তে না পারলে,

কফ জমে গেলে, বা ইমাম সাহেবকে সর্তক করবার জন্য কাশলে নামায ফাসেদ (ভঙ্গ) হবে না।

৫. পরস্পর কথা বার্তার মত দো'আ করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নামাযে যদি এমন জিনিস চাওয়া হয়; যা মানুষের কাছে চাওয়া যায়।
৬. কারো হাঁচির জবাব দিলে। কিন্তু হাঁচি দাতা নিজেই নামাযে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললে নামায ফাসেদ হবে না।
৭. শুভ সংবাদ শুনে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বললে।
৮. দুঃসংবাদ শুনে 'ইন্না লিল্লাহ্' বললে।
৯. বিস্ময়কর সংবাদে 'সুবহানাল্লাহ্' বললে।
১০. দুঃখ কষ্টে কাঁদলে বা উহ্ উহ্, উফ উফ অথবা আহ্ আহ্ উচ্চারণ করলে নামায ফাসেদ হবে। কিন্তু ক্বিরাআত শুনে আল্লাহ্‌র স্মরণে কাঁদলে বা বেহেশতের আগ্রহে, দোজখের ভয়ে কাঁদলে নামায ফাসেদ হবে না; তবে তা একান্ত মনের অজান্তে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ বে-ইখতিয়ারী হতে হবে। অন্যথায় নামায ফাসেদ হবে।
১১. নিজের ইমাম ব্যতীত অপর কাকেও নামাযরত অবস্থায় কেরাতের 'লোকমা' ভুল শুধরিয়ে দিলে নামায ফাসেদ হবে। মুক্তাদী যদি নিজের ইমামকে লোকমা দেয় তবে ইমাম বা মুক্তাদী কারো নামায ফাসেদ হবে না। চাই ইমাম লোকমা গ্রহণ করুক বা না করুক, যদি এক নামাযী অন্য কোন নামাযীকে যে পৃথকভাবে নামায পড়ছে তাকে নামাযের কেরাতে লোকমা দেয়া। এতে নিজের নামাযই ফাসেদ হয়ে যাবে। অপর নামাযী যদি তার লোকমা গ্রহণ করে তবে তার নামাযও ফাসেদ হয়ে যাবে। এভাবে নামায পড়ছে না, এমন কোন ব্যক্তি যদি কোন নামাযী ব্যক্তিকে লোকমা দেয়, আর নামাযের অবস্থায় সে তা গ্রহণ করে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।
১২. কুরআন শরীফ দেখে দেখে (নামাযরত অবস্থায়) পাঠ করলে।
১৩. আমলে কাসীর করলে। অর্থাৎ নামাযে এমন কোন কাজ করা যা দূর হতে কোন ব্যক্তি মনে করে সে ব্যক্তি নামাযরত নয়; এরূপ কাজকে 'আমলে কাসীর' বলা হয়। এতে নামায ফাসেদ হয়। কোন কোন ফকিহের মতে; একটি কাজ তিন বার করাকে 'আমলে কাসীর' বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর তিনবারের কম করলে আমলে কালীল বলা হয়। এতে নামায ফাসেদ হয় না; তবে মাকরূহ হবে।

১৪. নামাযী এমনভাবে হাসলে যাতে পার্শ্ববর্তী লোকে শুনলে; যাকে কাহ্কাহ্ যার অর্থ উচ্চ অট্টহাসি। এতে নামায ও অযু ফাসেদ ও ভঙ্গ হয়ে যাবে। হ্যাঁ জানাযার নামায নহে। আর যদি এমনভাবে নামাযে হাসে যার আওয়াজ নিজে শুনে, পাশের লোকেরা না শুনে, একে 'দ্বেহাক' বলা হয়; তাতে নামায ফাসেদ হবে, অযু ভঙ্গ হবে না। আর যদি নামাযে মুচকী হাসে, যার শব্দ নিজে বা অপরে না শুনে, শরিয়তের পরিভাষায় এটি তাবাস্সুম। এটি দ্বারা নামায বা অযু কোনটাই নষ্ট হবে না।

১৫. দাঁতের ফাঁক হতে এক চনা বা এর অধিক পরিমাণ জিনিস ভক্ষণ করলে।

১৬. অপবিত্র স্থানে সেজদা করলে।

১৭. অজ্ঞান, বা মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলে।

১৮. তায়াম্মুম করে নামায আরম্ভ করার পর পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে বা পাওয়া গেলে।

১৯. আল্লাহ্ বা আকবর শব্দদ্বয়ে "আলিফ" ও 'রা' অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ টেনে দীর্ঘ করলে।

২০. নামাযরত অবস্থায় অপবিত্র স্থানে হাত বা হাঁটু রাখলে।

২১. বিনা ওজরে কেবলার দিক হতে সিনা (বক্ষ) ফিরালে।

২২. নামায না হওয়ার মত নাজাসত সহ বা সতর খোলা অবস্থায় নামায আদায় করলে বা তিন তসবীহ পরিমাণ সময় বৃথা কাটালে বা অহেতুক সময় ক্ষেপন করলে।

২৩. একই রোকনে তিন বারের অধিক শরীর চুলকালে নামায নষ্ট হবে। যেমন রুকু করা বা সেজদা করা। কাওমা ইত্যাদি নামাযের রোকনের অন্তভূর্ক্ত।

২৪. রুকু সেজদা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইশারা করে নামায পড়লে।

২৫. কোন ওজর বিশিষ্ট ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় ওজর-নামাযে দূরীভূত হলে।

২৬. ইমাম হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা করলে বা ভঙ্গ হওয়ার প্রেক্ষিতে ইমামের নামায বাতিল বা খলিফা নির্ধারণ ব্যতিরেখে ইমাম মসিজিদের বাইরে চলে গেলে।

২৭. নামাযীর অযু কেহ নষ্ট করে দিলে।

২৮. জামাতে নামাযরত অবস্থায় মহিলাকে সামনে বা পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে।

২৯. ফজরের নামায পড়তে পড়তে সূর্যোদয় হলে।

৩০. জুমার নামায পড়তে আসরের নামাযের সময় হলে অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে;

৩১. যে ব্যক্তির উপর তরতীবের সাথে ক্বাজা নামায পড়া ফরয, তার স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ক্বাজা নামায তারতিবের সাথে আদায় না করে ওয়াক্তিয়া নামায আরম্ভ করলে। তবে মাগরিবের নামাযের পূর্বে নয়।

৩২. তীরের আঘাত হতে রক্ষা পেতে বা তিন কদম হেঁটে সাপ, বিচ্ছু মারলে। হ্যাঁ তিন কদম না হেঁটে বা তীরের আঘাত হতে রক্ষা পেতে তিন কদম না হাঁটলে নামায ফাসেদ হবে না।

৩৩. নামাযের কেরাতে কুরআন করিম এমন ভুল পড়া; যাদ্বারা আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

৩৪. জমাআতে নামাযরত মুক্তাদী যদি ইমামের অগ্রভাগে দাঁড়ায় নামাযই শুদ্ধ: আদায় হবে না।

৩৫. নামাযরত অবস্থায় মোবাইল ফোন বন্ধ করলে। যেহেতু এটি 'আমলে কাসীর' এর অন্তর্ভূক্ত।

৩৬. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করলে।

ইসবাল বা টাখনুর নীচে কাপড় পরার বিষয়ে শরয়ী বিধান ঃ

প্রকাশ থাকে যে, প্যান্ট পায়জামা ইত্যাদি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পড়া সর্বাবস্থায় হারাম।[১৩০]

অনেকে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করাকে কবীরা গোনাহ বলে ঘোষণা করেছেন।[১৩১]

সুতরাং এই হারাম কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় নামায পড়লে নামায নামাযই শুদ্ধ হবেনা। অনেক সময় দেখা যায় জামায়াত শুরু হওয়ার আগে মুসল্লীদের কেউ কেউ নিজেদের পাজামা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর গিরার উপরে

---

১৩০. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-৫/৩৩৩।

১৩১. আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির ইবনিল হাজার আল-হাইতামী-১/৩৫১, আল-কাবায়ির লিয-যাহাবী-৩৮৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুলে নিচ্ছেন বা ইমাম সাহেব বলে দিচ্ছেন, কাপড় টাখনুর উপর তুলে নিন। এত মনে হয় যেন শুধু নামাযের সময়ই কাপড় টাখনুর উপর তুলতে হবে; এ বিষয়টি শুধুমাত্র নামাযের সাথে সম্পৃক্ত, আসলে বিষয়টি এমন নয়। নামাযের ভিতরে-বাইরে সর্বাবস্থায় কাপড় টাখনুর নীচে পরা কবীরা গোনাহ। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লুঙ্গির (কাপড়ের) যে অংশ টাখনুর নীচে থাকবে দেহের ঐ অংশ জাহান্নামে যাবে। [১৩২]

অপর হাদীসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। একঃ খোঁটাদানকারী, সে যা কিছু দান সদকা করে পরক্ষণেই খোঁটা দেয়, দুইঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পন্য বিক্রি করে, আর তিনঃ যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে বা পরিধান করে। [১৩৩]

আরেক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি অহংকার বশত কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। [১৩৪]

সুতরাং এ বিষয়ে নিজেও সতর্ক থাকা এবং অন্যদেরকেও সতর্ক করা একান্ত জরুরী।

যে সব ওজরে নামাযরত ব্যক্তি নামায ভঙ্গ করা জায়েযঃ

১. কোন বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তির সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে। কেহ পানিতে ডুবে মরতে লাগলে। অবুজ শিশু পানিতে পড়ার আশংকা থাকলে। কেহ আগুনে পড়তে লাগলে বা আগুনে পড়ে জ্বলতে লাগলে। এরূপ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকলে নামায ছেড়ে উদ্ধারের চেষ্টা করা ওয়াজিব। না করলে গুনাহ্গার হবে।

২. জন্তু, জানোয়ার বা সাপ বিচ্ছু কর্তৃক ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে অথবা চার আনা পরিমাণ মাল চুরি বা নষ্ট হতে লাগলে নামায ছেড়ে তা রক্ষা করা জায়েজ হবে।

---

[১৩২]. সহীহ বুখারী-৫৭৮৭।
[১৩৩]. সহীহ মুসলিম-১০৬।
[১৩৪]. সহীহ বুখারী-৫৭৯১, সহীহ মুসলিম-২০৮৫।

৩. প্রস্রাব পায়খানার হাজত অনুভূত হলে, বেগ অতিরিক্ত হলে, অজানাবশতঃ শরীর বা কাপড়ে যে পরিমাণ নাজাসত থাকলে নামায দোরস্ত হয় না, আকস্মিক সে পরিমাণ নাজাসত কাপড় বা শরীরে দেখতে পেলে নামায ছেড়ে দিবে।

৪. কোন বিপদ ছাড়া মাতা পিতার আহ্বানে সাড়া দিতে ফরয নামায ভঙ্গ করা, তবে ঐ অবস্থায় জায়েজ নহে। নামাযে আছে একথা জেনে যদি মাতা পিতা আহ্বান করেন, তবে নফল নামাযে রত থাকলে জওয়াব দেয়া উত্তম। আর যদি অজানা সত্ত্বে আহ্বান করেন তবে সর্ব অবস্থায়ই নামায ভঙ্গ করে জওয়াব দেয়া ফরয। (মারাকীউল ফালাহ্, তাহতাবী)।

ইমামতের বয়ানঃ

(এক) 'আহাক্ব বিল ইমামত' অর্থাৎ ইমাম হওয়ার জন্য সর্বোত্তম অধিকার আলেম অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান অধিকন্তু তাহারাত বা পবিত্রতার ও নামাযের আহকামের জ্ঞান সবচেয়ে বেশী রাখে।
(দুই) যে ক্বিরাআত সবচেয়ে বেশী শুদ্ধ পড়তে পারে।
(তিন) যে সব চেয়ে বেশী মুত্তাকী বা পরহেজগার।
(চার) যে সব চেয়ে বেশী বয়স্ক।
(পাঁচ) যে সব চেয়ে বেশী সৎ চরিত্রবান।
(ছয়) যে সব চেয়ে বেশী রূপের সৌন্দর্যের অধিকারী।
(সাত) যে সব চেয়ে বেশী উচ্চ বংশের অধিকারী।
(আট) যে সবচেয়ে বেশী সুমধুর আওয়াজের সুরের অধিকারী।
(নয়) তারপর যে সবচেয়ে বেশী পবিত্র পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত। যদি উপস্থিত ইমাম সাহেবানগণ উপরোল্লেখিত সবগুণে সমান হয়, মুসল্লীগণ নির্বাচন করবেন। যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তবে অধিকাংশের মতের উপর ন্যাস্ত হবে। যদি তাঁরা (মুসল্লিরা) সর্বগ্রাধিকার ব্যক্তি (ইমাম) বাদ দিয়ে ইমাম নির্বাচন করেন মুসল্লিরা গুণাহ্গার হবেন।

ইমাম হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া, পুরুষ হওয়া, পূর্ণ আকল থাকা, সাবালেগ হওয়া, নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, মাজুর বিকলাঙ্গ না হওয়া শর্ত। এ শর্তসমূহ হতে যে কোন একটি শর্তও অপূরণ হলে তাঁর ইমামতী দোরস্ত হবে না। হ্যাঁ মাজুর তাঁর ন্যায় মাজুরদের (বিকলাঙ্গের)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমামতী করতে পারবে। তায়াম্মুম কারী অযূ কারীদের ইমামতী করতে পারবে।

প্রকাশ্য ফাসেক যেমন শরাবী, জুয়াটি, জেনা খোর, সুদখোর, চুগলখোর পরোক্ষ নিন্দাকারী ইত্যাদি আর যে দাঁড়ি মুণ্ডায় বা এক মুষ্টির ভিতর দাঁড়ি ছাটায় তাদেরকে ইমাম নিয়োগ করা গুণাহ্, তার পেছনে ইকতেদা করা (নামায পড়া) মাকরূহে তাহ্‌রিমী পড়লে: (দুহ্‌রাইতে হবে) পুনঃরায় পড়তে হবে।

রাফেজী, খারেজী, ওহাবী, মওদুদী, ছলফী, লা-মাযহাবী, তাবলীগি ইত্যাদি সহ খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) এর খেলাফত ও সাহাবীয়াতকে যদি অস্বীকার করে অনুরূপভাবে যারা হযরত ওসমান যুন নূরাইন (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (র.) এর দূর্ণাম করে, তাদের ইমাম বানানো অবৈধ। তাদের পিছনে ইকতেদা করলে নামায দোহরাতে হবে। জেনে শুনে পড়লে ঈমান হারাবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তারা লেবাসে মুসলমান হলেও সত্যিকার অর্থে তারা মুনাফেক।

এভাবে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে (রা.) অস্বীকার করে, বা শাইখাইনে করিমাইন অর্থাৎ সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে অশোভণীয় উক্তি করে, বা যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, বা শাফাআতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা দীদারে এলাহী, আজাবে কবর ইত্যাদির অস্বীকার করে; তাদের পেছনে ইক্‌তেদা জায়েয নেই।

সবচেয়ে মারাত্মক হলো যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে মানহানীকর আক্বীদা পোষণ করে বা ওই সমস্ত বদ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সমর্থন করে তাদের পিছনে নামায মোটেই শুদ্ধ হবে না।

তাছাড়া হুব্বে আলী (রা.) এবং বুগজে মুয়াবিয়া (রা.) বিশ্বাসী বা তার বিপরীতে হুব্বে মুয়াবিয়া (রা.) এবং বুগজে আলী (রা.)'র বিশ্বাসীরাও ইমাম হওয়ার অযোগ্য। অর্থাৎ সমস্ত সাহাবা কিরাম (রা.) সত্যের মাপকাটি হিসাবে ঈমান রাখতে হবে। ঐ রকম বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

জমা'আত এর বয়ান:

ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, একা নামায পড়া অপেক্ষা জমাতের সাথে নামায পড়া সাতাশ গুণ বেশী উত্তম। আরো ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জমাতের

সাথে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি নামায পড়ল, আর যদি ফযরের নামায ও জমাআতে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত্রি নামায পড়ল। আরো এরশাদ করেছেন, তোমরা কাতার সোজা করিও, এবং কাঁধে কাঁধ মিলায়ে দাঁড়াইও, আর তোমাদের কাতারের মধ্যে শয়তানের জন্য স্থান খালি রেখো না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিতভাবে রাখবে, আল্লাহ্ তার উপর রহমত নাজিল করবে। আর যে ব্যক্তি কাতার সোজা রাখতে অবহেলা করবে, আল্লাহ্ তাকে রহমতের অংশ হতে বঞ্চিত করবে।

জামাতে নামায পড়া পুরুষদের জন্য সুন্নাতে মাওয়াক্কাদাহ্ ওয়াজিবের পর্যায়ে। দিনের নামাযে হউক বা রাত্রির নামাযে, জুমার নামাযে হউক বা ঈদের নামাযে। যুবতী হউক বা বৃদ্ধা মেয়ে লোকদের জন্য কোন নামাযের জমাআতে যাওয়া দোরস্ত নেই। জুমআ ও দুই ঈদের নামাযে জমাআত শর্ত: জমাআত ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।

- তারাবীর নামাযের 'জমাআত' 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা আলাল কেফায়া'। মহল্লার কিছু লোক জমাআত সহকারে পড়লে বাকী মহল্লাবাসী জমাআত 'তৃরক' করার গুণাহ্ হতে আল্লাহ চাহে তো রক্ষা পেতে পারেন।
- রমজান শরীফে বিতিরের নামায জমাআতে পড়া মুস্তাহাব। ইস্তেস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার), কুসুফ (চন্দ্র গ্রহণ) ও খুসুফের এর (সূর্য্য গ্রহণ) নামায ছাড়া বাকী সমস্ত সুন্নাত ও নফল নামায জমায়াতে পড়া মাকরূহ। রমজান শরীফ ব্যতীত বিতিরের নামায ও জমাআতে পড়া মাকরূহ।
- ❖ একা একজন মুক্তাদী যদিও ছোট হয় ইমামের বরাবরে ডানে এভাবে দাঁড়াবে যেন; ইমামের পায়ের গোড়ালীর সাধারণ নিচে পা থাকে। বাম দিকে বা পিছনে দাঁড়ালে মাকরূহ হবে। দুইজন বা তার অধিক হলে পিছনে দাঁড়াবে। ঐ অবস্থায় বরাবরে দাঁড়ালে মাকরূহ হবে।
- ❖ একজন লোক ইমামের পাশাপাশি দাঁড়ায়ে নামায পড়ছে, অন্য লোক আসলে ইমাম সামনের দিকে সরে যাবে। পা উঠায়ে যাবে না বরং মাটির সাথে লাগিয়ে যাবে এবং রোকন পরিবর্তন করার সময় যাবে, যথা দাঁড়া অবস্থা হতে রুকুতে যেতে, রুকু হতে, সেজদায় যেতে সেজদা হতে দাঁড়াতে যাবে।
- ❖ মুক্তাদী সফের (কাতারের) পেছনে একা দাঁড়ালে মাকরূহ হবে, যদি সফে জায়গা থাকে, জায়গা না থাকলে দোষ নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- যে মসজিদে ইমাম নির্দিষ্ট আছে তাঁর বিনা অনুমতিতে তথায় কারও ইমামতি করার অধিকার নেই। মহল্লা ও গ্রামবাসী মুসল্লীদের মতের বিরুদ্ধে ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমি।
- যে মসজিদে ইমাম মোয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে, নির্দিষ্ট ইমাম মুয়াজ্জিন আজান দিয়ে জমাআত আদায় করলে ২য় বার আজান সহকারে জমাআত আদায় করা মাকরূহ। হ্যাঁ যদি আজান ও একামত ছাড়া মেহ্রাবের জায়গা হতে সরে সানী জমাআত আদায় করে মাক্রূহ হবে না।
- যে সব মসজিদ রাস্তার পার্শ্বে এবং সেই রাস্তা দিয়ে সর্বদা লোকজন চলাচল করে, আর সেসব মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জিন নিযুক্ত নেই, এরূপ মমজিদে দ্বিতীয়বার আজান ও একামত সহকারে জমাআত পড়া মাকরূহ নহে। [১৩৫]
- যে ব্যক্তি জমাআতে ইমামের সহিত প্রথম রাকাতে শরীক হয়, ফিকাহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে 'মুদরেক' বলা হয়।
- আর যে ব্যক্তি প্রথম রাকাতের পর শামেল হয় তাকে 'মাসবুক' বলা হয়।
- যে ইমামের সাথে প্রথম রাকাতে শরীক হয়ে মধ্যে কোন কারণে ছুটে যায়, পরবর্তীতে এসে ওই একই নামাযে সামিল হয়, তাকে 'লাহেক' বলে।
- ইমামের সাথে অন্ততঃ রুকুতে শরীক হতে পারলে পূর্ণ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। অন্যথায় পূর্ণ রাকাত গণণা যোগ্য নহে।
- ইমাম যখন জোরে (উচ্চস্বরে) ক্বিরাআত শুরু করেন তখন 'মুদরেক', 'মুসবুক' ও 'লাহেক' কেহই 'দোয়ায়ে সানা (সুবাহানাকা আল্লাহুমা...) পাঠ করবে না। ইমাম যদি আস্তে ক্বিরাআত পড়েন তবে সানা পাঠ করবে। যেমন ফযর মাগরিব, ইশা প্রথম দুরাকাতে কিরাত ইমাম জোরে পড়েন। আর জোহর আসর নামাযে এবং মাগরিবের ৩য় রাকাতে ইশা ৩য়, ৪র্থ রাকাতে কিরাত আস্তে পড়া হয়। আস্তে ক্বিরাত পড়াকালীন বা রুকু থেকে দাঁড়ালে দোয়ায়ে সানা পড়ে নেবে।

[১৩৫]. বাদায়েউস সানায়ি'-১/১৫৩. দুররে মুখতার-১/৩৭৭।

- ইমামের ক্বেরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট, মুক্তাদীর জন্য স্বতন্ত্রভাবে ক্বিরাআত বা ফাতেহা পাঠ করা হানাফী মাযহাব মতে জায়েয নেই। অর্থাৎ নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

নামাযে মুকাব্বির নিযুক্তির বিধানঃ

প্রকাশ থাকে যে, জামায়াতে ইমাম সাহেবের আওয়াজ সকল মুক্তাদির নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যথায় তারা ইমাম সাহেবের অনুসরণ করবে কিভাবে? যেহেতু ইমামের তাকবীর শুনেই মুক্তাদিদেরকে তাকবীর বলতে হয়। মুক্তাদির সংখ্যা যদি এত অধিক হয় যে, সকলের নিকট ইমাম সাহেবের আওয়জ পৌঁছেনা অথবা ইমাম সাহেবের অসুস্থতা বা নিচু কণ্ঠস্বর হওয়ার কারণে সকল মুক্তাদির কাছে আওয়াজ পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে মুক্তাদিদের মধ্যে থেকে মুকাব্বিরের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا»

অর্থাৎ- 'হযরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়ালেন তখন হযর আবু বকর সিদ্দীক তাঁর পেছনে দাড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন হযরত আবু বকর সিদ্দীকও আমাদেরকে শুনানোর জন্য তাকবীর বলতেন।' [১৩৬]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ---فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يَسْمَعُ النَّاسَ ".

[১৩৬]. সহীহ মুসলিম-৪১৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ- উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় নামাযে বের হলেন। তিনি আবু বকরকে পাশে রেখে বসে নামায পড়ালেন আর আবু বকর উচু আওয়াজে মুক্তাদিদেরকে তাকবীর শোনালেন। [১০৭]

উল্লেখ্য যে, আধুনিক আবিষ্কার মাইক বা সাউণ্ড সিষ্টেম দ্বারাও মুকাব্বিরের কাজ সমাধা করা যায় অত্যন্ত সহজে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই তবে তা করতে গিয়ে যন্ত্র নির্ভর হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত তথা মুকাব্বির নিযুক্তি বাদ দেয় কিছুতেই উচিত নয়। এছাড়াও বৈদ্যুতিক লোডশেডিং বা যান্ত্রিক গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় সাবধানতাবশতঃ মাইক বা সাউণ্ড সিষ্টেমের সাথে মুকাব্বির রাখতেই হবে।

অতএব, জামাত সহকারে নামায আদায়ের সময় ওয়াক্তিয়া হোক বা সালাতে জুমা বা সালাতে ঈদাইন বা সালাতে জানাযা কিংবা সালাতে তারাবিহ্ সকল বড় জামাতের ক্ষেত্রে যেন 'মুকাব্বির' রাখেন। তার মানে ইমাম সাহেবকে যেমন মাইক দেয়া হয়, মুকাব্বিরকেও যেন মাইক দেয়া হয়। অন্যথায় 'তারেকে সুন্নাত' হিসাবে গুনাহগার হবেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইমামতিতে হযরত সিদ্দীকে আকবর (র.) স্বয়ং মুকাব্বির হওয়ার প্রমাণ উল্লেখিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধায় উহাই সুন্নাত।

বিষয়টি কতই গুরুত্বপূর্ণ তা সুবিজ্ঞ পাঠকই বিবেচনা করবেন। যেমন পবিত্র হারামাঈন শরীফাঈনে ইমাম সাহেব যেমন মাইক যোগে নামায পড়াচ্ছেন, তেমনি তাঁর পিছনে 'মুকাব্বির'ও রেখেছেন এবং তাঁকেও মাইক দিয়েছেন। এর দ্বারা ইমামের আওয়াজের পাশাপাশি 'মুকাব্বির'ও তাকবির বলার কারণে ইমামের তাকবিরের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে, আবার হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগের প্রেক্ষিতেও মুসল্লিদের নামাযে কোন প্রকার ব্যতিক্রম না ঘটাতে অনেকাংশে সহায়তা করে। অর্থাৎ মাইক বন্ধ হয়ে গেলেও কাহারো নামায নষ্ট হবে না। ইমামের অনুসরণে মুক্তাদীরা তাঁদের নামায সচ্চতার মাধ্যমে আদায় করতে সহায় হবে। যেহেতু 'মুকাব্বির' রয়েছেন।

[১০৭]. সহীহ মুসলিম-৪১৮, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৫০৮০

মুক্তাদী ক্বিরাত পাঠ সংক্রান্ত মওদুদী মতবাদ ও কতিপয় জরুরী মাসায়েল:

সুপ্রিয় পাঠক! আপনি যদি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক হানাফি মাযহাবের অনুসারী না হয়ে মনগড়া আদর্শ ধর্ম! মওদুদী শরীয়তের ('জামাতে ইসলামী'র) অনুরাগী হন, তাহলে মওদুদী সাহেবের গবেষণা মতে 'মধ্যমও সঠিক পন্থা হচ্ছে ইমাম যখন উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়বে, তখন মুক্তাদিরা চুপ থাকবে, আর ইমাম যখন নিঃশব্দে পড়বে, তখন মুক্তাদিরা ফাতেহা পড়বে"। রাসায়েল মাসায়েল ১ম খণ্ড বাংলা সংস্করণ ১৭৪ পৃষ্ঠা "হানাফি মাজহাব ও হাদিস' শিরোনাম দ্রষ্টব্য, এর অনুসরণ করলে আপনার জামাতে নামায আদায়ের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

- ❖ 'মাসবুক' তার অবশিষ্ট নামায আদায় করার সময় 'সানা'সহ 'তাউয', তাসমিয়া, 'ফাতেহা' ও 'কেরাত' পাঠ করবে।
- ❖ 'লাহেক' তার যে নামাযের কয়েক রাকাত ইমামের সাথে পায়নি, উক্ত নামায আদায় করার সময় ফাতেহা ও ক্বিরাআত পাঠ করবে না। ক্বিরাআত ছাড়া, তকবীর তসবীহ এবং তাশাহুদ ইত্যাদি পড়বে।
- ❖ "মাসবুক" ব্যক্তি ইমামকে রুকু, সিজদা, কুউদ, ক্বিয়াম যে অবস্থায়ই পাক, তাকবীরে তাহ্রীমা' রুকু সিজদা ইত্যাদির দ্বিতীয় তাকবীর বলে ইমামের সঙ্গে শরীক হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমামকে রুকুতে না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না ; প্রথম দিকে ছুটে আসলে ইমাম সালাম ফিরানোর পরে পড়ে নিবে।
- ❖ ইমাম নামায হতে অবসর (সালাম ফিরালে) হলে, 'মাসবুক' তার অবশিষ্ট নামায পড়বে। 'মাসবুকের' অবশিষ্ট রাকাতের প্রথম রাকাতে ক্বিরাআত পাঠের ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রথম রাকাত বলে গণ্য হবে, এবং যথারীতি কেরাত পাঠ করতে হবে; অর্থাৎ অবশিষ্ট নামাযের প্রথম ও ২য় রাকাতে ফাতেহার পর সুরাসহ পড়বে।
- ❖ কিন্তু তাশাহুদ পড়ার বেলায় ইমামের সঙ্গে যে রাকাত পড়া হয়েছে তা হতে প্রথম রাকাত গণনা শুরু করে দু'রাকাত পূর্ণ হলে তাশাহুদ পড়বে।
- ❖ মাসবুক: ইমামের তাবেদারীর খাতিরে নিজেও তাশাহুদ পড়বে, কিন্তু দুরূদ ও দো'আ মাছুরা পড়বে না। এই সময় চুপ করে বসে থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- মাসবুক; নিজের বাকি নামায পড়বার জন্য ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠবেনা। বরং ইমামের সেজদায়ে সাহু আছে কিনা তার জন্য দ্বিতীয় সালাম পর্যন্ত (ইমামের) অপেক্ষা করবে।
- মাসবুক; ইমামের সঙ্গে, ভুলে সালাম ফিরালে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে না।
- মুক্তাদীর তাশাহুদ শেষ হওয়ার পূর্বে ইমাম সালাম ফিরালে মুসাল্লী তাশাহুদ আদায় করে সালাম ফিরাবে। কিন্তু মুক্তাদীর দুরূদ ও দো'আ পড়া শেষ হওয়ার পূর্বে ইমাম সালাম ফিরালে ইমামের তাবেদারীতে তাঁর সঙ্গেই সালাম ফিরাতে হবে।
- অনুরূপভাবে ইমাম যদি মুক্তাদীর তিন তসবীহ পাঠের পূর্বে রুকু ও সেজদা হতে উঠে যায়; তবে মুক্তাদীকেও উঠে যেতে হবে। তাছাড়া মধ্যের বৈঠকে মুক্তাদীর তাশাহুদ শেষ হওয়ার পূর্বে ইমাম উঠে গেলে মুক্তাদী পূর্ণ তাশাহুদ পড়ে উঠবে।
- ফরয নামায একা আরম্ভ করার পর জমাআত শুরু হলে যদি উক্ত ফরয নামায ফযর বা মাগরিবের হয়, তবে মুসল্লিও যদি দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা না করে থাকে, নামায ছেড়ে জমাআতে শামিল হবে পূর্বে আদায়কৃত নামায নফলে গণ্য হবে এবং ইমামের পিছনের (জামাতে ছুটে যাওয়া) নামায ইমাম সালাম ফিরানোর পর আদায় করে দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতের সেজদা করে থাকলে, তখন নামায ছাড়া নিষিদ্ধ। মুসাল্লীকে তার নামায পুরা করতে হবে। জামাআতে শামিল হতে পারবে না।
- চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে উপরোক্ত অবস্থা ঘটলে; প্রথম রাকাতের সেজদা না করে থাকলে, নামায ভঙ্গ করে জামাআতে শরীক হবে, আর যদি প্রথম রাকাতের সেজদা করে থাকে, তবে দুই রাকাত পুরা করে জামাআতে শরীক হবে।
- চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকাত পড়ার পর জমাআত শুরু হলে, সালাম ফিরায়ে জমাআতে শরীক হবে। আদায়কৃত ঐ দু'রাকাত নামায নফল হিসাবে বিবেচিত হবে। ইমামের পিছনে পূর্ণ চার রাকাআতই আদায় করতে হবে।
- এভাবে দু'রাকাত পড়ে তাশাহুদ শেষে উঠে দাঁড়ানোর পর জমাআত আরম্ভ হলে, তৃতীয় রাকাতের সেজদা না করা পর্যন্তদাঁড়ান অবস্থায় এক

সালাম ফিরায়ে নামায ভঙ্গ করে জমাআতে সামীল হবে এবং উপরোল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করবে। কিন্তু তৃতীয় রাকাতের সেজদা করে ফেললে, নামায পুরা করে, তারপর নফলের নিয়ত করে জমাআতে শরীক হতে পারবে।

- উল্লেখ থাকে যে, শুধু জোহর ও ইশার নামায শেষ করে নফলের নিয়তে জমাআতে শামিল হওয়া যায়। ফজর, আসর ও মাগরিবের নামাযে নহে।
- জুমার চার রাকাত কাবলাল জুমা (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) আরম্ভ করার পর খোৎবা আরম্ভ হলে, সুন্নাত পুরা করে নেবে। তাছাড় জুমা বা ওয়াক্তিয়া আজানের পর জামাআত না পড়ে মসজিদ হতে চলে যাওয়া মাকরূহ। কিন্তু আযান শ্রবণকারী অন্য কোন মসজিদের ইমাম হলে বা বিশেষ কোন প্রয়োজনে যেতে পারবে।

মুসাফিরের নামাযের বয়ান:

বাড়ী বা বাসস্থান হতে হেঁটে বা নৌকায় স্বাভাবিক গতিতে চললে ছোট দিনের (শীতের দিনে) তিন দিনে যে পথ অতিক্রম করা যায়, এ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে কোথাও যাওয়ার নিয়ত করলে শরীয়তের ভাষায় তাকে 'মুসাফির' বলা হয়। আরবী পরিমাপ অনুযায়ী ১৮৫৫ মিটারে ১ মাইল হয়। সে হিসেবে ৪৮ মাইল যা আমাদের দেশে প্রচলিত ১৭৬০ গজের ১ মাইল হিসেবে প্রায় ৬০ (ষাট) মাইল আর বর্তমানে প্রচলিত কিলোমিটারের হিসেবে প্রায় ৯০ (নব্বই) কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়ত করলে মুসাফির হবে। পবিত্র কুরআন হাকিমে মুসাফিরকে বিশেষ ছাড় দিতে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

অর্থাৎ যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গুণাহ নেই ।[১৩৮]

স্মর্তব্য যে, মুসাফিরের জন্য শুধুমাত্র চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামায যথা যোহর, আসর ও ইশার ফরয সালাতে কসর তথা দু'রাকায়াত আদায় করা ওয়াজিব। কেউ ইচ্ছা করে সওয়াব বেশী লাভের আশায় কসর বাদ দিয়ে পুরো চার রাকাআত আদায় করলে ওয়াজিব পরিত্যাগের কারণে হাবীবে পাক

---

[১৩৮] . সূরা আন-নিসা-১০১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ থেকে মাহরূম হবে। উল্লেখিত তিন ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়া অবশিষ্ট মাগরিব, ফজর, বিতির, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, নফল ইত্যাদি সকল নামায কসর ব্যতিরেকে পূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

ওয়াত্ন' অর্থাৎ বাসস্থান দুই প্রকার:

(এক) যেখানে জন্ম হয় বা যেখানে নিজের আপনজন বসবাস করে বা যে যেখানে স্থায়ীভাবে অধিক বসবাস করার সংকল্প করে তাকে ওয়াতনে আসলী বা স্থায়ী বাসস্থান বলা হয়।

(দুই) যেখানে কোন ব্যক্তি পনের দিন বা ততোধিক থাকার নিয়ত করে, তাকে ওয়াতনে একামত বা অস্থায়ী বাসস্থান বলে।

❖ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয দুই রাকাত পড়ার নাম 'কাসরে সালাত। কমপক্ষে তিনদিনের দূরত্বে গমনের ইচ্ছা এবং তার দিকে যাত্রা শুরু করলে, এবং উপরোল্লিখিত পরিমাণ দূরত্বে একটি স্থায়ী জনপদে পনের দিনের কম অবস্থান করার মনস্থ করলে কাসর পড়তে হবে। পনের দিন অথবা এর অধিক থাকার নিয়ত করলে কাসর পড়া দুরস্ত হবে না। বিতির, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলে কোন কসর নেই, অবশ্যই পড়তে হবে।

❖ 'সফরে' যাওয়ার নিয়ত করে স্বগ্রাম বা শহরের আশপাশের আবাদী অতিক্রম করার পরই কাসর আরম্ভ করতে হবে। অর্থাৎ সালাতে ফজর ও মাগরিবের যথাক্রমে ২ ও ৩ রাকাত ফরয ছাড়া বাকি তিন ওয়াক্তের ফরয নামাজের ক্ষেত্রে ৪ রাকাতের স্থলে দু'রাকাত পড়বে।

মুসাফিরের সুন্নাত নামাযের বিধানঃ

সুন্নাত নামাযের কসর নেই। মুসাফিরকে সফরকালীন সময়েও নিরাপদে অবস্থানকালে সুন্নাত নামাযও আদায় করতে হবে। তবে রাস্তায় বেশী অসুবিধা হলে অথবা চলন্ত অবস্থায় থাকলে সুন্নাত নামায না পড়লেও চলবে। তাছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় ওয়াজিব, সুন্নাত, নফলসহ পড়তে হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর নিম্নলিখিত হাদীস থেকে আমরা সুন্নাত নামাযের গুরুত্ব বুঝতে পারি,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ، فِي الْجَنَّةِ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْبَسَةُ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ»

অর্থাৎ হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক দিন ও রাতে বার রাকাআত (সুন্নাত) নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি (স্পেশাল) ঘর নির্মাণ করা হবে। হযরত উম্মে হাবীবা (র.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে মুবারক থেকে ইহা শুনার পর জীবনে কখনো (সফর হোক কিংবা ঘরে) সেই বার রাকাআত পরিত্যাগ করিনি। বর্ণনাকারী হযরত আনবাসা (র.) বলেন, আমিও হযরত উম্মে হাবীবা (র.) এর মুখে এই হাদীস শুনার পর জীবনে কখনো তা পরিত্যাগ করিনি। [১৩৯]

ফাতওয়ায়ে শা'মীতে এসেছে,

(وَيَأْتِي) الْمُسَافِرُ (بِالسُّنَنِ) إنْ كَانَ (فِي حَالِ أَمْنٍ وَقَرَارٍ وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي خَوْفٍ وَفِرَارٍ (لَا) يَأْتِي بِهَا هُوَ الْمُخْتَارُ

অর্থাৎ- মুসাফির নিরাপদে অবস্থানকালীন সুন্নাত সমূহ আদায় করবে, তবে শংকিত ও চলন্ত অবস্থায় আদায় না করলেও অসুবিধা নাই। আর এটাই পছন্দনীয় মতামত। [১৪০]

অতএব, সফরে নিরাপদে অবস্থানকালীন সুন্নাত নামাযগুলো আদায় না করলে মুসল্লির জিম্মায় ক্বাযা হিসেবে থেকে যাবে।

❖ কাসরে সালাত তথা চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে দুই রাকাআত পড়া মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব, কেউ ইচ্ছা করে কাস বাদ দিলে বা স্থায়ী বসবাসকারীর মত পূর্ণ নামায আদায় করলে গুণাহগার হবে এবং

[১৩৯]. সহীহ মুসলিম-৭২৮, আল-মু'জামুল কবীর-৪৩০।
[১৪০]. দুররে মুখতার-১/১০৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়াজিব পরিত্যাগের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ থেকে মাহরূম হবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা।

❖ এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ থেকে হাজ্বী সাহেবানগণ হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছার পরে তারা সেখানে মুসাফির থাকবেন না বিধায় কাসর করতে পারবেন না। যেহেতু হজ্বের জন্য পনের দিনের অধিক তথা ৩৫/৪০ দিন অবস্থান করার ভিসা ও যাওয়া আসার দিন তারিখ নির্দিষ্ট এবং টিকেট নিশ্চিত থাকার কারণে তিনি মক্কায় মুকীম হিসেবে গণ্য হবেন। তবে মক্কা মোকাররামা থেকে মদীনা শরীফ অথবা ৯০ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের অন্য কোথাও গেলে মুসাফির হবেন এবং সেখানে কাসর করবেন।

মুসাফিরের নামায সম্পর্কে মওদুদী মতবাদ:

প্রিয় পাঠকদের খেদমতে একথা আরজ করতে চাই যে, যেহেতু শরীয়ত প্রণেতা কসর পড়ার ব্যাপারে কার্যকর বিধান নির্ধারণ করেছেন, সেহেতু, সফরে আপনার কষ্ট অনুভূত হউক বা না হউক, নামায কসর আদায় করতেই হবে। এতে নিজের মনোবৃত্তির কোন স্থান নেই। শরীয়ত প্রণেতার বিধানের উপর অন্তরের সাক্ষ্য অনুবর্তনের কারো অধিকার নেই। করলে গুণাহ্গারই হবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় মওদুদী সাহেব 'রাসায়েল মাসায়েল" ১ম খন্ড (বাংলা সংস্করণে) "সফরে নামায সংক্ষিপ্ত করা" শিরোনামে লিখেছেন "নামায কসর করার কোনা নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করে দেয়াটা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয় যা অতিক্রম করার সাথে সাথে কসরের বিধান কার্যকর হবে। মূলত সফর বলতে কি বুঝায় তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব শরীয়ত প্রণেতা ওই এলাকার প্রচলিত নিয়মের উপর ছেড়ে দিয়েছেন"এর কিছু পরে গিয়ে মওদুদী সাহেব লিখেছেন "শরয়ী ব্যাপারে কেবল ওই ব্যক্তির অন্তরের সাক্ষ্যই ফতোয়ার ভিত্তি হতে পারে" পাঠক এবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আপনি মওদুদী সাহবের শরীয়তে যাবেন না শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবলম্বন করবেন।

❖ মুসাফির, মুকীমের (স্থায়ী বসবাসকারীর) পিছনে (ওয়াক্তিয়া নামায পড়বার) এক্তেদা করলে ইমামের অনুকরণে পূর্ণ চারি রাকাতই পড়তে হবে।

❖ মুসাফিরের পিছনে মুকীমের নামায পড়া বৈধ। এবং মুকিম মুক্তাদীকে অবশিষ্ট নামায পড়ার সময় ক্বিরাআত পড়তে হবে না। হ্যাঁ মাসবুক অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুরু হতে জমাআতে শামিল হয়নি, তাকে ক্বিরাআত পড়তে হবে।

❖ ওয়াতনে একামত' ত্যাগ করে অন্যস্থানে 'ওয়াতনে একামত' (অস্থায়ী বসবাস) করলে বা ওয়াতনে আসলীতে আসলে বা সফরে বের হলে প্রথম স্থান আর ওয়াতনে একামত বলে গণ্য হবে না। বস্তুতঃ প্রথম স্থানে আবার ফিরে গেলেও পনের দিন থাকার নিয়ত না করা পর্যন্তকাসর পড়তে হবে। ওয়াতনে আসলীতে আসার পর পনের দিন থাকার নিয়ত না করলেও কাসর হবে না। পুরো নামাযই পড়তে হবে।

❖ সৈনিক, দেশরক্ষা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য মুসল্লিরা সর্বসময়ে 'কসর' পড়া বৈধ। তবে আপদকালীন মুহূর্ত না হলে বা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 'কসর' না পড়া উত্তম। প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম উপরোক্ত বাহিনীর সদস্যদের বেলায় মুসাফিরের জন্য ইসলামের বিধানাবলী অনুশীলনে যত প্রকারের শৈতিল্যতা প্রদর্শন করেছে সবই উপরোক্তদের বেলায় প্রযোজ্য।

নৌকা ও রেলগাড়ীতে নামায:

❖ চলন্ত নৌকা ও জাহাজে বসে ফরয নামায আদায় করতে পারা যায়। সম্ভব হলে দাঁড়ায়ে পড়া উত্তম।

❖ কেবলা ঠিক রাখা আবশ্যক। নৌকা ঘুরে গেলে নামাযী ও কেবলার দিকে ঘুরে যাবে।

❖ নৌকা বা জাহাজ তীরে বাঁধা ও স্থির অটল থাকলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। আর যদি নৌকা বা জাহাজ তীর সংলগ্ন কোথাও নোঙ্গর করলে, আর তীরে নেমে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে অবতরণ করে নামায পড়বে।

❖ রেলগাড়ীতে কোন অসুবিধা না হলে কেবলামূখী দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তবে ষ্টেশনে নেমে পড়াই উত্তম। আর পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে বসে পড়া উত্তম। এছাড়া বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজে ফরয নামায আদায়ে আমি একাগ্রতার অভাব অনুভব করেছি, অতএব উক্ত যান গুলো হতে অবতরণ পূর্বক নামায আদায় উত্তম বলে মনে করি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযা নামাযের ব্যাপারে সতর্কতা:

অনেকে নিজের জিম্মায় জীবনের বহু কাযা নামায রেখে বড় আগ্রহের সহিত নফল নামায পড়তে থাকে। ইহা মারাত্মক ভুল, ওই রকম নফল না পড়ে; ফরয, ওয়াজিব সুন্নাতে মোওয়াক্কাদা ইত্যাদি আদায়ের পর, অর্থাৎ যতদিন কাযা নামায আদায় না হবে, ততদিন নফল মোস্তহাব রেখে কাযা নামাযই আগে আদায় করবে, ওয়াজিব ফরযের কাযার বোঝা হতে নিজকে মুক্ত করার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করি।

রুগ্ন ব্যক্তির নামায প্রসঙ্গে:

- ❖ রুগী যদি মাথার ইশারায়ও নামায পড়তে অক্ষম হয় বেহুঁশি ও দুর্বলতার কারণে, তবে নামায তাহার জিম্মা হতে মাফ। তার জন্য চক্ষু ও অন্তরের ইঙ্গিতে নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।
- ❖ এমনকি যদি এই অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তার কাযা দেয়ারও তার দায়িত্বে থাকবে না। কাফ্ফারা বা ফিদিয়াও আবশ্যক নহে।
- ❖ যদি ঐ অবস্থায় ছয় ওয়াক্তের কম সময় অতিবাহিত হয়, সুস্থ হওয়ার পর কাযা দেয়া ফরয। যদিও অতটুকু সুস্থ হয় যে, মাথার ইশারায় নামায পড়তে পারে।
- ❖ যেহেতু কেয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয, সুতরাং শরীয়ত সম্মত বিশেষ ওযর ছাড়া কেয়াম ছাড়তে পারবে না। নতুবা নামায হবে না।
- ❖ এমনকি যদি লাঠি, দেয়াল বা 'থমের' পিলারের উপর টেক লাগিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে ঐভাবে হলেও দাঁড়িয়ে পড়া ফরয।
- ❖ বরং যদি কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারে বা দাঁড়িয়ে তকবীর বলতে পারে বা অল্পক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হয়, তবে ফরয এই যে, দাঁড়িয়ে নামায আরম্ভ করে বসে বসে বাকি নামায সমাধা করবে। নতুবা নামায হবে না।
- ❖ সাধারণ জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি কাঁশী বা এমন ধরণের কষ্ট যাতে মানুষ চলাফেরা করতে সক্ষম হয়, তবে উল্লেখিত রোগকে শরিয়ত কখনও ওযর হিসাবে অনুমোদন করে না। এরূপ সাধারণ কষ্টের কারণে যদি নামায বসে পড়ে থাকে ওই নামায শুদ্ধ হবে না। কাযা করা অপরিহার্য।

- ❖ যে ব্যক্তি দাঁড়ালে পেশাবের ফোটা ঝরে, বা জখম হতে রক্ত পানি ঝরে, বসলে কিন্তু তাহা হয় না, বসে নামায পড়া বৈধ ও ফরয। যদি প্রতিরোধের অন্য ব্যবস্থা না হয়।
- ❖ রোগীর নিচে নাপাক বিছানা আছে। তার অবস্থা এত শোচনীয় যে যদিও বা বদলানো হয়, তবে নামায পড়াকালীন সময়ের মধ্যে আবার নাপাক হয়ে যাবে, তবেই ওই বিছানার উপর নামায পড়ে নেবে।
- ❖ তদ্রূপ বিছানা যদি বদলালে অত সহসা নাপাকও হবে না। কিন্তু বদলাতে রোগী খুব বেশী কষ্ট পাবে, এমতাবস্থায়ও ওই নাপাক বিছানার উপরে নামায পড়ে নিবে। [১৪১]

রুগ্ন ব্যক্তির নামায পড়ার নিয়ম:

রুগ্ন ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হলে, দাঁড়ালে রোগ বাড়ার আশংকা থাকলে, শরীরে অত্যন্ত ব্যথা বোধ হলে এবং দাঁড়ালে রোগ নিরাময় দেরীতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, বসে বসে রোগীর সুবিধামত যে কোন প্রকারে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে; বরং সওয়াব ও পূর্ণ পাওয়া যাবে।

- ❖ রুগ্ন ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু সেজদা করার ক্ষমতা নেই তবে বসে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। ইশারা করে নামায পড়লে সেজদার মধ্যে রুকু হতে বেশী ঝুকবে, রুগ্ন ব্যক্তি বসে নামায পড়তে অক্ষম হলে শুয়ে নামায পড়বে। উল্লেখ্য যে, রুগ্ন ব্যক্তির চেয়ারে বসে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে এবং দোয়া ছানা পড়ে চেয়ারে বসবে। কেরাত শেষে রুকু করার জন্য দাঁড়িয়ে নিয়ম মোতাবেক রুকু করে চেয়ারে বসে দু'সাজদা আদায় করবে।

- ❖ **শুয়ে নামায পড়ার দুইটি নিয়ম যা নিম্নে বর্ণিত হলো:**

(১) কেবলার দিকে পা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে এবং মাথার নীচে একটি উচু বালিশ রাখা; যাতে মুসল্লির মুখ কেবলার দিকে থাকে, কেবলার দিকে যেন পা না থাকে; এই জন্য পা গুটায়ে রাখবে। তারপর ইশারায় নামায আদায় করবে ইহা উত্তম নিয়ম।

---

[১৪১]. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/ ১৩৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) কেবলার দিকে মুখ করে ডান বা বাম কাত হয়ে শোবে, তারপর ইশারায় নামায আদায় করবে। রোগী নিজে 'কেবলামুখী' হতে না পারলে, ভিন্ন কোন ব্যক্তি তাকে 'ক্বাবা' মুখী করে দিবে। এতেও অক্ষম হলে যেভাবে এবং যেদিকে সক্ষম সেভাবে এবং সেদিকে মুখ করে নামায পড়বে।

জুমআর বয়ান

জুমআর দিনের ফযীলত ঃ

আল্লাহ রাব্বুর ইয্যত উম্মতে মুহাম্মদী অনেক বৈশিষ্ট্য ও অগণিত মর্যাদা দান করেছেন। তন্মধ্যে জুমআর দিন অন্যতম। যেহেতু এই মহা ফযীলতের দিন সম্পর্কে ইহুদী ও নাসারারা ছিল অজ্ঞ। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা জুমআর দিন হারিয়ে ফেলেছিল, ইহুদীদের ছিল শনিবার আর খ্রিষ্টানদের ছিল রবিবার। তাই জুমাবারের পরে যেমন শনিবার ও রবিবার আসে সেভাবে হাশরের দিনেও তারা আমাদের পরে আসবে। আমরা এই পৃথিবীর সর্বশেষ উম্মত হলেও হাশরের দিন আমরা সবার অগ্রে থাকব আর ইহুদী-খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য জাতি আমাদের অনুসরণ করবে। আর আমাদের হিসাব-নিকাশ তথা বিচারকার্যও সবার পূর্বে হবে। [১৪২]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, জুমআকে এজন্যে জুমা বলা হয় যে, সেদিন মুসলমানগণ শান-শওকতের সাথে একত্রিত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন। যেহেতু আল্লাহ পাক ঈমানদেরকে ইবাদতের আহবান জানিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিনে নামাযের জন্য আহবান (আযান) করা হয়, তোমরা আল্লাহর যিকির (ইবাদত) এর জন্য অগ্রসর হও"। [১৪৩]

[১৪২] . সহীহ মুসলিম-৮৫৬।
[১৪৩] . সূরা আল-জুমআ-৯।

এই আয়াতে জুমআর আযান দিলে দৌড়ে মসজিদে যেতে বলা হয়নি, বরং প্রশান্তি ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গুরত্বসহকারে নামাযে যেতে বলা হয়েছে ১৪৪। যদিও এই বিধান সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথাপি আল্লাহ পাক শুধু জুমআর নামাযের জন্য বিশেষভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, "জুমআর দিন হচ্ছে ইবাদতের দিন, অন্যান্য মাসের উপর রমযান মাসের যেরকম সম্মান ও মর্যাদা অন্যান্য দিনের মধ্যে জুমআর দিন সেরকম সম্মান ও মর্যাদা। আর রমযান মাসে শবে কদর যেরকম গুরুতপূর্ণ জুমআর দিনে ইবাদত কবুল হওয়ার সময়ও গুরুত্বপূর্ণ "। [১৪৫]

জুমআর দিনের ফযীলত সমূহ ঃ

১. জুমআর দিন হলো সর্বোত্তম দিন, হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সূর্য উদিত হয় এমন দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিন হল সর্বোত্তম দিন, এই দিনে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে আর এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। [১৪৬]

অপর বর্ণনায় এসেছে, এই দিনেই হযরত আদম (আ.)-কে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তাওবা কবুল করা হয়েছিল আর এই দিনেই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিল। [১৪৭]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে আর এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং এই দিনেই সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। [১৪৮]

২. জুমআর দিন ইসলামের অনন্য গুরত্বপূর্ণ ফরয জুমআর নামায ও মুসলমানদের বৃহৎ সমাবেশকে ধারণ করে। আর এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে

[১৪৪] . তাফসীরে ইবনু কাসীর-৮/১২০।
[১৪৫] . যাদুল মাআদ-১/৩৯৮।
[১৪৬] . সহীহ মুসলিম-৮৫৪।
[১৪৭] . সুনানে আবু দাউদ-১০৪৬।
[১৪৮] . সুনানে আবু দাউদ-১০৪৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি তুচ্ছ জ্ঞান করে জুমআর নামায পরিত্যাগ করবে আল্লাহ পাক তার কলবে ভ্রষ্টতার মোহর অঙ্কিত করে দিবেন। [১৪৯]

৩. জুমআর দিনে এমন একটা সময় রয়েছে যে, তখন বান্দা আল্লাহ পাকের কাছে যাই দোয়া করবে তা' কবুল করা হবে। যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জুমআর দিনে এমন একটি সময় আছে যখন একজন মুসলিম বান্দা নামায কায়েম করে আল্লাহর দরবারে যাই আবেদন করবে তাই তাকে দেয়া হবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হাতে ইশারা করে বোঝান যে সময়টা অতি অল্প"। [১৫০]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম দোয়া কবুলের সেই সময় সম্পর্কে বলেন, হাদীসের ভাষ্যমতে সেই সময়টা ইমাম সাহেব মিনবরে বসার পর থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত মধ্যবর্তী এই সময়ের মধ্যে হতে পারে। অথবা সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়টা আছর নামাযের পরে। [১৫১]

৪. জুমআর দিনে দান খয়রাত করাটা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক উত্তম। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমাবারে দান-খয়রাত করাটা বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসে দান-খয়রাত করার মত। যেহেতু হাদীশ শরীফে এসেছে. "জুমাবারের দান-খয়রাত অন্যান্য সকল দিনের দানের চেয়ে উত্তম"। [১৫২]

৫. জুমআর দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে ঈমানদার প্রিয় বান্দাগণের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত. তিনি আল্লাহর বাণী وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক জুমআর দিন ঈমানদের সাক্ষাত দিবেন।[১৫৩]

১৪৯. সহীহ মুসলি-৮৬৫, জামে' তিরমিযী-৫০০।
১৫০. সহীহ বুখারী-৯৩৫, সহীহ মুসলিম-৮৫২।
১৫১. যাদুল মাআদ-১/৩৮৯-৩৯০।
১৫২. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-৫৫৫৭।
১৫৩. মুসনাদে বায্যার-৭৫২৮, সিফাতুল জান্নাহ লিআবু নুআইম-৩৯৫।

৬. জুমআর দিন হচ্ছে ঈমানদারগণের সাপ্তাহিক ঈদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই জুমআর দিন হচ্ছে আল্লাহর দেয়া মুসলমানদের জন্য ঈদ, অতএব যে ব্যক্তি জুমআয় আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা যেন স্পর্শ করে"। [১৫৪]

৭. জুমআর দিন হচ্ছে ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করার দিন। হযরত সালমান ফারেসী (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জুমআর দিনে কোন ব্যক্তি গোসল করলে, সাধ্যমত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হলে, তেল ব্যবহার করলে, সুগন্ধি লাগালে, জুমআয় বের হয়ে পূর্বে বসা দুইজনকে ঠেলে না বসলে, অতঃপর তার উপর অত্যাবশ্যকীয় নামায আদায় করলে এবং ইমামের আলোচনার সময় চুপচাপ বসে থাকলে তার এই জুমআ ও পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী গোনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। [১৫৫]

৮. জুমআর উদ্দেশ্যে বের হওয়া ব্যক্তির প্রতিটি কদমে এক বছরের রোযা ও রাত্রী জাগরণের সওয়াব দেয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। হযরত আউস ইবনু আউস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় চোপড় ধৌত করল এবং নিজেও গোসল করল, অতঃপর খুব ভোরে জুমআর উদ্দেশ্যে বের হয়ে ইমামের অতি নিকটে বসে চুপচাপ ইমামের আলোচনা শুনল, তাহলে তার প্রতিটি কদমে এক বছর রোযা রাখা ও রাত্রিজাগরণের সওয়াব দেয়া হবে, আর এটি আল্লাহর জন্য অতি সহজ"। [১৫৬]

আল্লাহু আকবর জুমআর দিকে পথচলায় প্রতিটি পদক্ষেপে এক বছর সিয়াম-কিয়ামের সওয়াব!!!

১৫৪. সুনানু ইবনে মাজাহ-১০৯৮, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৫০১৬, আল-মু'জামুল আওসাত-৭৩৫৫, মুসনাদুশ শামিয়্যীন-১৮২৪।
১৫৫. সহীহ বুখারী-৪৭৯, মুসনাদে আহমদ-২৩৭২৫, ত্বাহাভী-২১৬৯
১৫৬. মুসনাদে আহমদ-১৬১৭৫, ত্বাহাবী-২১৬৭, আল-মু'জামুল কবীর-৫৮১, মু'জামু ইবনু আসাকির-১০১৯, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-৫৫৭০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. প্রতিটি দিন জাহান্নামকে উত্তরোত্তর এর দাহ্য ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হয়। শুধু মাত্র জুমআর দিনের সম্মানার্থে এই দিনে জাহান্নামকে তাপ দেয়া হয় না। [১৫৭]

১০. জুমআর রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, যেহেতু সে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। সুবহানাল্লাহ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন মুসলিম ব্যক্তি জুমআর দিনে অথবা জুমআর রাতে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ পাক তাকে কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা দিবেন"। [১৫৮]

জুমআর দিনের বিধান সমূহ ঃ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক, জুমআর দিনকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া। আর সেটা সম্ভব বিভিন্ন এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে। জুমআর দিনের অনেক বিধি-বিধান ও আদব রয়েছে যেগুলো পালন ও রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যথাঃ

১. জুমআর দিনে ফজরের নামাযে ইমাম সাহেব সূরা আস-সাজদাহ ও সূরা আল-ইনসান তিলাওয়াত করবেন যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা' করতেন।

২. জুমআর দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা জুমআর দিনে আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ ও সালাম পেশ করবে, যেহেতু তোমাদের দুরূদ ও সালাম আমার কাছে পেশ করা হয়"। [১৫৯]

৩. জুমআর নামায প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন, বালেগ, মুক্বীম, স্বাধীন, সুস্থ, মুসলমান পুরুষের উপর ফরয।

[১৫৭]. সুনানু আবু দাউদ-১০৮৩, আস-সুনানুস সাগীর লিল-বাইহাকী-৯৩২, যাদুল মাআদ লিইবনুল কাইয়িম-১/৩৮৭, শরহুস সুন্নাহ লিল-বাগবী-৭৭৯।

[১৫৮]. জামে' তিরমিযী-১০৭৪, মুসনাদে আহমদ-৬৫৮২।

[১৫৯]. সুনানু আবু দাউদ-১০৪৭, সুনানু নাসায়ী-১৩৭৪, ইবনু মাজাহ-১০৮৫, মুসাদে আহমদ-১৬১৬২, সুনানু দারেমী-১৬১৩, মুনাদে বাযযার-৩৪৮৫, শআবুল ঈমান-২৭৬৮।

৪. গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা, সবচেয়ে উন্নত সুন্দর কাপড়টি পরিধান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জুমআর দিনের সুন্নাত।

৫. জুমআর দিনে সকাল সকাল জুমআয় চলে আসা মুস্তাহাব বা অধিক সওয়াবের কাজ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃতপ্রায় এই সুন্নাতকে জীবিতকারীকে আল্লাহ বিশেষ রহমত করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন জুমআর দিন আগত হয়, ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় অবস্থান করে আগমনকারীগণের একের পর এক নাম লিখতে থাকেন। যে বা যারা প্রথম সময়ে আগমন করে তাদের উট কুরবানীর সওয়াব লেখা হয়, যে বা যারা এর পরে আগমন করে তাদের গরু কুরবানীর সওয়াব লেখা হয়, আর যারা এর পরবর্তী সময়ে আগমন করে তাদের দুম্বা কুরবানীর সওয়াব লেখা হয়, আর যারা এর পরবর্তী সময়ে আসে তাদের মোরগ দান করার সওয়াব লেখা হয়, আর যারা এর পরবর্তী সময়ে আগমন করে তাদের ডিম সাদকা করার সওয়াব লেখা হয়। অতঃপর ইমাম সাহেব যখন বের হয়ে মিম্বরে বসেন, ফেরেশতাগণ খাতাপত্র বন্ধ করে খোতবা শুনতে বসে পড়েন"। [১৬০]

৬. জুমআর সময় ইমাম খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে উঠা পর্যন্ত মুসল্লীগণ নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আগেকার দিনে আমাদের দেশে জাতীয় মসজিদ সহ মহল্লার জামে মসজিদ সমূহে জুমআর দিনে কুরআন তিলাওয়াতের গুঞ্জন শুনতাম, যা বর্তমানে প্রায় অনুপস্থিত। মক্কা মদীনার পবিত্র হারামাইনে তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে যা দেখলে মন প্রশান্তিতে ভরে যায়।

৭. ইমাম সাহেব খোতবা দেয়ার সময় চুপ থাকা এবং মনোযোগ সহকারে খোতবা শোনা মুসল্লীদের উপর ওয়াজিব। হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১৬০]. সহীহ বুখারী-৯২৯, সহীহ মুসলিম-৮৫০, সুনানু আবু দাউদ-১০৫১, সুনানু নাসায়ী-১৩৮৫, মুসনাদে আহমদ-৭৭৬৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইরশাদ করেছেন, "জুমআর দিনে খোতবা দেয়ার সময় কোন মুসল্লী যদি পার্শ্ববর্তী কাউকে 'চুপ' শব্দ বলে, তাহলে তার জুমআই বৃথা, অপর বর্ণনায় এসেছে, "যে ব্যক্তি এই অনর্থক কাজ করবে তার জুমআ কোন উপকারে আসবে না" আরেক বর্ণনায় এসেছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে তার জুমআ হবে না বরং যুহর হবে"। [১৬১]

৮. জুমআর দিনে সূরা আল-কাহাফ পড়া মুস্তাহাব বা অত্যন্ত ফযীলতের কাজ, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা আল-কাহাফ তিলাওয়াত করবে, পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে"। [১৬২]

৯. জুমআর দিন জুমআর সময় উপস্থিত হওয়ার পরে জুমআর নামাযের পূর্বে সফর করা হারাম। [১৬৩]

১০. পূর্বের অথবা পরের একদিন যোগ করা ছাড়া শুধু মাত্র জুমআর দিন রোযা রাখা এবং জুমআর রাত জেগে ইবাদত করা মাকরূহ। হযরত আবু হুরাইরাহ (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা এককভাবে জুমআর রাতকে জাগ্রত থাকার জন্য নির্ধারিত করো না, আর শুধুমাত্র জুমআর দিনকে রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে পূর্বের অথবা পরে দিন যোগ করলে পারবে"। [১৬৪]

১১. জুমআর নামাযে ইমাম সাহেব সূরা আল-জুমআ ও সূরা আল-মুনাফিকুন অথবা সূরা আল-আ'লা ও সূরা আল-গাশিয়াহ তিলাওয়াত করা সুন্নাত। যেহেতু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর নামাযে প্রায়শ উল্লেখিত সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। [১৬৫]

[১৬১]. সহীহ বুখারী-৯৩৪, সহীহ মুসলিম-৮৫১, সুনানু আবু দাউদ-১০৫১, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ-১৮১০।

[১৬২]. মুসতাদরাকে হাকেম-৩৩৯২, সুনানে দারেমী-৩৪৫০, সুনানে সাগীর লিল-বাইহাকী-৬০৬।

[১৬৩]. যাদুল মাআদ-১/৩৮২।

[১৬৪]. সহীহ বুখারী-১৯৮৫, সহীহ মুসলিম-১১৪৪।

[১৬৫]. সহীহ মুসলিম-৮৭৭, সুনানু আবু দাউদ-১১২২,১১২৩, সুনানে তিরমিযী-৫১৯।

জুমআর আদব সমূহ ঃ

১. কিছুকিছু কিছু মানুষ জুমআতে হাজির হয় না অথবা হাজির হলেও একেবারে গুরুত্বহীনভাবে। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন কওম জুমআ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদের কলবে মোহর মেরে দিবেন, ফলে তারা হয়ে যাবে গাফেল"। [১৬৬]

২. কেউ কেউ জুমআর রাতে অধিক রাত পর্যন্ত জাগার ফলে ফজরের নামায ঘুমে চলে যায়, ফলে তার জুমআর দিন শুরু হয় কবীরা গোনাহর মাধ্যমে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নামায হচ্ছে জুমআর দিনের জামাআতের সাথে ফজরের নামায"। [১৬৭]

৩. কেউ কেউ জুমআর খোতবাকে একেবারেই গুরুত্বহীন মনে করে, ফলে কেউ উপস্থিত হয় খোতবা চলাকালে আবার কেউ কেউ খোতবা শেষ হওয়ার পরে। যা খুবই দুঃখজনক।

৪. আবার কেউ কেউ জুমআয় উপস্থিত হয় একেবারে স্বাভাবিকভাবে, যেন সাধারণ কোন কাজে যাচ্ছে। অফিস আদালতে যাওয়ার সময় নিজেকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করলেও জুমআয় আসে একেবারে সাধারণভাবে যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিনে গোসল করে আতর সুগন্ধি লাগিয়ে, মিসওয়াক করে এবং সর্বোত্তম ড্রেসটি পরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. কুরআনে করীমে সুস্পষ্ট নিষেধ সত্বেও জুমআর আযান দেয়ার পরে অনেকে বেচাকেনায় ব্যস্ত থাকে যা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

[১৬৬]. সহীহ মুসলিম-৮৬৫, সুনানু ইবনু মাযাহ-৭৯৪, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ-১৮৫৫, ত্বাহাবী-৩১৮৬।

[১৬৭]. মুসনাদে বাযযার-১২৭৯, হুলিয়াতুল আউলিয়া-৭/২০৭, শুআবুল ঈমান-২৭৮৩, ফাযায়িলুল আওকাত লিল-বাইহাকী-২৮৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. অধিক পরিচ্ছন্নতার অজুহাতে কেউ কেউ আল্লাহর প্রিয় হাবীবের সুন্নাত দাড়ি সেব করার জন্য বেছে নেয় জুমাবারকে যা আল্লাহর নবীর সাথে চরম বেয়াদবী। প্রকাশ তাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল হিসেবে সালফে সালেহীনগণ হেজামতের জন্য সোমবার ও বৃহস্পতিবারকে নির্দিষ্ট করতেন। অতএব, জুমআর দিনের আদবের আদব রক্ষার্থে হেজামত থেকে বিরত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে বুধবারে হেজামত করলে শ্বেতরোগ হয় বলে ইমাম সুয়ূতী (র.) বুধবারে হেজামত করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৭. কিছু কিছু মানুষ মসজিদের ভিতরে সামনের কাতার পূর্ণ না করে পেছনে বসে যায়, আবার কেউ ভিতরে জায়গা থাকা সত্বেও বারান্দায় বসে পড়ে যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৮. আল্লাহর ঘর মসজিদে ধনী-গরীব ও রাজা-প্রজা সকলের অধিকার সমান হলেও কিছু কিছু লোক পূর্বে বসা লোককে তুচ্ছ মনে করে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসে যায় যা নিষিদ্ধ। হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জুমআর দিনে অপর ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসে না যায়, বরং অপর ভাইকে পাশে জায়গা করে দেয়ার অনুরোধ জানাবে"। [১৬৮]

৯. মুসল্লী ও তিলাওয়াতকারীদের অসুবিধা হয় এমন উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি ও কথা-বার্তা বলা যাবে না।

১০. জুমআর আযানের পরে কোন শরয়ী ওযর ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না।

১১. খতীব খোতবা দেয়ার সময় খোতবা কান পেতে শোনা মুক্তাদিদের উপর ওয়াজিব, আর শোনা না গেলে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

[১৬৮]. সহীহ বুখারী-৯১১, সহীহ মুসলিম-২১৭৮, মুনাদে শাফেয়ী-১/৬৯, মুসনাদে আহমদ-১৪১৪৩।

খতীবগণের প্রতি ঃ

আমাদের দেশে কিছু কিছু জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মানিত খতীবগণকেও অমনোযোগী দেখা যায়, যা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা একান্ত জরুরী ঃ

১. খোতবাকে দীর্ঘ করা এবং নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা। হযরত আম্মার ইবনু ইয়াসির (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নামাযকে দীর্ঘ ও খোতবা সংক্ষিপ্ত করা খতীবের জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ দেয়। অতএব, তোমরা নামাযকে দীর্ঘ কর আর খোতবাকে সংক্ষিপ্ত কর"। [১৬৯]

২. খোতবা দেয়ার জন্য নিজেকে ভালভাবে প্রস্তুত না করা এবং সমকালীন প্রয়োজনীয় বিষয় নির্বাচন না করা।

৩. ভাষাগত ও শব্দগত ভুল ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

৪. খোতবায় মাওযূ হাদীস ও কল্প কাহিনী দিয়ে বক্তব্য রাখা।

৫. দ্বিতীয় খোতবায় শুধুমাত্র দোয়া দিয়ে খোতবা শেষ করা।

৬. খোতবায় কুরআনে করীম ও বিশুদ্ধ হাদীস দিয়ে আলোচনা না করা। হযরত হারেছা বিনতু নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ق و القرآن المجيد সূরাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যবানে মুবারক দিয়ে শুনতে শুনতেই মুখস্ত করে ফেলেছি। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক জুমআর খোতবায় উহা পড়তেন"। [১৭০]

৭. খোতবা দেয়ার সময় আলোচনার বিষয়ের সাথে শারীরিক অবস্থার (Body Language) সমন্বয় না থাকা। যেমন জান্নাতের নেয়ামতের আলোচনায় আনন্দিত না হওয়া আর জাহান্নামের শাস্তির আলোচনার সময় ভীত সন্ত্রস্ত না হওয়া। হযরত জাবের ইবনু

[১৬৯]. সহীহ মুসলিম-৮৬৯, মুসনাদে আহমদ-১৮৩১৭, সহীহ ইবনু হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকেম-৫৬৮৩, শুআবুল ঈমান লিল-বাইহাকী-৪৬৩৫, মু'জামু ইবনু আসাকির-১।

[১৭০]. সহীহ মুসলিম-৮৭৩, সুনানু আবু দাউদ-১১০০, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী-৫৭৭৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আব্দুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দিতেন তখন তাঁর চোখ মুবারক লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ শক্ত হত মনে হত যেন তিনি সৈন্যবাহিনীকে শত্রুবাহিনীর ব্যাপারে শংকিত করছেন" ১৭১

৮. অনেক খতীবকে দেখা যায় অসতর্কতাবশত শিয়াদের অনুসরণে খুতবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্যাগণের মধ্যে কেবলমাত্র কনিষ্ট কণ্যা সৈয়দা ফাতেমা যাহারা (র.) আর নাতি-নাতিনগণের মধ্যে শুধুমাত্র হাসনাইনে করীমাইন (র.) এর নাম উল্লেখ করে থাকেন। রোজ কেয়ামতে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যান্য কন্যাগণ ও নাতি-নাতিনগণ এই বলে অভিযোগ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার শত্রু (শিয়া) কর্তৃক আমাদের স্মরণ না করাই স্বাভাবিক, কিন্তু যারা আপনার আশেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর অনুসারী বলে দাবী করে তারা কোন্ যুক্তিতে আমাদেরকে বাদ দিয়েছে? এর কোন জবাব কি আমাদের কাছে আছে?

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চার কন্যা যথাক্রমে সৈয়দা যয়নব, সৈয়দা রুকাইয়া, সৈয়দা উম্মে কুলসুম এবং সৈয়দা ফাতেমা যাহারা রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিন্না।

৯ আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাতজন নাতি-নাতিনগণ হলেন যথাক্রমে আলী ইবনু যয়নব, উমামা বিনতু যয়নব, আব্দুল্লাহ ইবনু রুকাইয়া, হাসান ইবনু ফাতেমা, হোসাইন ইবনু ফাতেমা, মুহসিন ইবনু ফাতেমা, যয়নব বিনতু ফাতেমা এবং উম্মে কুলসুম বিনতু ফাতেমা রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈন।

জুমার নামাযের বিবরণ:

জুমা ফরযে আইন, নামাযে যোহর হতেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অস্বীকার করলে কাফের হবে। তরক্কারী (বর্জন) মহা পাপী। একাধারে তিন জুমা

১৭১. সহীহ মুসলিম-৮৬৭, সুনানু ইবনু মাজাহ-৪৫, মুসনাদে আবু ইয়া'লা-২১১১, সহীহ ইবনু হিব্বান-১০, সুনানু কুবরা লিল-বাইহাকী-৫৭৫৩।

তরক্ করলে মোনাফেক হিসাবে গণ্য হবে। জুমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয় শর্ত, এর একটিও অপূরণ হলে, জুমা শুদ্ধ হবে না। শর্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১. শহর অথবা স্বনির্ভর বড় গ্রাম হওয়া।
২. রাজা অর্থাৎ মুসলিম রাজা বা তাহার প্রতিনিধি যাকে রাজা জুমা কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন।
৩. ওয়াক্ত হওয়া, যোহরের সময়ই জুমার সময়। যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে কিংবা পরে জুমার নামায পড়লে নামায হবে না।
৪. নামাযে জুমার আগে খোৎবা পড়া, পরে পড়লে নামায হবে না।
৫. ইমাম ব্যতীত অন্ততঃ তিন জন মুক্তাদী নামায শেষ না হওয়া পর্যন্তথাকা, এমন তিন জন মুক্তাদী থাকা চাই, যারা ইমামতী করতে পারেন। যেমন এদের মধ্যে একজন নাবালেগ বা স্ত্রীলোক থাকলে নামায শুদ্ধ হবে না।
৬. জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য মসজিদটি "ইয্নে আম" তথা সর্বজাধারণের জন্য অনুমতি থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রকাশ্য স্থানে নামায হওয়া, সর্বসাধারণের জন্য দার খোলা থাকা, যে কারো ইচ্ছা আসতে কোন বাঁধা না থাকা।

জুমার নামায ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ:

জুমার নামায ফরয হওয়ার জন্য এগার শর্ত, এর একটিও অপূরণ থাকলে জুমা ফরয হবে না। কিন্তু পড়লে আদায় হয়ে যাবে।

১. মুকীম হওয়া। (মোসাফিরের উপর জুমার নামায ফরয নয়)।
২. মুসল্লি সুস্থ হওয়া, রুগ্ন ব্যক্তির উপর জুমা ফরয নয়।
৩. নামাযী স্বাধীন হওয়া, গোলামের উপর জুমা ফরয নয়।
৪. পুরুষ হওয়া, স্ত্রীলোকের উপর জুমা ফরয নয়।
৫. সাবালেগ হওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এর উপর জুমা ফরজ নয়।
৬. সুষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন বা পাগল না হওয়া। আকেল ও বালেগ হওয়া শুধু নামাযে জুমা নয়, বরং প্রত্যেক নামাযের শর্ত।
৭. অন্ধ না হওয়া।
৮. চলার শক্তি থাকা।
৯. কয়েদী জেলখানায় বন্দী না হওয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. ভয় না থাকা। যদি যালেম রাজা, বাদশা ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম রাষ্ট্র নায়ক পরিচালক বা যালেমের অথবা চোর ডাকাতের ভয় থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর জুমা ফরয হবে না।

১১. বৃষ্টি বাদল, বন্যার পানি, শীলাবৃষ্টি ইত্যাদির ভয় না থাকা।

জুমার নামায সংক্রান্ত জ্ঞাতব্যঃ

রুগ্ন ব্যক্তি, মোসাফির বা কয়েদী এভাবে যাদের উপর জুমা ফরয নয়, তারা জুমার দিন শহরে জমাআতের সাথে যোহর পড়া মাকরূহে তাহ্‌রিমী। নামাযে জুমার আগে হউক বা জুমার পরে হউক। তদ্রূপ যারা কারণ বশতঃ নামাযে জুমা না পায়, তারাও আযান, একামত ছাড়া একাকীভাবে যোহরের নামায আদায় করবে। জমাআতের সাথে পড়তে পারবে না।

- ❖ যে রুগ্ন ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত থাকে, সে জুমা পড়তে গেলে তার (রোগীর) অসুবিধা হওয়ার আশংকা থাকে, এবং উক্ত ব্যক্তির অন্য কেউ তত্ত্বাবধায়ক না থাকে, তবে ওই সেবকের উপর জুমা ফরয নয়। [১৭২]
- ❖ চাকর ও মজুরকে নামাযে জুমা পড়তে বাঁধা দিতে পারবে না। অবশ্য জুমা মসজিদ যদি দূরে হয়, যাতায়াতে সময় বেশী ব্যয় হয়, যদি কাজে বেশী ক্ষতি হয়, তার জন্য পারিশ্রমিক হতে কমাতে পারে, এবং তা চাকর ও মজুরকেও মেনে নিতে হবে। [১৭৩]
- ❖ যদি কেহ ইমামকে জুমার নামাযের কাউদা বা শেষ বৈঠকে পায়, সে ইমামের সালামের পর দুই রাকাত জুমার নামায আদায় করবে। হজ্জের সময় মিনায় জুমার নামায আদায় করা যাবে, যদি খলীফা বা মক্কার আমীর গর্ভণর সেখানে উপস্থিত থাকেন। আমীরে হজ্জ জুমা কায়েম করতে পারবে না। অন্য সময়েও জুমা হবে না আরাফাতের মাঠে হজ্জের সময়ে বা অন্য সময়ে কোন অবস্থায় জুমা হবে না। [১৭৪]
- ❖ শহরে একাধিক জায়গায় জুমা পড়া জায়েয। [১৭৫]
- ❖ কিন্তু বিনা প্রয়োজনে বহু জায়গায় জুমা কায়েম না করা উচিত। কেননা জুমা ইসলামের জাতীয় নিশান; এবং বহু জমাআতকে একত্রিত করার

[১৭২]. দুররে মুখতার-২/১৫৩।
[১৭৩]. আলমগিরী-১/১৪৪।
[১৭৪]. আলমগিরী-১/৪৫।
[১৭৫]. দুররে মুখতার-২/১৪৩।

উপায়, অনেক বেশী মসজিদে জুমা কায়েম করা হলে, ইসলামী শান শওকত ও জাকজমকের প্রদর্শন হয় না। যা বহু মহল্লার মসজিদের জমাআতের লোক একত্রিত হয়ে এক বড় মসজিদে জুমা কায়েম করলে প্রদর্শিত ও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া শুধুমাত্র লোকজনের অসুবিধা দূরীভূত করার মানসে একাধিক জায়গায় জুমা জায়েজ রাখা হয়েছে। তবে বিনা প্রয়োজনে জমাআত খন্ড খন্ড করা, প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় জুমা কায়েম না করা চাই।

- ✯ সর্বোপরি জুমা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে দিকে সাধারণের লক্ষ্য রাখা চাই যে: জুমাকে অন্য নামাযের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা হয়, নতুন জুমা কায়েম না করা চাই। যে সে নামাযের খোতবা দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা জুমা কায়েম করা 'বাদশাহে ইসলাম, বা তাহার 'নায়েবের' কাজ, যার বর্ণনা জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার ছয় শর্তাবলীর মধ্যে করা হয়েছে। যেসব দেশে ইসলামী সাল্‌তানাত' না থাকে, সেখানে ওই দেশের আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের সব চাইতে বড় 'ধর্ম শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ' 'পরহেজগার আলেমই' 'আহ্‌কামে শরীয়া জারী' করার বেলায় সোল্‌তানে ইসলামের কায়েম মুকাম (স্থলাভিষিক্ত)। [১৭৬]
- ✯ সুতরাং তিনিই জুমা কায়েম করবেন। তার বিনা অনুমতিতে নামাযে জুমা হতে পারে না। যদি তা সম্ভব না হয়, সর্ব সাধারণভাবে যাকে চায় বা পছন্দ করে: তাঁকেই ইমাম নিয়োগ করবে। [১৭৭]

উপরোল্লেখিত মুত্তাকী 'আলেম' নির্বাচন সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোক যে কাউকেও জুমার ইমাম নিয়োগ দিতে পারেনা। বা এরকম করা যে, কিছু সংখ্যক সাধারণ লোক দলাদলী করে একজন ব্যক্তিকে জুমার ইমাম নিয়োগ দিবে; এ ধরণের জুমার ইমাম নিয়োগ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের বিধি সম্মত নয়। [১৭৮]

- ✯ 'হুজরা' মসজিদ সংলগ্ন থাকলে ইমাম হুজরা হতে বের হওয়ার পর, আর হুজরা না থাকলে খোতবা পড়ার জন্য ইমাম দাঁড়ানোর পর কোন নামায পড়া এবং কথোপকথন করা মাক্‌রূহ্ তাহ্‌রীমী। [১৭৯]

[১৭৬]. দুররে মুখতার-২/১৩৯।
[১৭৭]. প্রাগুক্ত।
[১৭৮]. বাহারে শরীয়ত।
[১৭৯]. আলমগীরী-১/১৪৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

☆ পক্ষান্তরে খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে তাসবীহ ও দোয়া পাঠ করা সহীহ্ (বিশুদ্ধ) মতে মাক্রূহ নয়। কিন্তু খুতবা আরম্ভ করলে সকল প্রকার তসবীহ, দো'আ সালাম কালাম মাকরূহে তাহ্রীমী। যেহেতু খুতবা শুনতে ব্যাঘাত হওয়ার কারণেই মাকরূহ, সুতরাং খুতবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইমাম ও মুসল্লী প্রত্যেককে আযানের জওয়াব দেওয়া, আযানের সময় আঙ্গুলী চুম্বন করে দো'আ পড়া, আযানের পর হাত উঠায়ে 'দো'য়াই ওসীলা' পড়া আসাহ্, আকওয়া, আরজা ও জায়েয। কেননা এখনও খুতবা আরম্ভ হয় নি। এবং খুতবা শুনার ব্যাঘাতও হচ্ছে না। সুতরাং মাকরূহও হবে না বরং জায়েজ। [১৮০]

☆ খুতবা দিতে উঠে খতীব সাহেব মুসল্লীদেরকে সালাম দিবে না। বরং ইহা মাকরূহ। তবে খোতবার আযানের আগে সালাম দিতে পারবে। [১৮১]

☆ খতীব খুতবা দেওয়ার সময় লাঠি হাতে নেওয়া মাক্রূহ। দুররে মুখতারে বলা হয়েছে, وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَّكِئَ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا অর্থাৎ খতীবের জন্য লাঠি ও ধনুকের উপর টেক লাগানো মাকরূহ। [১৮২]

যদিও সুন্নাত হওয়ার রিওয়ায়েত এবং তা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে মসনুন বলা হয়েছিল যা হাদিসের বর্ণনায় ও আছে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মাক্রূহ হওয়া আরজা ও আকওয়া। তাছাড়া উক্ত সুন্নাতের রেওয়ায়েত যুদ্ধ মাঠে বা দারুল হারবের (অমুসলিম রাষ্ট্র) জন্য, দারুল ইসলামের ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিধান পালনে বাধা দেয় না এমন দেশের জন্য নয়। [১৮৩]

☆ খুতবা শুনার সময় নামাযের মত দোজানু (তাশাহ্হুদের বৈঠকের ন্যায়) হয়ে বসবে। [১৮৪]

☆ যখন খুতবা পড়া হয়, উপস্থিত মুসল্লীদের উপর নীরবে শুনা ফরয এবং যারা দূরে থাকে শুনতে না পায়; তাদের উপরও নীরব থাকা ওয়াজিব।

---

[১৮০]. বোখারী, ফায়জুল বারী, মাবসুত, হেদায়া, মাজমাউল আনহার, জাওয়াহারাতুন নাইয়ারা, ওমদাতুর রেআয়া, নেহায়া, সেয়ায়া, এনায়া, বেনায়া, ইত্যাদি।

[১৮১]. কিতাবুল ফিকাহ্ আলা মাজাহেবিল আরবাআ-১/৩৫৮;

[১৮২]. দুররে মুখতার-২/১৬৩, আলমগীরী-১/১৪৮।

[১৮৩]. খোলাছা, ফতোয়া আলমগিরী, ছফরে ছায়াদত, মলফুজাতে আলা হযরত (রহ.), দোররে মোখতার, ইত্যাদি।

[১৮৪]. দুররে মুখতার-২/১৫৯, আলমগীরী-১/১৪৭।

এই অবস্থায় যদি কোন লোককে অন্যায় কথা বলতে দেখে, হাত বা মাথার ইঙ্গিতে বাধা দিবে, মুখে বাধা দেয়া না জায়েয।

□ খতীব যখন খুৎবার মধ্যে মুসলমানদের জন্য দোয়া করেন সামেয়িনরা (শ্রোতারা) হাত উঠানো বা মুখে আমীন বলা নিষেধ। চুপে চুপে আমীন বলবে। হাত উঠায়ে শব্দ করে আমীন বললে গুণাহ্গার হবে। [১৮৫]

☆ তদ্রুপ যখন খতিব নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম নিবে সামেয়িনরা (শ্রোতারা) উচ্চস্বরে দুরূদ শরীফ না পড়ে চুপে চুপে দুরূদ পড়বে। [১৮৬]

☆ এভাবে সাহাবায়ে কেরামের (রিদ.) নাম নিলে উচ্চস্বরে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলবে না। [১৮৭]

❖ জুমার খোতবা ছাড়া অন্যান্য খুতবাও নীরবে শুনা ওয়াজিব। যেমন দুই ঈদের খুতবা নেকাহের খুতবা ইত্যাদি। [১৮৮]

☆ খতীব যখন মিম্বরে বসেন, হাদীস শরীফ মতে তাঁহার সামনে, মিম্বরের পার্শ্বে মুয়াজ্জিন আযানে সানি দেবেন। হাদীসে বর্ণিত ইবারত 'বাইনা ইদাইয়েল খতিব' এবং 'বাইনা ইদায়েল মিম্বার' 'বাইনা ইদাই' এর অর্থ সকল মুহাদ্দেসিন ও ফকিহ্গণ সামনে এবং পার্শ্বে অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন; আর 'ইয়াদুন' মানে হাত, হাত বলতে শরীরের সাথে সংযুক্তকেই বুঝায়। অর্থাৎ মিম্বরের সাথে লাগিয়েই দাঁড়াতে হবে। মুয়াজ্জিন মসজিদের দরজায় নয়। ইদায়েল খতিবে মানে মিম্বরের সামনেই। সুতরাং মিম্বর এবং খতিবের সামনে এবং কাছেই আযান দিতে হবে। [১৮৯]

জুমুয়ার ছানী আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বরের নিকটে ও ইমামের সম্মুখে দেয়া সম্পর্কিত দলীল

জুমআর ছানী আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বরের নিকটে ও ইমামের সম্মুখে দেয়া হযরাত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এর ইজমা তথা ইজমায়ে আযীমত দ্বারা প্রমাণিত এবং "ছানী আযান" মসজিদের ভিতরে,

---

[১৮৫]. দুররে মুখতার-২/১৫৮;

[১৮৬]. প্রাগুক্ত।

[১৮৭]. প্রাগুক্ত।

[১৮৮]. প্রাগুক্ত।

[১৮৯]. দুররে মুখতার-২/১৬১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিম্বরের নিকটে খত্বীবের সম্মুখে দেয়াই যে খাছ সুন্নত, নিম্নে বিশ্ব বিখ্যাত, নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য তাফসীর, হাদীছ শরীফের শরাহ্, ফিক্বাহ্ ও ফতওয়ার কিতাব থেকে তাঁর অকাট্ট দলীল সমূহ পেশ করা হলোঃ

১. ইমামুল আম্বিয়া ওয়ার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় একটি মাত্র আযান দেয়া হতো। আর তা দেয়া হতো- যখন তিনি মিম্বরে বসতেন। অতঃপর মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর ইক্বামত দেয়া হতো। অনুরূপ হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব (র.) ও হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব (র.) এর সময়েও একটি মাত্র আযান জারী ছিল। তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওসমান যিন্ নুরাইন (র.) এর খেলাফতকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করলে,তখন তিনি তৃতীয় আরেকটি আযান (বর্তমানের প্রথম আযান) বৃদ্ধি করেন।"[১৯০]

২. ইমামুল আম্বিয়া, হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় জুমুআর দিন পাঁচ ওয়াক্ত আযানের ন্যায় একটি মাত্র আযানই প্রচলিত ছিল, যা হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসার পর দেয়া হতো। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব (র.) ও হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব (র.) এর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অতঃপর হযরত ওসমান যিন নুরাইন (র.) মদীনায় দ্বিতীয় আরেকটি আযান বৃদ্ধি করেন এবং দ্বিতীয় আযানটি অর্থাৎ মিনারের আযানের পর ইমামের সম্মুখে,মিম্বরের নিকট প্রথম আযান দেয়া শুরু করেন।"[১৯১]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় একটিমাত্র আযান প্রচলিত ছিল, যা তিনি মিম্বরে বসার পর দেয়া হত। অতঃপর যখন তিনি মিম্বর হতে নামাযের জন্য দাঁড়াতেন,তখন নামাযের জন্য ইক্বামত দেয়া হতো। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব (র.) ও হযরত ওমর

[১৯০]. আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস-৫/৩৩৬।
[১৯১]. আহকামুল কুরআন লিল-কুরতুবী-১৮/১০০।

ইবনুল খত্তাব (র.) এর খেলাফতকাল পর্যন্ত একটিমাত্র আযানই প্রচলিত ছিল। হযরত ওছমান (র.) খিলাফতে আসীন হবার পর জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে দ্বিতীয় আরেকটি আযান (বর্তমানে প্রথম আযান) বৃদ্ধি করেন,অতঃপর প্রথম আযানটি "যাওরা" নামক স্থানে দেয়ার হুকুম দেন ও দ্বিতীয় আযানটি মিম্বরে বসার পর মিম্বরের সম্মুখে দেয়ার আদেশ দেন।"[১৯২]

৪."নুদিয়া" দ্বারা মিম্বরের নিকটে,খতীবের সম্মুখে,যে আযান দেয়া হয় তাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এ আযানটিই রসূলে পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার যামানায় ছিল। অপর আযানটি হযরত ওসমান (র.) এর সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে।"[১৯৩]

৫. যখন জুমুআর দিন নামাযের জন্য ইমাম মিম্বরে বসার পর মুয়াজ্জিন তার সম্মুখে বা সন্নিকটে আযান দিবে,তখন তোমরা বেচা-কেনা বন্ধ করে দাও এবং ইমামের খুৎবা শুনার জন্য ধাবমান হও।[১৯৪]

৬. ছানী আযান খুৎবার পূর্বে মিম্বরের সম্মুখে হবে এবং তৃতীয় আযান যা মিনারার উপর দেয়া হতো। তৃতীয় এজন্য বলা হয়,কারণ ইক্বামতকেও আযান বলা হয়। মূলতঃ ওটাই প্রথম আযান।[১৯৫]

৭. আয়াতে করীমায় "নুদিয়া" দ্বারা ঐ আযানকেই বুঝানো হয়েছে, যে আযান আয়াত শরীফ নাযিল হবার সময় ছিল অর্থাৎ বর্তমানে যে আযান ইমামের সামনে দেয়া হয়। কেননা এর পূর্বে যে আযান দেয়া হয়, তা হযরত

[১৯২]. তাফসীরে রুহুল মা'আনী-১৪/৯৮।
[১৯৩]. হাশিয়াতুশ শারকাভী-১/২৬০।
[১৯৪]. তাফসীরুল মুরাগী-১০/১০৩।
[১৯৫]. তাফসীরে মাযহারী-১৩/২৮১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওসমমান যিন নুরাইন (র.) এর সময় হযরাত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এর ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়।"[১১৬]

৮. হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব (র.) বাজারে আযান দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন যাতে করে মুসল্লীগণ বাজার হতে এসে নামায আদায় করতে পারেন। অতঃপর মুসল্লীগণ একত্রিত হলে মসজিদের ভিতর আযান (ইক্বামত) দেয়া হতো। অতঃপর হযরত ওসমান (র.) মসজিদের ভিতরে দু'টি আযানের প্রচলন করেন। এটার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, খতীবের সামনের আযান অর্থাৎ ছানী আযান মসজিদের ভিতরে দেয়ার নিয়ম হযরত উছমান যিন নুরাইন আলাইহিস সালামই জারী করেন। [১১৭]

৯. সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব আলাইহিস সালাম উনার খিলাফতকাল পর্যন্ত জুমুয়ার নামাযে অন্যান্য নামাযের আযানের ন্যায় একটি মাত্র আযানই প্রচলিত ছিল। অতঃপর হযরত ওসমান যিন নুরাইন (র.) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মদীনায় অবস্থিত 'যাওরা' নামক স্থানে দ্বিতীয় আরেকটি আযান (বর্তমানের প্রথম আযান) বৃদ্ধি করেন এবং মিনারার আযানের পর,প্রথম আযানটি (বর্তমানের দ্বিতীয় আযান) মিম্বরের নিকটে ইমামের সম্মুখে দেয়া শুরু করেন।" [১১৮]

১০. إذا نودي দ্বারা জুমুয়ার দিন খতীব ও মিম্বরের সামনে যে আযান দেয়া হয়, তাই উদ্দেশ্য। কেননা বর্তমানের প্রথম আযান হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় প্রচলিত ছিল না। ওটা হযরত ওসমান যিন নুরাইন (র.) এর খিলাফতকালে লোকসংখ্যার আধিক্য ও কাজ-কর্মের ব্যস্ততার কারণে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম

[১১৬]. তাফসীরে ওসমানী-২৮/৭১৮।
[১১৭]. তাফসীরে সিরাজুন মুনীর-৪/২৮৫।
[১১৮]. আহকামুল কুরআন লিশ-শফী-৬০-৬১।

উনাদের পরামর্শক্রমে বৃদ্ধি করা হয় এবং ওটা 'যাওরা' নামক স্থানে দেয়া হতো। যেহেতু এটার উপর হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এটা সুন্নতে খুলফায়ে রাশেদ অর্থাৎ হযরত ওসমান যিন নুরাইন (র.) এর সুন্নত।"[১১৯]

উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত তাফসীর সমূহের বর্ণনা দ্বারা সুসম্পষ্ট ও অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হলো যে, জুমুয়ার ছানী আযানে মসজিদের ভিতরে দেয়ার প্রচলন হযরত ওসমান যিন নুরাইন (র.) নিজেই করেছেন এবং এর উপর হযরত সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের ইজমা তথা ইজমায়ে আযীমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব ছানী আযান মসজিদের ভিতরে,মিম্বরের নিকটে দেয়াই ইজমা সম্মত।

লা-মাযহাবীদের দলীল খণ্ডন

উল্লেখ্য যে, আহলে হাদীস নামক লা-মাযহাবী গাইরে মুকাললেদীনরা আবু দাউদ শরীফের যে হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে তা হচ্ছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

উল্লেখিত হাদীসটি রিওয়াতান ও দিরায়াতান অর্থাৎ সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ। যেহেতু সনদের মধ্যে উল্লেখিত মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহ.) إنه كذاب (সে মিথ্যুক) إنه دجال من الدجاجلة (সে দাজ্জালদের মধ্যে একজন দাজ্জাল) বলে অভিহিত করেছেন। [200]

[১১৯]. তাফসীরে কামালাইন-৪/৭৭।
[২০০]. আল-কামিল ফী দ্বুয়াফায়ির রিজাল-৭/২৫৫, তারীখে বাগদাদ-১/২৩৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যদিকে হাদীসের মতনের মধ্যেও চরম জটিলতা রয়েছে। যেহেতু হাদীসের ইবারতের মধ্যে كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে আযান দেয়া হত) আবার عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ (মসজিদের দরজায়)। এই বিপরীতমুখী দুটি বাক্যকে কোন রকমেই মিলানো যায়না। এর পরে আবার وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ বলা হয়েছে যা আরবী ব্যাকরণগতভাবে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এখন কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি কি রিওয়াতান ও দিরায়াতান প্রশ্নবিদ্ধ একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরো ইজমায়ে সাহাবাকে অস্বীকার করতে পারে?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

মুহতারাম পাঠক খেদমতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা উচিত মনে করছি যে, পঞ্চাশের দশকে আমাদের চট্টগ্রামস্থ ষোল শহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসায় এক জুমাবারে অনুষ্ঠিত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন জামেয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা নসরুল্লাহ খান (রহ.)। সালাতে জুমায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন শাইখুল হাদীস বাহরুল উলুম জামেউল মা'কুল ওয়াল মানকুল আল্লামা মুহাম্মদ ফুরক্বান সাহেব (রহ.) ও জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা রাহবুরে শরীয়ত ও তরীকত পীরে কামেল আল্লামা ছৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি পেশোয়ারী সাহেব কেবলা (রহ.)।

খুতবা দেয়ার সময় হলে মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদের দরজায় আযানে সানী দেয়া শুরু করলে হুঙ্কার দিয়ে গর্জে উঠেন মুর্শিদুনাল মুকাররম ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)। তাৎক্ষণিক মুয়াযযিনের আযান বন্ধ হয়ে গেলে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলে গাযিয়ে মিল্লাত মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং এতে শাইখুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ফুরকান সাহেব (র.) এগিয়ে আসেন। গাযিয়ে মিল্লাত জামেয়ার লাইব্রেরী থেকে কিতাবপত্র এনে দীর্ঘক্ষণ ইলমি আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখালেন যে, জুমআর আযানে ছানী

মসজিদের দরজায় নয় বরং খতীবের সামনে ও মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। পরিশেষে খতীবের সামনে মিম্বরের পাশে আযান দেয়ার মাধ্যমে মুহতারাম অধ্যক্ষ (রহ.) জুমআর নামায আদায় করেন এবং এর পরে যথারীতি বার্ষিক মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হয়। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেক আলেম ও মুসল্লী এখনো জীবিত আছেন এবং ঘটনাটি তাঁদের স্মৃতিপটে একনো জ্বলজ্বল করছে। নতুন প্রজন্মের আলেম ওলামা ও সমাজের কল্যাণে এ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এ জন্য করলাম যে, উক্ত মাসআলা নিয়ে সুন্নী ওলামাগণ যেন বিভ্রান্তিতে না ভোগেন।

- আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা পড়া বা খুতবার মধ্যে অন্য ভাষা ব্যবহার করা অথবা খুতবার মধ্যে (দুই খোৎবা পাঠরত অবস্থায়) অন্য ভাষায় অনুবাদ করা মাকরূহে তাহরিমী, সুন্নাতে মুতাওয়ারেসার খেলাফ। ভিন্ন ভাষার জাতিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার অজুহাতে আরবী ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় পড়া যাবে না। তবে খুতবা পাঠের পূর্বে আযানে সানীর আগে ভিন্ন ভাষায় ঐ দিনের খোৎবার মূল বিষয়টি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা বৈধ ও উত্তম।[২০১]

জুমআ ও ঈদের খুতবা আরবীতেই দিতে হবে

আজকাল আমাদের মাঝে ধর্মীয় নানা বিষয় নিয়ে নতুন নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল জুমার খুতবা। জুমার খুতবা আরবিতে না বাংলায়? না যে দেশ সেদেশের ভাষায়? এ বিষয়ে কথিত আহলে হাদীস লা মাজহাবিদের মতামত হল খুতবা আপন আপন মাতৃভাষায় হওয়া বাঞ্চণীয়। অন্যদিকে উম্মতের সকল ওলামায়ে কেরাম একমত খুতবা আরবিতেই দিতে হবে।

যারা খুতবা মাতৃভাষায় বা বাংলায় দেয়ার কথা বলেন তাদের যুক্তি হল খুতবা একটি সাপ্তাহিক বক্তৃতা, এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলিহিসসালাম এর ভাষা আরবি ছিল। তাঁর

[২০১]. মাজমুয়ায়ে ফতোয়ায়ে লাকনভী, বাহারে শরীয়ত, কিরাতুল খুতবা বিগাইরে আরাবিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্ম ও বিচরণক্ষেত্রও ছিল আরব ভূখণ্ড। তাই তিনি আরবিতে খুতবা দিতেন। আমাদের ভাষা বাংলা আমরা বাংলায় খুতবা দেব এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আরবিতে খুতবা দেয়া হলে আমরা এর কিছুই বুঝিনা এতে করে খুতবার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। তাই খুতবা বাংলা ভাষায় হওয়া উচিৎ।

তাদের এসব কথার ভিত্তি হল خطبة শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে যার অর্থ হল বক্তৃতা। যদি আভিধানিক অর্থের মাধ্যমে সবকিছু ঠিক করা যেত তাহলে নামাজ না পড়ে দিনে পাঁচবার নিতম্ব দোলালেই হত। কেননা সালাতের আভিধানিক অর্থ নিতম্ব দোলানো।

খুতবা আরবিতে কেন দিতে হবে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলঃ

১. খুতবা হল যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর যিকির।
২. খুতবা নামজের স্থলাবিষিক্ত।
৩. খুতবা ইসলামের প্রতীক ।
৪. খুতবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই চারটা বিষয় একটু খুলে বলি তাহলে আশা করি বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে।

১. খুতবা সাধারন কোন বক্তৃতা নয় খুতবা হল আল্লাহর যিকির দেখুন কোরানের আয়াত কি বলে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। [২০২]

এই আয়াতের মধ্যকার যিকরুল্লাহ দ্বারা প্রায় সকল মুফাসসিরদের মতে খুতবা উদ্দেশ্য। [২০৩]

[২০২]. সূরা জুমআ-৯
[২০৩]. তাফসিরে রাযি-১/৪৪৬, তাফসিরে রুহুল মাআনি ২৮/১০২, তাফসিরে ইবনে আব্বাস-৯/৪৭১।

হাদিসেও খুতবাকে যিকির হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

যখন ইমাম খুতবা দিতে বের হন তখন ফেরেশতারা এসে যিকির শুনে অর্থাৎ খুতবা শোনে। [২০৪]

ফিকহের কিতাবগুলোতেও খুতবাকে যিকির বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহঃ বলেন কেউ যদি শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলেও খুতবা আদায় হয়ে যাবে। খুতবার মধ্যে যত বড় বক্তৃতাই দেওয়া হোক না কেন সেটা খুতবা হিসেবে গন্য হবেনা যদি তার মধ্যে যিকরুল্লাহ না থাকে। আর যদি যিকরুল্লাহ ছাড়া আর কিছুই না থাকে তাহলেও সেটা খুতবা হিসেবে গন্য হবে। খুতবা যিকির বলেই আমরা দেখি যে ইমাম সাহেবগন খুতবা শুরু করেন আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং শেষ করেন কোরানের আয়াত পড়ে। এসকল আয়াত ও হাদিস থেকে একথাই প্রমান হয় যে খুতবা নিছক কোন বক্তৃতা বিবৃতি নয় বরং খুতবা হল যিকির আর যিকির কোন ভাষায় করবেন সেটা বলাই বাহুল্য।

২. জুমার খুতবাকে দুই রাকাত নামজের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে । হযরত ওমর ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত,

حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ

জুমার নামাজ কে খুতবার জন্য ছোট করে দেওয়া হয়েছে। [২০৫]

كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

অর্থাৎ- জুমার নামাজ চার রাকাত ছিল অতঃপর খুতবাকে দুই রাকাতের স্থলাবিসিক্ত করা হয়েছে। [২০৬]

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র.) কর্তৃক অপর বর্ণনায় এসেছে,

«إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

[২০৪]. সহীহ বুখারি-৮৮১, সহীহ মুসলিম-৮৫০
[২০৫]. ইবনে হাজার আসকালানি তালখিসুল হাবির ২/১৭৬।
[২০৬]. সুনানুল বাইহাকি-৫২৫৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ কুজআর নামাযে খুতবাকে দু'রাকাআত নামাযের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি খুতবা পায়নি সে যেন চার রাকাআতই আদায় করে নেয়। [২০৭]

অতএব, প্রমাণিত যে, জুমআর নামাজ চার রাকাআত ফরজের স্থলে দুই রাকাত ফরজ রাখা হয়েছে আর দুই রাকাতের জায়গায় খুতবাকে রাখা হয়েছে। খুতবা নামাজের মত বলেই আমরা দেখি যে, খুতবার আগে আযান দেওয়া হয়, খুতবা চলা কালে কথাবার্তা এমনকি নামাজ পড়াও নিষেধ। যা নামাজের মধ্যেও নিষেধ। এছাড়াও আরও অনেক বিধান রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় খুতবা নামজের মত। অথচ সাধারন বক্তৃতা লেকচারের ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো প্রযোজ্য নয়। খুতবার জন্য এসকল বিধিবিধান ও নির্দেশনাবলী একথাই প্রমান করে যে খুতবা একটা গুরুত্তপুর্ন ইবাদাত, নিছক কোন বক্তৃতা বা লেকচার নয়।

৩. খুতবা ইসলামের একটা প্রতীক

অর্থাৎ আযান, ইকামাত, নামায, তাকবির এগুলো যেমন ইসলামের প্রতীক তেমনি খুতবাও একটি প্রতীক । আযান ইকামাত যেমন অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না তেমনি খুতবাও অন্য ভাষায় দেওয়া যাবেনা। আজকে খুতবা বাংলায় দেওয়ার দাবী উঠছে কাল নামাজ বাংলায় করার দাবী উঠবে। উঠবে কি উঠেছে।

আরবি ভাষা মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা এ ভাষা শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া। কারন কোরআন হাদিস বোঝা আমাদের কর্তব্য। কোরআন হাদিস বোঝার জন্য আরবি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই আরবি শেখার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরবিতে খুতবা দেওয়া হয় । একজন আরবি না জানা ব্যাক্তির সামনে যখন প্রতি সপ্তাহে আরবিতে খুতবা দেওয়া হবে তখন তার সামনে নিজের অক্ষমতাটা বারবার স্পষ্ট হয়ে ধরা পরবে যা তাকে আরবি শিখতে উৎসাহিত করবে।

[২০৭]. মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৫৩২৪।

মসজিদের বিবরণ

মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা ঃ

মানুষের জীবনে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম, মসজিদের অবস্থান আল্লাহ পাকের কাছে অনেক উপরে, এর সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় নিম্নে উলেখ করছি।

১. মসজিদ আলাহ তাআলার ঘর, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেনড়

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

অর্থাৎ "কোন সম্প্রদায় যখন আলাহর ঘর সমূহের মধ্য থেকে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, পরস্পরকে শিক্ষা দেয়, তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে আল্লাহর রহমতে আচ্ছাদিত করে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে আচ্ছাদিত করেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর মুকাররেবীন ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের স্মরণ করেন। [২০৮]

মহান আলাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.

অর্থাৎ "এবং এই যে মসজিদসমূহ আলাহরই জন্য। সুতরাং আলাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। [২০৯]

উলামায়ে কেরাম বলেন : উল্লেখিত হাদীস ও আয়াতে মসজিদকে আলাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উলেখ করার মাধ্যমে মূলত মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

২. মসজিদ পৃথিবীতে সর্বোত্তম জায়গা এবং আলাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন—

"أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا"

"আলাহর নিকট সর্বোত্তম জায়গা মসজিদ এবং সর্ব-নিকৃষ্ট জায়গা বাজার।" [২১০]

[২০৮]. সুনানে আবি দাউদ-১৪৫৫।
[২০৯]. সূরা আল-জ্বিন-১৮।
[২১০]. সহীহ মুসলিম-৬৭১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মসজিদ ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি ফরজ নামাজ আদায়ের স্থান ।

৪. মসজিদ মুসলমানদের সমবেত হওয়া , পরিচয় লাভ করা এবং সম্পর্ক তৈরি করার স্থান। সেখানে কোরআন পাঠের ক্লাস হয় এবং জ্ঞান-শিক্ষার পাঠ দান করা হয়।

৫. মসজিদের গুরুত্ব এবং মর্যাদার আরো একটি প্রমাণ হল, রাসূল সাল-ালাহু আলাইহি ওয়াসালাম হিজরত করার পর সর্বপ্রথম মসজিদ বানানোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আর মদিনাতে আগমনের পর সেটাই তার সর্বপ্রথম কাজ।

মসজিদ আবাদ করার ফজিলতঃ

মসজিদ আবাদ দুই প্রকার:

(ক) বাহ্যিক আবাদ তথা নির্মাণ করা, আর এর অনেক ফজিলত রয়েছে। আলাহর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة.

অর্থাৎ "যে আলাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরি করবে, আলাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করে দেবেন"। [২১১]

হাদীসে সঠিক নিয়তে মসজিদ নির্মাণকারীর জন্যে জান্নাতে প্রবেশের শুভ সংবাদ আছে। কারণ জান্নাতে আলাহ তাআলার ঘর নির্মাণ করাই প্রমাণ করে যে সে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে।

(খ) এতো গেল বাহ্যিকভাবে মসজিদ আবাদের কথা। মসজিদ আবাদের আরেকটি দিক রয়েছে যা প্রকৃত অর্থে আবাদ করা ,আর সেটি এভাবে যে, সেখানে নামাজ পড়া, জিকির করা, কোরআন তেলাওয়াত করা এবং অন্যান্য এবাদত করা ; এর জন্য অগণিত পুরস্কার আছে মর্মে বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যেমন রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন :

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ

অর্থাৎ "যে সকাল বিকাল মসজিদে গমনাগমন করবে, প্রত্যেকবার যাতায়াতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করবেন"। [২১২]

[২১১]. জামে' তিরমিযী-২৯২।

আবাদের উভয় দিক শা'মিল হয় আলাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী: এরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

নি:সন্দেহে তারাই তো আলাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আলাহ ও আখেরাতের প্রতি এবং সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আলাহ ব্যতীত অন্য কাউকেই ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [২১৩]

মসজিদের জন্য অমুসলিমের দানের বিধানঃ

উল্লেখ্য যে, মসজিদ নির্মাণ বা মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন অমুসলিমের দান গ্রহণ করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

অর্থাৎ- "কোন মুশরিকের উচিত নয় আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করা, নিজেদেরকে কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা অবস্থায়। তাদের যাবতীয় আমল সমূহ বাতিল এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী" [২১৪]

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকাহর কিতাব বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وَإِنْ كَانَ شَيْئًا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ عِنْدَهُمْ بِأَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، أَوْ أَوْصَى أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ- অমুসলিম যদি এমন বিষয়ের অসিয়ত করে যা আমাদের নিকট পুণ্যের কাজ কিন্তু তাদের নিকট পুণ্যের কাজ নয়, যেমন তাদের কেউ যদি তার পক্ষ

[২১১]. সহীহ বুখারী-৬৬২।
[২১৩]. সূরা আত-তাওবাহ-১৮।
[২১৪]. সূরা আত-তাওবা-১৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে হজ্ব করার বা মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করার অসিয়ত করে, তাহলে সকল ফুকহায়ে কেরামের মতে তা অবৈধ। কেননা অমুসলিমরা পরস্পর কল্যাণের উদ্দেশ্যে উপরুক্ত কাজগুলো করেনা। [২১৫]

উল্লেখ্য যে, মসজিদের জন্য নির্মিত দানবাক্স যদি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং সেখানে যদি মুসলমাদের অনুরূপ অমুসলিমরাও যদি দান করে থাকে তাহলে সেই দান বাক্সের আয়কে ভাগ করে মুসলমানদের আয়কে মূল মসজিদের কাজে ব্যয় করতে হবে আর অমুসলিমের দানকে মূল মসজিদের কাজে ব্যয় না করে আনুষঙ্গিক যেমন বাথরুম, টয়লেট ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে হবে।

মসজিদ সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় বিধানাবলী:

মসজিদের অনেক আদব ও বিধান রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উলেখ করা হল :

১. মসজিদকে নামাজির মনোযোগ নষ্ট হয় এবং প্রতিযোগিতা ও অহংকারের দরজা খুলে যায় এমন কোন কারুকার্য বা সাজ-সজ্জা করা যাবেনা। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন, আমাকে মসজিদ সাজাতে নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইবনে আব্বাস বলেন, তারা অবশ্যই মসজিদসমূহ সাজাবে, যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সাজাতো।

ইমাম বোখারি (রহ.) বলেন, হযরত ওমর (র.) মসজিদ বানাতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি মানুষকে বৃষ্টি থেকে হেফাজত করছি। সাবধান! লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করবে না। মানুষ ধাঁধাঁয় পড়ে যাবে। হযরত আনাস (র.) বলেন, মসজিদ নিয়ে মানুষ গর্ব ও প্রতিযোগিতা করবে, কিন্তু খুব কম লোকই মসজিদ আবাদ করবে।

২. কবরের উপর মসজিদ তৈরি করা কিংবা মসজিদে কবর বানানো হারাম। কেননা এর মাধ্যমে শিরকের রাস্তা তৈরি করে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এরশাদ করেন:

«لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

[২১৫]. বাদায়েউস সানায়ে-৭/৩৪১।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর আলাহ তাআলার অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। [২১৬]

হযরত জুন্দুব (র.) রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওয়াফাতের পূর্বে পাঁচটি অসিয়ত শুনেছেন, তিনি রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলতে শুনেছেন:—

وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

অর্থাৎ "তোমাদের পূর্ববর্তীরা নবী ও সৎ লোকদের কবরকে মসজিদ বানাতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি"। [২১৭]

উল্লেখ্য যে, কবর বা কবরস্থান যদি এত পুরাতন হয়ে যায় যে, কবরস্থ ব্যক্তির হাড়গুড় মাটির সাথে মিশে যায় এবং সেখানে মইয়্যেতের কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে তাহলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা বা নির্মিত মসজিদ সম্প্রসারণে কোন অসুবিধা নাই।

শাইখ যাইলায়ী হানাফী (র.) تبيين الحقائق গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

وَلَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ "যদি কবর পুরাতন হয়ে মৃত ব্যক্তি মাটির সাথে মিশে যায়, তাহলেই শুধু সেখানে অপর মইয়্যত দাফন করা, সেখানে ক্ষেত-খামার করা এবং গৃহ নির্মাণ করা জায়েয"। [২১৮]

আল্লামা কাযী বায়যাভী (র.) বলেন,

كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، فقد اتخذوها أوثانا، فلذلك لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح، أو صلى في مقبرة --- فلا حرج عليه، ألا ترى أن مرقد إسماعيل - عليه السلام - في المسجد الحرام عند

[২১৬]. সহীহ বুখারী-১৩৩০।
[২১৭]. সহীহ মুসলিম-৫৩২।
[২১৮]. তাবয়ীনুল হাকায়েক-১/২৪৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

الحطيم ، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا

অর্থাৎ "ইহুদী নাসারারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদা করত, কেবলা মানত, কবরকে সম্মুখে নিয়ে সালাত আদায় করত এবং তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করত। আর তাই তাদের লানত দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের মত আচরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় সৎ ব্যক্তির কবরের পাশে নামায আদায়ে বা কবরস্থানে নামায আদায়ে কোন অসুবিধা নাই। আপনি কি জানেন না? হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কবর মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে পবিত্র হাত্বীম এর পাশে অবস্থিত। অথচ মসজিদে হারাম হচ্ছে সালাতের জন্য সর্বোত্তম স্থান। আর পবিত্র হাত্বীমের পাশে হাজরে আসওয়াদ ও যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) এর কবর রয়েছে।[২১৯]

৩. মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা। অপবিত্র করা বা কষ্টদায়ক জিনিস সেখানে রাখা হারাম। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন—

«اَلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

অর্থাৎ "মসজিদে থুতু ফেলা অন্যায়, তার কাফ্ফারা হল পুতে ফেলা।"[২২০]

পুতে ফেলা সম্ভব না হলে, অন্যভাবে পরিষ্কার করতে হবে। যেমন, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম মসজিদের দেয়াল থেকে থুতু সরিয়ে ফেলেছিলেন।

৪. মসজিদে নম্রতা ও স্থিরতার সাথে যাওয়া। তাড়াতাড়ি বা দৌড়িয়ে না যাওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এরশাদ করেনড়

«فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

[২১৯]. মিরকাতুল মাফাতীহ-২/৬০১. শরহুয যারকানী আলাল মুয়াত্তা-৪/৩৬৭।
[২২০]. সহীহ বুখারী-৪১৫।

অর্থাৎ "যখন তোমরা নামাজে আসবে অবশ্যই ধীর-স্থিরতার সাথে আসবে। যতটুকু পাবে, আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে, পূর্ণ করবে।[২২১]

৫. মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বাম পা দিয়ে বের হওয়া। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন—সুন্নত হল যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যখন বের হবে বাম পা দিয়ে বের হবে।

৬.মসজিদে আগে আগে যাওয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার প্রতি আগ্রহী থাকা—রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন—

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

অর্থাৎ "যদি মানুষ জানতে পারত, আজান দেয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার মাঝে কি আছে, আর লটারি ব্যতীত সেটি পাওয়া সম্ভব হত না, তাহলে অবশ্যই তার জন্য লটারির ব্যবস্থা করত। এবং যদি জানতে পারত মসজিদে আগে আসার মাঝে কি ফজিলত আছে, তাহলে তার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত"।[২২২]

আর যিনি মসজিদে আগে আসবেন, কোন কারণ ছাড়া তার প্রথম কাতার বাদ দিয়ে পিছনে বসা উচিত নয়। আর যে ব্যক্তি আগে আসল এবং কোন ওজর ব্যতীতই প্রথম কাতার ছাড়া অন্য জায়গায় বসল, সে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করল। পিছনে হটে থাকার দরুন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন—

«تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ»

[২২১]. সহীহ বুখারী-৬৩৫।
[২২২]. সহীহ বুখারী-৬১৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ "তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও এবং আমার এক্তেদা কর। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের এক্তেদা করবে। একটি সম্প্রদায় সব সময় পিছনে থাকবে এক পর্যায়ে আলাহ তাআলা তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেবেন। [২২৩]

মসজিদে আগে আসার মাঝে অনেক উপকার। যথা—জামাতের শুরু থেকে অংশগ্রহণ, কোরআন পড়ার সুযোগ, নফল আদায় করার সুযোগ, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমার দোয়া করতে থাকে।যতক্ষন নামাজের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষন নামাজরত আছে বলে ধরা হবে এবং প্রথম কাতার পাওয়া—ইত্যাদি।

৭.মসজিদে প্রবেশকারী দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় ব্যতীত বসবে না। আবু কাতাদাহ আনসারী রা. বলেন, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বেই যেন দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়"। [২২৪]

৮. মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা, নামাজি বা তেলাওয়াতকারীকে বিরক্ত করা মাকরূহ। চাই তা সাধারণ কথা হোক বা উচ্চস্বরে কোরআর পাঠ করা হোক। পাশের লোককে কষ্ট দেয়া নিষেধ। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন,

«إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ»

অর্থাৎ "নামাজি ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। তার খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কি বলছে। তোমরা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে একে অন্যের উপর শব্দ কর না"। [২২৫]

[২২৩]. সহীহ মুসলিম-৪৩৮।
[২২৪]. সহীহ বুখারী-৪৪৪।
[২২৫]. মুয়াত্তা মালেক-২৯।

৯. মুক্তাদী সর্বদা ইমামের অনুসরণ করবে, প্রত্যেক আমল তার পর পরই সাথে সাথে আদায় করবে। ইমামের আদায়ের আগে করবে না, সাথেও করবে না। আবার ইমাম থেকে অনেক দেরিতেও না। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ

"অর্থাৎ "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর অনুসরণের জন্য, তোমরা তার সাথে বিরোধ কর না। তিনি যখন আলাহু আকবার বলবেন, তখন তোমরা আলাহু আকবার বলবে, আর যখন রুকু করবেন, তোমরা রুকু করবে, যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবেন, তোমরা رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ বলবে, যখন সেজদা করবেন, তোমরা সেজদা করবে, যখন তিনি বসে নামাজ আদায় করবেন তখন তোমরা সবাই বসে নামাজ আদায় করবে, তোমরা নামাযের কাতারকে সোজা করবে, কেননা কাতার সোজা করাটা হচ্ছে নামাযের সৌন্দর্য"। [২২৬]

ইমামের পূর্বে কোন কাজ করা হারাম হওয়া সম্পর্কে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নামাজে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় তার কি ভয় হয় না যে, আলাহ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথা বানিয়ে দেবেন"। [২২৭]

মসজিদ স্থানান্তর সম্পর্কে জরুরী মাসআলাঃ

প্রকাশ থাকে যে, যে স্থানে একবার মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত সে স্থান মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত থাকবে। সে স্থান অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। নদী ভাঙ্গন অথবা মুসলিম এলাকা ধ্বংস

[২২৬]. সহীহ বুখারী-৭২২।
[২২৭]. জামে' তিরমিযী-৫৮২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হওয়া জাতীয় কোনও প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তর করা হলেও প্রথম স্থানটি মসজিদ হিসেবে বিবেচিত থাকবে। সেটার ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান ও উত্তকরাধিকার ইত্যাদি তা কেয়ামত অবৈধ। কেননা সেটা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে, যাতে কারো কোন ধরণের হস্তক্ষেপ চলেনা।

হাদীস শরীফে এসেছে,

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ

অর্থাৎ "এর মূল বিক্রি করা যায়না, ক্রয় করাও যায়না, উত্তরাধিরও প্রতিষ্ঠা হয়না এবং দানপত্রও করা যায়না। [২২৮]

উল্লেখ্য যে, মসজিদ স্থানান্তর বা সম্প্রসারণের নামে পূর্বমসজিদকে ফোরকানিয়া মাদরাসা বা ইমামের হুজরা বা মসজিদের গোডাউন, ওযুখানা, পার্কিং ইত্যাদি বানানো বা খালী ফেলে রাখা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। পূর্বতন ঐ মসজিদকে বা কায়েদা নামাজ ও জামাআতের মাধ্যমে আবাদ রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই নতুন মসজিদ নির্মাণ করে পূর্বতন মসজিদ বন্ধ করা যাবেনা। পূর্বতন মসজিদ বন্ধ রাখা হলে আল্লাহর আদালতে মসজিদ ধ্বংসকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

ই'তিকাফের বিবরণঃ

মাহে রমজানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান বা ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। আরবি ইতিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ অবস্থান করা, স্থির থাকা, কোনো স্থানে আটকে পড়া বা আবদ্ধ হয়ে থাকা।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় রমজান মাসের শেষ দশ দিন অথবা অন্য কোনো দিন জাগতিক কাজকর্ম ও পরিবারপরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে - ইবাদতের নিয়তে মসজিদে বা ঘরে নামাজের স্থানে অবস্থান করা ও স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে। ইতিকাফ করার মূল উদ্দেশ্য হলো—মসজিদে বসে আল্লাহর আনুগত্য করা। সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ লাভের আশা করা, সওয়াব অর্জনের আশা করা এবং লাইলাতুল কদর লাভের আশা করা।

[২২৮] . সহীহ মুসলিম-১৬৩২।

প্রতিবছর রমযান মাসের শেষ দশ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিতভাবে মসজিদে ইতিকাফ করতেন। কখনো তা' ছুটে গেলে ঈদের মাস তথা শা'বান মাসে আদায় করতেন। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশক আজীবন ইতিকাফ করতেন। তাঁর ওফাতের পরে উম্মুহাতুল মু'মিনীনগণ ইতিকাফ করতেন। [২২৯]

ইতিকাফের বিধিসম্মত সময় মাহে রমজানের ২০ তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু আগে থেকে শুরু হয় এবং ঈদের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যায়। ইতিকাফকারী পুরুষ রমজান মাসের ২০ তারিখ আসরের নামাজের পর সূর্যাস্তের আগে মসজিদে পৌঁছাবেন এবং মসজিদের কোণে একটি ঘরের মতো পর্দা দিয়ে ঘেরাও করে অবস্থান নেবেন। ঘেরাওকৃত কক্ষে পর্দা এমনভাবে স্থাপন করবেন, যেন প্রয়োজনে জামাতের সময় তা খুলে মুসল্লিদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা করা যায়। এ স্থানে পানাহার ও শয়ন করবেন এবং নিষ্প্রয়োজনে এখান থেকে বের হবেন না। তবে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে অথবা ফরজ গোসল প্রভৃতি কাজে অথবা শরিয়তের প্রয়োজনে যেমন জুমার নামাজ প্রভৃতির জন্য বের হওয়া জায়েজ। কিন্তু প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিকাফের স্থানে ফিরে যেতে হবে। ঈদের চাঁদ দেখা গেলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবেন।

পার্থিব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে মহান আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগের জন্য পুরুষদের মসজিদে এবং নারীদের জন্য গৃহে

[২২৯] . সহীহ বুখারী-২০২৬, সহীহ মুসলিম-১১৭২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থান করাই ইতিকাফ। স্ত্রীলোকের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহ। ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে, যেখানে তিনি নামাজ আদায় করেন,সেখানেই ইতিকাফ করবেন। বাড়ির নির্দিষ্ট স্থান না থাকলে যেকোনো পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন স্থানে - ইতিকাফ করবেন এবং ঈদের চাঁদ উদয় না হওয়া পর্যন্ত ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করবেন না। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যে কেউ ইতিকাফ করলে সুন্নতে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামের বা পাড়ামহল্লার কেউ ইতিকাফ না - করলে সবাই গুনাহগার হবে।

ইতিকাফকারী একাগ্রচিত্তে ইবাদতবন্দেগির ফলে তার অন্তরে- আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া গভীরভাবে রেখাপাত করে। এ সময় দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আল্লাহর জিকির থেকে দূরে সরাতে পারে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থাৎ 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবে না,যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফে থাকবে।' [২৩৩]

ইতিকাফ পালনকালে যেকোনো ধরনের পার্থিব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামইরশাদ করেছেন, 'ইতিকাফকারী রোগী দেখতে যাবে না, জানাজায় উপস্থিত হবে না, স্ত্রী স্পর্শ করবে না। বিশেষ জরুরি কাজ ব্যতীত বাইরে যাবে না।

রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা সুন্নত এবং এর ফজিলত অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে, তার জন্য দুই হজ ও দুই ওমরার সওয়াব রয়েছে।'

[২৩৩]. সূরা আলবাকারা-,আয়াত ১৮৭।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান:

মু'তাকিফ যদি বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয় তাহলে তার ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য বের হয়, তাহলে ভাঙ্গবে না। বাহক না থাকার কারণে ইতিকাফকারীকে যদি পানাহারের প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয় এরূপ প্রয়োজনেও বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে। যে মসজিদে ইতিকাফ বসেছে, সেখানে জুমআর নামাজের ব্যবস্থা না থাকলে জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। কোন নেকীর কাজ করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। যেমন, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি।

ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা এক রাত বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে। তবে ইতিকাফ দীর্ঘ সময় ধরে করা উত্তম, বিশেষত মাহে রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ অবস্থায় থাকায় 'লাইলাতুল কদর'বা হাজার মাসের শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যের রজনী লাভের সৌভাগ্য হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানে মসজিদে ইতিকাফ করার মাধ্যমে গুনাহের পাপরাশি থেকে বেঁচে থেকে অশেষ নেকি লাভের মোক্ষম সুযোগ দান করুন আমীন।!

দুই ঈদের নামাযের বয়ান:

দুই ঈদের নামায ওয়াজিব। যার উপর জুমা ফরয তার উপর দুই ঈদের নামায ও ওয়াজিব। জুমার জন্য যেসব শর্ত আবশ্যক, ঈদের জন্য ওই সব শর্ত প্রয়োজন। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, সালাতে জুমায় খুতবা শর্ত, আর সারাতে ঈদাইনে খুতবা সুন্নাত। খুতবা ছাড়া সালাতে ঈদান আদায় হলেও সালাতে জুমআ শুদ্ধ হবেনা। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জুমার খুতবা নামাযের আগে, আর ঈদের খুতবা নামাযের পরে। যদি দুই ঈদের খুতবা নামাযের আগে পড়া হয়, দোষ হবে কিন্তু নামায আদায় হয়ে যাবে। দুহ্‌রাতে হবে না। খুতবা ও দুহ্‌রাতে হবে না। দুই ঈদে আযান ও একামত নেই। শুধু দুইবার اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ "আস্‌সালাতু জামেয়াতুন" নামায আরম্ভ হচ্ছে, বলতে পারে। বিনা কারণে ঈদের নামায ছেড়ে দেওয়া 'তরক্ করা' গোমরাহী ও বেদআত। সূর্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্ততঃপক্ষে বার হাত উঠার পর হতে সূর্য ঠিক স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাযের সময় থাকে। কিন্তু ঈদুল ফিতরে দেরী করা আর ঈদুল আযহায় প্রথমার্ধে বা আওয়াল ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। সালাতে ঈদের সালাম ফিরাবার আগে যদি ওয়াক্ত চলে যায়, নামায হবে না ।[২৩১]

যেভাবে সালাতে ঈদ আদায় করতে হয়:

তাক্‌বীরাতে ঈ'দাইন অর্থাৎ ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার নামাযে অতিরিক্ত ছয় তকবীর বলা আবশ্যক।

- ঈদের নামাযের নিয়ত পড়ার পর প্রথম তাকবীর হচ্ছে "তাকবীরে তাহরীমা"। তাই তাকবীর বলার পর অন্যান্য নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে "সানা" পাঠ করতঃ সূরা আল-ফাতিহা ও ক্বিরাআত পাঠের পূর্বে ঈদের তিনটি তাকবীর বলবে, প্রত্যেক তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। ১ম দুই তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবে আর তৃতীয় তকবীরে নামাযের মত হাত বেঁধে নিবে। তার মানে ১ম রাকাতে তকবীরে তাহরীমা সহ ৪টি তাকবীর হবে। অতঃপর 'তাউজ' ও 'তাসমিয়া' পড়ে সুরাতুল ফাতিহা ও কিরাআত পাঠ করবে এবং যথানিয়মে ১ম রাকাআত আদায় করবে। অতঃপর দু'রাকাত বিশিষ্ট এ নামাযের জন্য দাড়াবে এবং দ্বিতীয় রাকাআতের সূরাতুল ফাতিহা ও ক্বিরাআত যথানিয়মে শেষ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পুণঃরায় তিনবার "আল্লাহু আকবর" তাকবীর বলবে। প্রত্যেকবারেই হাত উঠাবে এবং ছেড়ে দিবে, হাত বাঁধবে না। অর্থাৎ তৃতীয় তাকবীর পর্যন্ত হাত উঠাবে কানের লতি পর্যন্ত এবং দু'হাতের তালু ক্বিবলার দিক থাকে মত। অতঃপর হাত ছেড়ে দিবে তৃতীয় তাকবীরে হাত না ছেড়ে নামাযের মত বেঁধে নেবে। তার মানে ঐ তিন তাকবীরই ঈদের তাকবীর হিসাবে বিবেচিত। এভাবে দ্বিতীয় রাকাতে চতুর্থবার আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাবে।[২৩২]

উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক তাকবীর এর মাঝে অন্তত এক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা পরিমাণ দেরী (ফাঁক) বা অপেক্ষা করবে।

- যদি তকবীর সমূহ ছুটে যায় কিংবা কম বা বেশী হয় স্বস্থানে আদায় না হয়ে অন্যস্থানে আদায় হয়, তবে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু বড়

[২৩১]. দুররে মুখতার-২/১৭২, হেদায়া-১/৮৫।
[২৩২]. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/১৫০।

জমাআত হলে ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকলে, দুই ঈদে ও জুমার নামাজে সাহু সেজদা করবে না, এবং নামায ও দোহরাতে হবে না ।[২৩৩]

- ❖ জুমার খুতবার আগে খতীব মিম্বরে বসা সুন্নাত, আর দুই ঈদের খুতবায় না বসা সুন্নাত।
- ফাতওয়ায়ে দুররে মুখতারে এসেছে,

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى) أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ هُوَ السُّنَّةُ وَ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ نُزُولِهِ مِنْ الْمِنْبَرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ

অর্থাৎ- দুই ঈদে খতীবকে প্রথম খুতবার পূর্বে ৯ (নয়) বার, দ্বিতীয় খুতবার আগে ৭ (সাত) বার আর মিম্বার হতে নামার আগে ১৪ (চৌদ্দ) বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবর', বলা সুন্নাত। তবে এ নিয়ম নামাযে জুমাতে নয় ।[২৩৪]

- যদি কেহ ইমামের প্রথম রাকাতের অতিরিক্ত তাকবীর শেষ হওয়ার পর নামাযে শামিল হয়, ওই সময়েই তিন তাকবীর বলে নিবে। যদিও ইমাম ক্বিরাআত আরম্ভ করে থাকেন ।[২৩৫]
- আর যদি ইমাম রুকুতে চলে যান, তবে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পর মুক্তাদির যদি মনে হয় যে, অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাওয়া যাবে, তবে মুসল্লি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে অন্যথায় রুকুতে চলে যাবে এবং রুকুতেই তাকবীর বলবে। কিন্তু রুকুতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না ।[২৩৬]
- যদি তাকবীর বলা শেষ না হতেই ইমাম উঠে যান, তবে ইমামের সঙ্গে উঠে যেতে হবে এবং তাকবীর কাযা করতে হবে না।
- কেউ যদি দ্বিতীয় রাকাতে শামেল হয়, প্রথম রাকাতের অতিরিক্ত তাকবীর তখন না বলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর উঠে ওই রাকাআত ও তাকবীর পুণরায় আদায় করবে।

[২৩৩]. দুররে মুখতার-২/১৭৪।
[২৩৪]. দুররে মুখতার-২/১৭৬, আলমগীরী-১/১৫০।
[২৩৫]. প্রাগুক্ত।
[২৩৬]. প্রাগুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- আর যদি ইমাম রুকু হতে উঠার পর শামেল হয়, তবে তাকবীর তখন না বলে ইমামের সালামের পর উঠে আদায় করবে।
- আর যদি শেষ রাকাতে সালাম ফেরাবার পূর্ব মুহূর্তে শামেল হয়, তবে মুক্তাদীগণ (নুতন নামাযে শামেল ব্যক্তি) তাকবীর সমূহ ইমামের সালাম ফেরানোর পর আদায় করবে।
- যদি কোন কারণবশতঃ (প্রথম দিবসে) ঈদের দিন নামায পড়তে না পারে, যেমন অতিরিক্ত বৃষ্টি বা মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় অথবা চন্দ্র দেখার সাক্ষী এমন সময় পাওয়ার কারণে, যে নামায পড়া সম্ভব হয়নি বা অসংখ্য বাদল ছিল সময়ও চলে গিয়েছে; দ্বিতীয় দিন এসব কারণে নামায পড়া যাবে।
- আর যদি দ্বিতীয় দিনও কোন কারণ বশতঃ পড়া না যায়, ঈদুল ফিতরের নামায তৃতীয় দিন পড়তে পারবে না। উল্লেখ থাকে যে, দ্বিতীয় দিনও নামাযের সময় প্রথম দিনের ন্যায়; যদি বিনা ওজরে ঈদুল ফিতরের নামায না পড়ে, তবে তৃতীয় দিন পড়তে পারবে না। তবে হ্যাঁ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ঈদুল আযহার নামায ওযর বশতঃ মাকরূহ ছাড়া দ্বাদশ তারিখ পর্যন্ত পড়তে পারবে। তারপর আর পড়তে পারবে না। বিনা ওযরে দশ তারিখের পর পড়া মাকরূহ। [২৩৭]
- ঈদের নামাযের পর মোসাফাহা, (করমর্দন) মোয়ানাকা (গলাগলি) করা উত্তম, যাহা সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন আছে এবং ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব নিদর্শন এবং শরিয়ত সমর্থিত। (বাহারে শরীয়ত)

আইয়্যামে তাশরীক:

জিল্‌হজ্বের ৯ (নয়) তারিখ ফজর হতে তের তারিখ আসর পর্যন্তপ্রত্যেক ফরয নামাযের পর, পুরুষ উচ্চস্বরে স্ত্রীলোক চুপে চুপে 'তকবীরে তশরীক' একবার পড়া ওয়াজিব, তিনবার পড়া উত্তম এক নামাযী (মুনফারেদ), ইমাম, মোক্তাদী, নারী, পুরুষ, মুকীম, মুসাফের প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব।[২৩৮]

উপরোক্ত দিবস সমূহের, নামাযে জুমা ও ঈদের পরও (ঈদুল ফিতরে নীরবে, ঈদুল আযহায় উচ্চস্বরে) 'তকবীরে তশরীক' বলবে।[২৩৯]

[২৩৭]. ফাতাওয়া আলমগীরী-১/১৫১, দুরুে মুখতার-২/১৭৬।
[২৩৮]. দুররে মুখতার-২-১৭৯, আলমগীরী-১/১৫২।
[২৩৯]. প্রাগুক্ত।

তকবীরে তশরীক নিম্নরূপ:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদু।

সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকবীর ওয়াজিব, যদি সালামের পর এমন কোন কাজ করা হয় যে আবার উক্ত নামায কায়েম করা যাবে না, তবে তাকবীর আর বলা যাবে না। [২৪০]

- ❖ উভয় ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে ইদগাহে বা ময়দানে পড়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা। বিনা ওযরে মাঠে না পড়ে মসজিদে পড়া মাকরূহ।[২৪১]
- ❖ ঈদের নামাযের আগে বা পরে ঈদগাহে বা ঘরে কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ। একান্ত ঈদের নামাযের পরে ঘরে পড়তে পারে। ঈদের ময়দানে মিম্বার তৈরী করা বা মিম্বার নেয়া, দোষ নহে। [২৪২]

তারাবীহ্ নামাযের বয়ান:

মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানবকে তার ইচ্ছাও মতের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পাপ পূণ্য ইচ্ছা করলে দু'টিই করতে পারে। তবে ফেরেশতারা তা পারেন না। তাদের সে স্বাধীনতা নেই, সেই ক্ষমতাও দেয়া হয়নি। ইচ্ছে করলে ফেরেশতারা পাপ কাজ করতে পারে না। তারা শুধু ইবাদতই করতে জানে। রাব্বুল আলামিনের অবাধ্যতা বরখেলাফ হওয়ার কোন ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই।

আর আল্লাহ জাল্লাশানুহু মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং বান্দার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমাদের উপর আমি কোন নিয়ন্ত্রন অরোপ করবো না। তোমরা পৃথিবীতে স্বাধীন বিচরণ করবে। তবে বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান দিয়ে ভালমন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে সৎ, মহৎ ও ভাল পথটি বেচে নিবে বা এখতিয়ার করবে।

এরই ধারাবাহিকতায় মহান খালেকে কায়েনাত আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁর আপন হাবিবের সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোলামদের

[২৪০]. বাহরে রায়েক-২/১৭৭।
[২৪১]. আলমগীরী-১/১৫০।
[২৪২]. দুররে মুখতার-২/১৬৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য অনেকগুলো সুবিধা দিয়েছেন। যা অন্য নবী রাসুল (আ.)'দের উম্মতদের জন্য দেয়নি। যেমন রোজা, অন্যান্য ইবাদতের সওয়াব নির্ধারিত করে দিলেও রমজানের রোজার বেলায় তা করা হয়নি বরং বলা হয়েছে রোজা আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব। অথবা আমিই এর প্রতিদান। মনে করুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজ হাতে এর প্রতিদান দিলে কি দিবেন এর পরিমাণ করার ক্ষমতা কি কারোর আছে?

তারপরেও রাসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখে এবং এমনিভাবে রাতে ইবাদত করে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়" ২৪৩। আর ঐ রমযানের রাতের ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে "সালাতে তারাবিহ" হাদিসের ভাষায় "ক্বিয়ামু শাহরে রমজান" যার অর্থ হল রমজান মাসের রাত্রিকালীন বা ক্বিয়ামুল লাইল এর নামায তথা তারাবীহ্‌র নামায।

'সালাতে তারাবিহ্' রাকাত নিয়ে ফকিহ গণের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। তার মানে ইসলামে স্বীকৃত চার ইমামের (রা.) মধ্যে একমাত্র হযরত ইমাম মালেক (রা.) ছাড়া সবাই সালাতে তারাবিহ বিশ রাকাআত সুন্নাতে মোয়াক্কাদা বলে রায় দিয়েছেন। এছাড়া সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল গুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে বিশ রাকাত তারাবিহ অতঃপর বিতির পড়তেন। [২৪৪]

তাছাড়া রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা জামাআতে না পড়লেও হযরত আবু যর গিফারি (র.) এর বর্ণিত হাদিসে দেখা যায় যে, তিনি কয়েকদিন তারাবিহ্ নামায জামাতে আদায় করলেও উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে ও ফরয হওয়ার আশংকায় পরে তিনি জামাতে আদায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঐ প্রেক্ষিতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র.) সালাতে তারাবিহের জন্য নিয়মিত জামাত সহকারে আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। [২৪৫]

[২৪৩] . সহীহ মুসলিম-৫৬৯।

[২৪৪] . জামে' তিরমিযী-৮০৬, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৭৬৮০, আল-মুজামুল আওসত-৭৯৮, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৪২৯০।

[২৪৫] . মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৭৬৮২।

তবে সালাতে তারাবিহ্ একা পড়াও জায়েজ। এবং রমজানের ঐ সালাতে তারাবিহ্‌তে ধারাবাহিকভাবে একবার কুরআন করিম পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। [২৪৬]

উল্লেখ্য, বরহক চার মাযহাবের ইমামের মধ্যে একমাত্র ইমাম মালেক (রা.) ছাড়া সবাই সালাতে তারাবিহ ২০ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ বলে রায় দিয়েছেন। হযরত ইমাম মালেক (রা.) রায় দিয়েছেন "সালাতে তারাবিহ্" ৩৬ রাকাআত। [২৪৭]

তার কারণ হচ্ছে চার বরহক ও অনুস্বরণ আবশ্যক ইমামগণের মধ্যে একমাত্র ইমাম মালেক (রা.)-ই ছিলেন আলেম ও ফকিহে মদিনা বা মদিনায়ে পাকেরই অধিবাসী। আর মদিনা বাসিরাও ৩৬ রাকাত "সালাতে তারাবিহ" আদায় করতেন। ফলে ইমাম মালেক (রা.)ও সে মোতাবেক ৩৬ রাকাতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। আর তার একটা যৌক্তিক কারণ এই যে, মক্কাবাসীরা প্রত্যেক দুই তারবিহা'র মাঝে (অর্থাৎ ৮ রাকাত পর) সাতবার তাওয়াফে কাবায়ে মুয়াজ্জামা করতেন এবং দুই রাকাত সালাতে তাওয়াফ আদায় করতেন। [২৪৮]

ফলে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ফকিহ ও আলেমে মদিনা হযরত ইমাম মালেক (রা.) মক্কাবাসীদের পবিত্র কিয়ামে লাইলে (সালাতে তারাবিহের) রমজানের সাথে সাম্যতা ও সমান্তরাল করণে প্রত্যেক তাওয়াফে কাবার বিপরীতে রাকাত নির্ধারণ করে ১৪ বার তাওয়াফ এবং দু'রাকাত নামাযে তাওয়াফ বা সালাতে শোকর মোট ১৬ রাকাত মালেকী মাযহাব অনুসারীদের জন্য জামানায়ে রিসালাত ও খেলাফতের সময় ফারুকে আযম (রা.) কর্তৃক বাজামাতে প্রচলিত ২০ রাকাতের সাথে যোগ করে দিলেন। অতঃপর ২০ রাকাত সালাতে তারাবিহ সাথে যোগ করে ৩৬ রাকাত "সালাতে তারাবিহ" মসনুন হল তাঁর মাযহাবে। মক্কাবাসীর কিয়ামে রমজানের আমল দৃঢ়ধারণ পূর্বক সামঞ্জস্যতাপূর্ণ একটি

[২৪৬] .ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/১১৫।

[২৪৭] . বাদায়েউস সানায়ে'-১/২৮৮।

[২৪৮] . وأهل مكة يطوفون أسبوعا ويصلون ركعتين وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فزادى অর্থাৎ মক্কাবাসীরা দুই তারবীহার মধ্যখানে পবিত্র কা'বাঘর তাওয়াফ করতেন আর দুই রাকাআত নামায পড়তেন। আর মদীনাবাসীরা আলাদা আলাদাভাবে চার রাকাআত নামায পড়তেন। (বাদায়েউস সানায়ে'-১/১১৫)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিদ্ধান্ত ও রায় উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মালেকী মাযহাব অনুসারীদের জন্য উপহার দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি ২০ রাকাত সালাতে তারাবিহ রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন (রি.) এর সুন্নাত ও তাদের কৃত আমল এবং গোটা ইসলামী দুনিয়া এই কথার উপর একমত ও আমল করে আসছেন আজো। [২৪৯]

উল্লেখ্য যে, চার সত্যপন্থি মাযহাবের ব্যাপারে সারা দুনিয়া একমত হলেও বিশেষ করে ইমামে আযম আবু হানিফা (র.) এর অনুসারী ভারতীয় উপমহাদেশে নব্য এক জাহেলিয়াতের নাম হচ্ছে সালাফী বা লা মাযহাবী। আহলে হাদীস নাম দিয়ে তারা শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিবেদ ও দ্বন্দ সৃষ্টি করছে। পবিত্র মাহে রমযানের তারাবীহর নামাযও তাদের আক্রমন থেকে রেহাই পায় নাই। বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাবে তারাবিহর নামায বিশ রাকাআত হিসেবে প্রমাণিত হওয়া সত্বেও তারা ১২ রাকাআত বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক তাদের ভ্রান্তি থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখুন।

প্রকাশ থাকে যে, জামাআতের সাথে তারাবিহ্‌র নামাযে একবার "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" উচ্চস্বরে পড়া (খতমে কুরআনে হাফেজ কুরআন ইমাম কর্তৃক) পুরো কুরআনে করিমার যে কোন এক জায়গায় পড়া বৈধ ও সুন্নাত। কেননা হানাফী মাযহাব মতে যদিও বিসমিল্লাহ সুরাই ফাতেহা বা অন্য কোন সুরার অংশ না কিন্তু এটা একটা আয়াত।

অতএব, খতমে কুরআন পুরো করার জন্য একবার উচ্চস্বরে "বিসমিল্লাহ" পড়া চাই। নয়তো একটি আয়াত বাদ যাবে এবং খতমে কুরআনও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এ ছাড়া সুরা ইখলাসের সাথে না হলেও অন্য কোন সুরাতে হলেও পড়লে খতমে কুরআন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। "মাবসুত" গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে "তাফসিরে মাদারেকে" বর্ণিত আছে যে, "বিছমিল্লাহ" এমন একটি আয়াতে কুরআন যা এক সুরাকে অপর সুরা হতে পার্থক্য করতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমরা হানাফীরা তকমিলে খতমে কুরআন (পূর্ণ খাত্‌মে কুরআনের বেলায়) এর জন্য সালাতে তারাবীহ্‌তে একবার উচ্চস্বরে "বিসমিল্লাহ্" পড়া জায়েজ

[২৪৯]. জামে' তিরমিযী-৮০৬, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৭৬৮০, আল-মুজামুল আওসত-৭৯৮, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৪২৯০।

মাসনুন মনে করি। এজন্য দেখুন গুণিয়াতুল মুসতামলি, তাফসিরে আবিসাউদসহ বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহ।

অতএব, রমযান মাসের প্রত্যেক রাত্রি এশার নামাযের পরপর নারী পুরুষ উভয়ের উপর ২০ রাকাত তারাবীহ্‌র নামায সুন্নাতে মাওয়াক্কাদা। দু'দু রাকাত করে দশ সালামে পড়বে। প্রত্যেক চার রাকাতের পর, চার রাকাত পরিমাণ সময় বসে থাকা মুস্তাহাব। এই বসাকে 'তারবীহা' বলে, যার বহুবচন 'তারাবীহ'। এই বসা অবস্থায় তাসবীহ ও দো'আ মুনাজাত পাঠ করা উত্তম। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব 'বাদায়েউস সানায়ে'তে রয়েছে,

وَمِنْ سُنَّةِ التَّرَاوِيْحِ أَنَّ الْإِمَامَ كُلَّمَا صَلَّى تَرْوِيحَةً قَعَدَ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ قَدْرَ تَرْوِيحَةٍ يُسَبِّحُ، وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُو

অর্থাৎ "তারাবিহ্‌র একটি সুন্নাত হলো ইমাম সাহেব প্রত্যেক দুই তারবীহার মধ্যখানে এক তারবীহা সমপরিমাণ বসবেন এবং তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, দুরূদ-সালাম ও দোয়া করবেন"।[২৫০]

- এই নামায জমাআতের সহিত আদায় করা সুন্নাতে কেফায়া। [২৫১] পূরা মাসে তারাবীর নামাযে একবার কুরআন করীম খতম করা সুন্নাতে মাওয়াক্কাদা। দুই তিনবার পূর্ণাঙ্গ কুরআন করিম সালাতে তারাবিহ্‌তে নূন্যতম খতম করা অতি উত্তম। [২৫২]
  আলস্য বশতঃ কুরআন খতম তরক করা উচিত নহে।
- এশার নামাযের পর হতে সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত তারাবীর ওয়াক্ত থাকে।
- প্রকাশ থাকে যে, সালাতে তারাবিহ্‌তে পূর্ণাঙ্গ কুরআন করীম (খতম) তেলাওয়াত শুনার জন্য হাফেজে কুরআন নিয়োগ করা শুধু রমযান মাসের জন্য; এবং নিয়োগ করার সময় হাদিয়া পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করা অতি পূণ্যময়ী কাজ ও শরিয়ত সম্মত ও বৈধ।
- তারাবীহ্‌র নামাযে ক্বিরাআত ও কোন রোকন আদায় করতে তাড়াতাড়ি করা মাকরূহ। তদ্রুপ তাআউয, তাসমীয়া, তাসবীহ্, 'তাদীলে আরকান, তরক করাও মাকরূহ। যে ব্যক্তি এশার ফরয নামায পড়েনি সে তারাবী

[২৫০]. বাদায়েউস সানায়ে'-১/২৯০।
[২৫১]. আলমগীরী-১/১১৬।
[২৫২]. আল-মুহীত লিস-সারাখসী-১/৪৫৯, আলমগীরী-১/১১৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও বিতির নামায পড়তে পারবে না, যতক্ষণ এশার ফরয ও সুন্নাত আদায় করবে না। [২৫৩]

- নাবালেগের পিছনে নামাযে তারাবীহ্ও দোরস্ত হবে না । তবে কেউ কেউ বৈধ বলেছেন। [২৫৪]
- খতমে তারাবীহ্র মধ্যে তেলাওয়াতে কুরআন করীমের কোন অংশ অসাবধানতাবশতঃ ছুটে গেলে ঐ অংশটুকু ঐ দিনেরই তারাবিহর সাথে বা পরবর্তী দিবসের তারাবিহর নামাযে তেলাওয়াত করে দিবে। এমনিতে ঐ ছুটে যাওয়া অংশ অন্য নামাযে তেলাওয়াত করলে পূর্ণাঙ্গ খতমে কুরআন মজীদ হিসাবে বিবেচিত হবে না। [২৫৫]
- মুক্তাদীর জন্য জায়েজ নয় যে, মুক্তাদী বসে থাকবে, যখন ইমাম রুকু দিতে যাবে, তখন অলস্য বশতঃ দাঁড়াবে। এটি মোনাফেকদের চিহ্ন ও অপরাধ। আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেছেন, "মোনাফেক যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলস্য বদন ও অন্তরে দাঁড়ায়"। [২৫৬]
- দ্বিতীয় রাকাআতে না বসে ভুলে যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তবে, যতক্ষণ তৃতীয় রাকাতের সেজদা না করে থাকে তবে বসে যাবে, আর যদি সেজদা করে বসে, তবে চার রাকাত পুরো করে নেবে, এতে কিন্তু দু'রাকাত গণণা (শুমার) হবে সালাতে তারাবিহ্ হিসাবে। এবং অতিরিক্ত দু'রাকাত নফল হিসাবে বিবেচিত হবে। স্মরণতব্য যে, সালাতে তারাবিহ্র খতমে কুরআনের তিলাওয়াতকৃত হিসাব নফলে পঠিত তেলাওয়াত গুলো পরবর্তী দিবসের সালাতে তারাবিহ্তে পড়ে দিতে হবে। অন্যথায় সালাতে তারাবিহ্তে পূর্ণাঙ্গ কুরআন করীম এর তেলাওয়াতের সওয়াব পাবে না। [২৫৭]
- ঈমামের সাহুর ব্যাপারে মুক্তাদী সালাম ফিরাবার পর কেহ যদি বলে দুই রাকাত হয়েছে, কেহ বলে তিন রাকাত হয়েছে, ইমামের স্মরণে যদি কোন নিশ্চয়তা সুচক রাকাআতের ধারণা না আসে, তবে বেশী বিশ্বস্থ যাকে মনে হয় তার কথা নির্ভরযোগ্য হবে। যদি মুসল্লীদের সন্দেহ হয়

[২৫৩]. আলমগীরী-১/১১৭।
[২৫৪]. আল-মুহীত লিস-সারাখসী-১/৪৬৬।
[২৫৫]. আলমগীরী-১/১১৮।
[২৫৬]. সূরা আন-নিসা-১৪২।
[২৫৭]. আলমগীরী-১/১১৮,

বিশ রাকাত হয়েছে কি আঠার রাকাত, তবে একা একা দুই রাকাত পড়ে নেবে। [২৫৮]

- পূর্ণ খতমে কুরআনের মধ্যে একবার বিসমিল্লাহ্ শরীফ উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত। প্রত্যেক সুরার শুরুতে চুপে চুপে পড়া মুস্তাহাব। মোতাআখেরীন ফোকাহারা খতম তারাবীহ্র মধ্যে তিনবার সূরা এখলাস বা "কুল হু-আল্লাহু" শরীফ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। এছাড়া সালাতে তারাবিহ্তে পূর্ণ কুরআন করীম খতমের দিন শেষ রাকাতে সূরা বাকারা 'আলিফ লাম মীম' হতে 'মুফলিহূন' পর্যন্ত পড়া উত্তম।

উল্লেখ্য যে, হারামাইন শরীফাইনে শেষ তারাবীহতে বিশতম তথা শেষ রাকাআতে সূরা ফাতেহা ও জম্মে সূরার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করে থাকেন। ফলে আমাদের হানাফীদের নিকট তা' নাজায়েয বিধায় শেষ দু'রাকাত দুহরাতে হবে। নচেত গোনাহগার হবেন।

উল্লেখ্য যে, আমাদের ইমাম সৈয়্যেদুনা ইমামে আযম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রত্যেক রমজান শরীফে ৬১ বার ক্বোরআনে মজীদ খতম করতেন। আল-হামদু লিল্লাহ্। সুবহানাল্লাহ্। অর্থাৎ ৩০ দিনে ত্রিশবার, ৩০ রাত্রে ত্রিশবার এবং সমগ্র তারাবীহতে একবার। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবত এশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন। [২৫৯]

কিয়ামুল লাইল নামক বিদআত

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন করীম ও আহাদীসে নববীয়ায় কিয়ামূল লাইল বলতে রাত্রীকালীন তাহাজ্জুদ, মাহে রমযানের তারাবীহসহ অন্যন্য নফল নামাযকে বুঝানো হয়েছে। যা একাকি আদায় করতে হয়। অথচ কথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা সালাতুল লাইল বা ক্বিয়ামুল লাইল এর নাম দিয়ে বিশেষ করে রমযান মাসে জামাআতের সাথে কিছু নামায আদায় করে থাকে। যার কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। অথচ যাবতীয় নফল ঘরে পড়া এবং একাকী পড়া উত্তম বলে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সগীরী নামক বিখ্যাত ফতওয়ার কিতাবে এসেছে,

[২৫৮]. আলমগীরী-১/১১৭।
[২৫৯]. মানাকিবে আবু হানীফা লিয-যাহাবী-২৩, সিয়ারু আলামিন নুবালা-৪০০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

لو أم رجل في التراويح ثم اقتدى بالآخر في التراويح تلك الليلة لا يكره له ذلك كما لو صلى المكتوبة إماما ثم اقتدى فيها متنفلا. و هذا لأن صلاة النفل غير التراويح بالجماعة إنما يكره إذا كان الإمام و المقتدي معا متنفلين و كان على التداعي بأن يجتمع جمع كثير فوق الثلاثة حتى لو اقتدى واحدا و اثنان لا يكره و في الثلاثة اختلاف و في الأربعة يكره اتفاقا.

মোট কথা হল, যে কোন ধরণের নফল নামায আহবানের মাধ্যমে জামাআত সহকারে আদায় করা সকল ওলামার ঐক্যমতে মাকরূহ।[২৬০]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আরব্য সালাফীদের দেখাদেখি আমাদের দেশের লা-মাযহাবীরাও এ বিদআত আমদানী করে দেশের সাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করছে! আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

সেজদায়ে তেলাওয়াতের বয়ান:

কুরআন মজীদে এমন কতেক স্থান আছে, যেগুলো তেলাওয়াত করলে বা শুনলে, ইচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত, তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতা প্রত্যেকের উপর তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করা ওয়াজিব ২৬১, হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ"

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরাইরাহ (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান আয়াতে সেজদা তিলাওয়াত করার পরে যখন সেজদা করে, তখন শয়তান একপাশে গিয়ে কাঁদে এবং বলে, হায় আমার ধ্বংস! বনি আদমকে সেজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তারা সেজদা আদায় করেছে, ফলে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

[২৬০]. সগীরী শরহে মুনিয়াতুল মুসল্লী-২০৯।
[২৬১]. দুররে মুখতার-২/১০৩, আলমগীরী-১/১৩২, বাদায়েউস সানায়ে'-১/১৬৩।

পক্ষান্তরে আমাকে সেজদা করতে নির্দেশ দেয়া হলে আমি অমান্য করি ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।[২৬২]

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের হানাফী মাযহাব মতে পুরো ৩০ পারা কুরআন করীমের মধ্যে ১৪টি স্থান আছে, যে আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলে সাথে সাথে পরক্ষণে সেজদা দেয়া ওয়াজিব হয়। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, শরীয়ত প্রণেতা উক্ত আয়াত সমূহের স্থানে বা তেলাওয়াত করলে সেজদা দিতেন এবং অন্যদের সেজদার নির্দেশ দিতেন; হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ»

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (র.) হতে বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত কালে আয়াতে সেজদা বিশিষ্ট কোন সূরা তিলাওয়াত করলে তিনি সেজদা দিতেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সেজদা দিতাম। এমন কি আমাদের (সংখ্যাধিক্যের কারণে) অনেকে মাটিতে কপাল রাখার জায়গা পেতাম না"।[২৬৩]

তাই ঐ আয়াত তেলাওয়াতকারী শ্রবণকারীর উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব। তাছাড়া ঐ ১৪ স্থানের আয়াত সমূহের নুযুল ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পর্যালোচনা করলে একথা প্রতিভাত হয় যে, উক্ত আয়াত সমূহে হয়তঃ মহান রাব্বুল আলামিন শাস্তির কথা, প্রাক কোন উম্মতের উপর নবী (আ.)দের সাথে কুফরীর পরিণতির কথা, যে শাস্তির বর্ণনা শুনলে আল্লাহর ভয়ে মাথা নুয়ে পড়ে, এমন আলোচনা উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তাই উক্ত ১৪ স্থানে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সেজদারত হওয়া ওয়াজিব।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আয়াতে সিজদা সমূহ নিম্নরূপঃ

১. সূরা আল-আরাফের ২০৬ নং আয়াত,
২. সূরা আর-রাআদ এর ১৫ নং আয়াত,
৩. সূরা আন-নাহ্‌লের ৪৯, ৫০ নং আয়াত,

[২৬২]. সহীহ মুসলিম-৮১, মুসনাদে আহমদ-৯৭১৩, ইবনু মাজাহ-১০৫২, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ-৫৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান-২৭৫৯, হুলিয়াতুল আউলিয়া-৫/৬০।
[২৬৩]. সহীহ মুসলিম-৫৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান-২৭৬০, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-৩৬৯৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. সূরা আল-ইস্‌রা (বনি ইসরাঈল) এর ১০৭,১০৮ ও ১০৯ নং আয়াত,
৫. সূরা মারইয়াম এর ৫৮ নং আয়াত,
৬. সূরা আল-হজ্জ এর ১৮ নং আয়াত,
৭. সূরা আল-ফুরক্বান এর ৬০ নং আয়াত,
৮. সূরা আন নামাল এর ২৫,২৬ নং আয়াত,
৯. সূরা আস-সাজদাহ এর ১৫ নং আয়াত,
১০. সূরা ছাদ এর ২৪ নং আয়াত,
১১. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ (ফুস্‌সিলাত) এর ৩৭,৩৮ নং আয়াত,
১২. সূরা আন নাজাম এর ৬২ নং আয়াত,
১৩. সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব এর ২১ নং আয়াত এবং
১৪. সূরা আল-আলাক্ব এর ১৯ নং আয়াত। [২৬৪]

মোদ্দা কথা হচ্ছে কুর্‌আনে আযীমে এক আয়াত যুক্ত আয়াতে সিজদার স্থান ১০টি, দুই আয়াতযুক্ত আয়াতে সিজদার স্থান তিনটি এবং তিন আয়াত যুক্ত আয়াতে সিজদার স্থান শুধুমাত্র ১টি।

- সুন্নাত তরীকা মতে এর নিয়ম হল গাইরে সালাতে তেলাওয়াত করলে সাথে সাথে নামাযের মত দাঁড়িয়ে "আল্লাহু আকবর" বলে সেজদায় যাবে, এবং সেজদায় কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়বে।
- এবং নামাযেরত অবস্থায় তেলাওয়াত করলেও উপরোক্ত নিয়মে সেজদায় গিয়ে তাসবিহ্ পাঠপূর্বক আবার "আল্লাহু আকবর" বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি তেলাওয়াত শেষ করবে। তবে দাঁড়ানোর পর বাকি তেলাওয়াত করতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না।
- আর নামাযের বাইরে আয়াতে সিজদা তেলওয়াত করে থাকলে; ওই বৈঠকেই নিয়ম মোতাবেক দাঁড়ায়ে কিবলামুখী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করা উত্তম।
- ❖ সেজদায়ে তেলাওয়াতের সময় নামাযের শর্তাবলী যেমন তকবীরে তাহরীমা, রুকু, সূরা তেলাওয়াত ইত্যাদি প্রজোয্য নয়। তবে ব্যক্তি ও স্থানের পবিত্রতা, কেবলামূখী হওয়া, নিয়ত ও সতর ঢাকা শর্ত, এমনকি

[২৬৪]. দুররে মুখতার-২/১০৩, আলমগীরী-১৩২।

পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি তাইয়াম্মুম করে সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা দুরস্ত নহে। [২৬৫]

একটি গোমরাহী ফতোয়ার অপনোদন ও আয়াতে সেজদা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

- ❖ ইসলামের মুখোশধারী নতুন ইসলামী খিলাফত (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা জমাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেব তার বই তরজুমানুল কুরআন ও তাফহীমুল ক্বোরআনে লিখেছেন, "সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায়ে অযু থাকা, কেবলামুখী হওয়া শর্ত নয়। মাটিতে মস্তক স্থাপন করা ওয়াজিব নয়। কেবলমাত্র একটু মাথা ঝুকালে চলবে।" প্রিয় পাঠক, অথচ ফোকহায়ে কিরামদের অভিমত হলো, যদি আয়াতে সেজদা নামাযে পড়ে, তবে সেজদায়ে তেলাওয়াত তৎক্ষনাৎ নামাযের মধ্যেই আদায় করা ওয়াজিব। বিলম্ব করলে গুণাহ্‌গার হবে। (দেরি করার অর্থ তিন আয়াত হতে বেশী পড়ে নেয়া) কিন্তু যদি সূরার শেষাংশে সেজদা হয়, তবে সূরা পূর্ণ করে সেজদা দিলে দোষের নয়। যেমন "সূরা ইনশিকাক" সূরা শেষ করে সেজদা দিলে, কোন দোষ নয়।
- ❖ নামাযে আয়াতে সেজদা পড়লে, সেজদায়ে তিলাওয়াত নামাযের মধ্যেই আদায় করা ওয়াজিব। নামাযের বাহিরে আদায় হবে না।
- ❖ যদি সেজদার আয়াত নামাযে তিলাওয়াত করে এবং অসাবধানতা বশতঃ সেজদা দিতে ভুলে যায়, সালাম ফিরাবার পর যদি এমন কাজ সংঘটিত হয়ে না যায় যা নামাযে করা যায় না। (যেমন অযু ভঙ্গ হয়ে যাওয়া, কিছু খাওয়া বা পান করা বা কোন কথা বলা এবং সালাম গ্রহণ করা) তাহলে আবার সালাম ফিরায়ে সেজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করে সাহ্ সেজদা করবে।
- ❖ আয়াতে সেজদা তেলাওয়াতের সাথে সাথে রুকু না করে সরাসরি তাকবির বলে সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা। অতঃপর দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং অসম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষ করে রাকাত সমাপ্ত করা।
- ❖ আয়াতে সেজদা লিখলে বা দেখলে সেজদা ওয়াজিব হয়না। সেজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পুরা আয়াত পড়া আবশ্যক নহে। বরং ওই শব্দ

[২৬৫]. দুররে মুখতার-২/১০৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যার মধ্যে সেজদার কথা পাওয়া যায়, তার আগের বা পরের কোন অক্ষর মিলায়ে পড়াই যথেষ্ট। [২৬৬]

- ❖ আয়াতে সেজদার বানান করলে বা বানান শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে না। তবে আয়াতে সেজদার অনুবাদ করলে বা শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ শ্রোতার জানা থাকলে ভাল, অন্যথায় বক্তা শ্রোতাদের জানিয়ে দেওয়া চাই যে, এটা আয়াতে সেজদার অনুবাদ। [২৬৭]
- ❖ আর যদি আয়াতে সেজদা পড়া হয়, (জানা থাকার শর্তে) শ্রোতাদেরকে জানাবার আবশ্যক নয় যে, এটা আয়াতে সেজদা। তবে নামাযের জামাত যদি হয়, তাহলে ওই রাকাত দ্বয় শুরুর আগে উপস্থিত মুক্তাদিদের জানায়ে দিবে ১ম অথবা ২য় রাকাতে সেজদায়ে তিলাওয়াত আছে। এছাড়া শুধু কুরআন তেলাওয়াতকারীকে আয়াতে সেজদার ব্যপারে জানানো অনাবশ্যক।
- ❖ হায়েজ ও নেফাসের অবস্থায় মেয়েলোক আয়াতে সেজদা তেলাওয়াত করলে বা শুনলে তার উপর সেজদা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য অন্য শ্রুতাদের উপর ওয়াজিব হবে।
- ❖ জানাবত অবস্থায় (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) বা বিনা অযু আয়াতে সেজদা পড়লে বা শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে।
- ❖ নাবালেগ আয়াতে সেজদা পড়লে বা শুনলে তার উপর সেজদা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য শ্রুতাদের উপর ওয়াজিব হবে।
- ❖ ইমাম আয়াতে সেজদা পড়ে সেজদা দেয়নি, মুক্তাদী ও তার অনুকরণে সেজদা দিবে না। যদিও আয়াত শুনে থাকে। নামাযের বাহিরে যদি আয়াতে সেজদা পড়ে, কোন কারণে যদি ওই সময় সেজদা করতে না পারে, তবে পরে সেজদা আদায় করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, তেলাওয়াতকারী ও শ্রুতা সেজদা আদায়ের সময় নামাযের সেজদার মত তাসবিহ ৩ বারের পর নিম্নোক্ত এই দো'আ পড়ে নেয়া মুস্তাহাবঃ

سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

উচ্চারণ: সামি'না ওয়া আতা'না গুফরা-নাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

[২৬৬]. আলমগীরী-১/১৩২।
[২৬৭]. প্রাগুক্ত।

- ❖ পুরা সুরা পড়া, সেজদার আয়াত বাদ দেয়া, মাকরূহ তাহরিমী।
- ❖ একই মজলিশে একই সেজদার আয়াত বার বার পড়লে বা শুনলে, এক সেজদাই ওয়াজিব হবে। যদিও কয়েকজন হতে শুনা যায়। তদ্রুপ একটি সেজদার আয়াত পড়লে, আবার ওই আয়াত অন্যকেহ হতে শুনলে একই সেজদা ওয়াজিব হবে। তবে একই বৈঠকে হাওয়া পূর্বশর্ত। [২৬৮]
- ❖ দুই এক লোকমা খানা খেলে, দুই এক ঢোক পানিয় পান করলে, বসা হতে দাঁড়িয়ে গেলে, দুই এক কদম চললে, সালামের জবাব দিলে, দুই একটি কথা বললে, ঘরের এক কোণা হতে অপর কোণার দিকে চললে, মজলিশ পরিবর্তন বুঝাবেনা। হ্যাঁ ঘর যদি বড় হয়, শাহী দালানের মত হয় তবে এক কোণা হতে অপর কোণায় গেলে মজলিশ পরিবর্তন বুঝাবে। [২৬৯]
- ▯ চলন্ত জাহাজ বা রেলের উপর সামান্য এদিক সেদিক গেলে মজলিস পরিবর্তন বুঝাবে না, তবে প্রাণীর উপর সওয়ার হয়ে এদিক সেদিক গেলে মজলিস পরিবর্তন বুঝাবে, হ্যাঁ নামাযরত অবস্থায় প্রাণীর উপর সওয়ার থাকলেও মজলিস পরিবর্তন বুঝাবেনা। [২৭০]
- ▯ তিন লোকমা খেলে, তিন ঢোক পান করলে, তিন কদম মাঠে চললে, নেকাহ্ করলে, বেচা কেনা করলে, হেলান লাগায়ে শুয়ে গেলে, মজলিশ পরিবর্তন হবে। কোন মজলিশে বেশীক্ষণ বসলে, ক্বিরাআত তসবীহ, তাহলীল, শিক্ষা, দীক্ষা, ওয়াজ নছীহত করলে মজলিশ পরিবর্তন হবে না।
- ▯ যদি দু'বার একই আয়াতে সেজদা তেলাওয়াতের মধ্যে কোন দুনিয়াবী কাজ করে, যথা কাপড় সিলাই করলে মজলিশ পরিবর্তন হবে। যদি শ্রুতাগণ সেজদার জন্য রাজী থাকে, সেজদাকে কষ্টকর না বুঝে, তবে আয়াতে সেজদা উচ্চস্বরে পড়া ভাল। নতুবা চুপে চুপে পড়বে। যদি শ্রোতাদের অবস্থা জানা না থাকে তখনও নীরবে পড়া ভাল।

[২৬৮]. আলমগীরী-১/১৩২।
[২৬৯]. প্রাগুক্ত।
[২৭০]. প্রাগুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- রুগ্ন অবস্থায় অপরাগতায় ইশারায় ও সেজদা আদায় হবে, তদ্রুপ সফরে সাওয়ারীর উপর ইশারায় সেজদা আদায় করলে আদায় হবে।
- কোন ব্যক্তি যে একা নামাযে রত, অন্য দিকে জামাতে নামায হচ্ছে এবং জামাতে নামাযে ইমাম সাহেব আয়াতে সেজদা তিলাওয়াত করলে পরে; তখন একা নামাযরত ব্যক্তি আয়াতে সেজদা তেলাওয়াত করতেছে নামাযে থেকে শুনলে, নামাযের ভিতর থেকে জামাতে নামায রত ইমামের আয়াতে সেজদা তেলাওয়াতের সেজদা দিতে পারবে। তার মানে মুনফারিদ মুসল্লী নামাযে থেকে দিলেও আদায় হবে, পরেও অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ না দিয়ে পরেও দিতে পারবে. নামাযে থেকে দিলে কিন্তু নামাযও ফাসেদ হবে না। হ্যাঁ যদি ওই জামাতে তেলাওয়াত কারীর অনুকরণে তার সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করে; তবে নামায ফাসেদ হবে।
- যদি এক রাকাতে বার বার একই আয়াতে সেজদা তেলাওয়াত করতে থাকে, তবে এক সেজদাই যথেষ্ট। কয়েকবার পড়ে সেজদা দেয়া হউক বা একবার সেজদা দিয়ে পরে এই আয়াত বার বার পড়া হউক। তদ্রূপ একই নামাযের প্রত্যেক রাকাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাতে ওই আয়াত পড়া হউক একই সেজদাই যথেষ্ট।
- এছাড়া নামাযে আয়াতে সেজদা পড়ে ভুলক্রমে সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় না করলে, বা ভুলক্রমে যদি সেজদার আয়াত পড়ার পর বিলম্ব না করে রুকু সিজদা করে তবে নামাযের সেজদা দ্বারা তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হয়ে যাবে।
- জুমা, উভয় ঈদ, এবং যেসব নামাযে নীরবে ক্বিরাআত পড়া হয়, আর জমা'আত যদি বড় হয়, এই সমস্ত নামাযে ইমামের জন্য আয়াতে সেজদা পড়া বা তেলাওয়াত করা মাকরূহ।
- সেজদায়ে তেলাওয়াতের তসবীহ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আলা' যাহা ফরয নামাযে ও নফল নামাযের সেজদায় তেলাওয়াত করা হয় বা নামাযের বাহিরে সেজদায়ে তেলাওয়াতে উক্ত তাসবিহ্ সমূদয় তিনবার পড়ে নিম্নলিখিত দো'আ বা হাদীস এ রাসূলে সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত যে কোন দো'আ পড়া যায়ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِىْ وَ بِكَ اٰمَنَ فُؤَادِىْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عِلْمًا يَنْفَعُنِىْ وَ عَمَلاً يَرْفَعُنِىْ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদা সাওয়াদি, ওয়া বিকা আমানা ফুয়াদি আল্লাহুম্মার জুক্‌নি ইলমান ইয়ানফায়ানি ওয়া আমালন ইয়ার ফাউনি। [২৭১]

সেজদায়ে শোকরের বয়ানঃ

সেজদায়ে শুকরের নিয়ম সেজদায়ে তেলাওয়াতের মত। যা সাধারণত আওলাদ জন্মগ্রহণ করলে, হারিয়ে যাওয়া সম্পদ-মাল পেলে, হারানো বস্তু ফেরৎ পেলে, রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করলে, মোসাফির দেশে ফিরে আসলে, যে কোন নেয়ামত লাভ করলে; যে কোন শুভ খুশির সংবাদ পেলে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে সেজদায়ে শোকর করা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত এবং মুস্তাহাব ২৭২।

কাযা নামাযের বিবরণঃ

- কোন নামায তার নির্ধারিত সময়ে পড়ার নাম 'আদা'। আর কোন যৌক্তিক কারণে নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে না পারলে অন্য (মাকরূহ সময় ছাড়া) সময়ে পড়ার নাম 'কাযা'।
- কাযা শুধু ফরজ এবং ওয়াজিব নামায গুলো পড়তে হবে এবং নিম্নোক্ত মাসআলা গুলো অনুসরণ করবে।
- শরীয়তের গ্রহণযোগ্য ওযর ব্যতিরেকে কাযা করা মহাপাপ। তবে নিয়মিত/লাগাতার ৫ ওয়াক্ত নামাযের অধিক নামায শরয়ী কারণে কাযা হলে, নিজস্ব কারণে কাযা করলে 'তাওবা' করতে হবে। কিন্তু কাযা আদায় না করা পর্যন্ত 'তওবা'ও কবুল হবে না। শত্রুর ভয় বা প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দিলে নামায কাযা করা যায়। তবে শুধু দাঁড়িয়ে বা বসে ইশারা করে কেবলামূখী হয়ে যে কোন প্রকারে পড়তে সক্ষম হলে নামায কাযা করা দুরস্ত হবে না।
- সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক স্থীতি সূর্য্যের সময় (এই তিন হারাম ওয়াক্ত) ছাড়া যে কোন সময় কাযা নামায পড়া যায় ২৭৩।

---

[২৭১]. তাফসীরে দুররে মানসূর-৩/৬৪০, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-৪৩৭৩।
[২৭২] দুররে মুখতার-২/১১৯, আলমগীরী-১/১৩৬
[২৭৩]. আলমগীরী-১/১২১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ❖ পাগল ও এমন রোগী যে ইশারায়ও নামায পড়তে অক্ষম। এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তি যার পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা হয়েছে। তাদের জন্য কাযা নামায পড়তে হবে না।
- ❖ মেয়ে লোকদের হায়েয ও নেফাস অবস্থার (মেয়ে লোকদের ঋতুস্রাব ও প্রসব কালীন পিরিয়ডের কথা পবিত্রতা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে) নামায সমূহের কাযা দিতে হবে না। তবে কোন কোন সময় মহিলাদের ঔষধ সেবন বা শারীরিক কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ঋতুস্রাব বা প্রসবকালীন স্রাব বন্ধ হয়ে যায়। তার মানে কোন কোন সময়ে উপরোক্ত কারণে কোন মহিলার তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে স্রাব বন্দ হয় বুঝে নিতে হবে সে পবিত্র। অর্থাৎ- ঐ মহিলার জন্য ঐ মাসের পিরিয়ড হিসাব করতে হবে স্রাব বন্দ হওয়ার পূর্বে সময়গুলোকে। ঐ মহিলার পূর্বেকার পিরিয়ডের (আগের মাসের) মত স্রাব বন্দ হওয়ার সময়কাল ৩/৫/৭/১০/১৫ হিসাব করা যাবে না। অতএব স্রাব না হওয়া মানে পবিত্র বা ঐ মহিলার ঐ মাসের স্রাব মেয়াদ ঐ ক'দিনই; যা তার ঋতুস্রাব হয়েছে। তাই অবশ্য পাক হওয়ার সাথে সাথেই দশ দিন বা চল্লিশ দিন অপেক্ষা না করে নামায পড়তে হবে। অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের পরের সময়ের নামাযের কাযা দিতে হবে। অন্যথায় তার উপর ওই নামায কাযা থেকে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ইমাম আযম ,আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দরবারে গেলেন। তখন তিনি ইমাম আবু হানীফাকে (র.)বললেন,আপনার নাম কি? তিনি বললেন,নু'মান। শুনে ইমাম জা'ফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,হে নু'মান! তুমি নাকি রায় বা যুক্তি দিয়ে আমার নানা মুহাম্মদে আরবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিচ্ছ? তুমি কি কখনো তোমার মস্তককে যুক্তি দিয়ে মেপেছ? তিনি বললেন,মস্তককে যুক্তি দিয়ে মাপার কি আছে? তিনি বললেন,তুমি কি জান চোখের পানিতে লবনাক্ততা কেন? কর্ণের মধ্যে তিক্ততা কেন? নাকের মধ্যে গরম কেন? উঠের মধ্যে মিষ্টি কেন? ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,এর কারণ তো

আমার জানা নেই। ইমাম জা'ফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,তুমি এমন কোন বাক্য সম্পর্কে জানযেটার , প্রথম অংশ মানুষকে নাস্তিক তথা কাফের বানায় আর অপর অংশ মু'মিন বা বিশ্বাসী বানায়? তিনি বললেন,আমি তো জানিনা।

অতঃপর ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,কোনটা বড় অপরাধ? যেনা নাকি খুন? ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,আমার তো মনে হয় খুন করাই বড় অপরাধ। ইমাম জা'ফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,তাহলে আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর হেকমত কি? বড় অপরাধ হওয়া সত্বেও খুনের ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীই যথেষ্ট আর তুলনামূলকভাবে কম অপরাধ হওয়া সত্বেও যেনার ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন কেন? এই ক্ষেত্রে তোমার যুক্তিটা কি? ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি তো জানিনা। অতঃপর বললেন, বলতো কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ? নামায নাকি রোযা? তিনি বললেন,অবশ্যই নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তখন তিনি বললেন,তাই যদি হয় তাহলে ঋতুবর্তী মহিলাদেরকে পরবর্তীতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও নামায কাযা করতে হয়না অথচ তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও রোযা কাযা আদায় করতে হয় কেন? এ ক্ষেত্রে তোমার যুক্তি কি? ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি জানিনা।

হযরত ইমাম জা ফর সাদেক'রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন,হে নু'মান! কান পেতে শুন,আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামইরশাদ করেছেন,"আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রথম যুক্তি দিয়ে যাচাই করেছিল ইবলীস শয়তান। আল্লাহ পাক ইবলীসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে, তখন ইবলীস যুক্তি খাড়া করে বলেছিল,"আমি আদমের চেয়ে উত্তম,আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুণ থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে"। অতএব, যে ব্যক্তি দ্বীনকে যুক্তি দ্বারা যাচাই করবে তাকে কেয়ামতের দিন ইবলীসের সাথী বানিয়ে দিবেন। কেননা সে যুক্তি খাটিয়ে ইবলীসের অনুসরণ করেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম জা'ফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,"আল্লাহ তাআলা বড় দয়া ও ইহসান করে বনী আদমের চোখে লবন দান করেছেন,চোখ যেহেতু চর্বি জাতীয় তাতে লবন না থাকলে তা দ্রবীভূত হয়ে যেতর চোখে লবন না থাকলে দৃশ্যাবলী ,গলে যেত/ পানসে লাগত।

বনি আদমের উপর আল্লাহ তাআলার এক মহা রহমত বা ইহসান যে , পতঙ্গ ঢুকে ব্রেইনে আঘাত করা থেকে -তিনি কানের ভিতর তিতা রেখে কীট প্রতিবন্ধকা সৃষ্টি করেছেন। ফলে কানের মধ্যে কীটপতঙ্গ ঢুকলে ভিতরের - তিতা অনুভব করে তড়িৎ বের হয়ে পড়ে।

নাসিকা ইন্দ্রে উত্তাপ দিয়েও আল্লাহ পাক মানব জাতির উপর বড় দয়া ও রহম করেছেন। নাসিকা রন্দ্রের উত্তাপ ক্ষতিকর জীবানু (Harmful Bacteria) মিশ্রিত ঘ্রাণকে সেদ্ধ করে তা ব্রেনের জন্য সহনীয় করে দেয়। ফলে তা সরাসরি ব্রেনের ক্ষতি করতে পারেনা।

ইহাও মহান আল্লাহর এক মহা দান ও রহমত যেতিনি বনি আদমের জিহ্বায় , অনুভব করতে পারে মিষ্টতা রেখেছেন। এর ফলে বান্দা প্রত্যেক জিনিষের স্বাদ আর মুখের সুমিষ্ট ভাষা বলার সুযোগ হয়।

আওলাদে রাসূল বলেন, বান্দা যখন 'লা ইলাহা' বলে তখন সে কাফির বা নাস্তিক হয়ে যায় আর যখন 'ইল্লাল্লাহ' বলে তখন ঈমানদার হয়ে যায়।

খুনের ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষী আর যেনার ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর কারণ হল, যেহেতু খুনের অপরাধটা একজনের দ্বারা সংঘটিত হয় তাই দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় আর যেনার অপরাধটা যৌথ অপরাধ বিধায় এর সাক্ষীও Double বা চারজন প্রয়োজন হয়। সুবহানাল্লাহ [২৭৪]

[২৭৪]. হিলয়াতুল আউলিয়া-৩/১৯৬।

- ফরয নামাযের কাযা আদায় করা ফরয; ওয়াজিবের কাযা আদায় ওয়াজিব, সুন্নাতের কাযা আদায় সুন্নাত। [২৭৫]
- সফরের কাসরের নামাযের কাযা বাড়ীতে পড়লেও দু'রাকাতই কসর পড়তে হবে। তদ্রুপ বাড়ীতে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের কাযা সফরে আদায় করলেও চার রাকাতই পড়বে। [২৭৬]
- কাযা নামায আদায়ের সময় পূর্বেকার কাযা আগে, পরের কাযা পরে পড়তে হবে। আর ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বেই কাযা আদায় করতে হবে। একেই 'তারতীব' বলা হয়। যেমন যোহর ও আসরের নামায কাযা হলে আগে যোহরের ও এরপর আসরের কাযা পড়তে হবে। তারপর মাগরীবের নামায পড়তে হবে। অন্যথায় কোন নামায ওই দিনের ছাড়া দোরস্ত নেই। উল্লেখ্য এ হুকুম সাহেবে তারতিব (পাঁচ ওয়াক্তের কম কাযা) এর জন্য, নয়তো মাগরিবের পূর্বে দুরস্ত হবে না। (হ্যাঁ সালাতে মাগরিব জামাতে আদায়কারীর জন্য এটা প্রযোজ্য নয়)

কাযা নামাযের তারতীব সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য:

অবশ্য নিম্নলিখিত তিনটি কারণের কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে, এই 'তারতীব' রদবদল করা যায়। যেমন-

১. ওয়াক্তিয়া নামাযের ওয়াক্ত কম থাকলে, কাযা ও ওয়াক্তিয়া নামায সংক্ষেপে পড়ে নেবার মত সময় থাকলে আগে কাযা পড়তে হবে। যখন ওয়াক্ত সংকীর্ণ বলে মনে হবে না।

২. তবে একথা দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করতে হবে যে, শুধুমাত্র সময় কম বলে ধারণা করলেই চলবেনা, প্রকৃতপক্ষেও সময় কম হতে হবে। নতুবা 'তরতীব' সাব্যস্ত হবে; তার মানে তারতীব অনুসারে কাযা আদায় করতে হবে।

৩. এছাড়া যে মুসল্লী ফযরের ওয়াক্ত সংকীর্ণ বলে ধারণা করে এশার কাযা বাদ দিয়ে ফযরের নামায পড়ার পর দেখা গেল যে, এশার কাযাও পড়া যেত; তখন ঐ প্রেক্ষাপটে ফযরের নামায আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে না, তা অবশ্যই দুহরাতে হবে।

[২৭৫]. আলমগীরী-১/১২১।
[২৭৬]. দুররে মুখতার-২/৬৪, আলমগীরী-১২১

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. জুমার দিন ফযরের নামায কাযা হলে খোতবা আরম্ভ হওয়ার পরে হলেও ফযরের কাযা পড়ে নিতে হবে অর্থাৎ সালাতে জুমার জামাতের আগে আগে।

৫. কাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকলে, কাযা নামাযের কথা ভুলে ওয়াক্তীয়া নামায পড়লে; এবং উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে তা (ওই কাযা নামাযের কথা) স্মরণ হলেও নামায দোহ্‌রাতে হবে না। এবং

৬. 'বিতির' ছাড়া পাঁচ ওয়াক্তের বেশী কাযা হলে নুতন কাযা ও পুরাতন কাযা আদায়ের একই হুকুম। যেমন-কোন ব্যক্তি এক মাস নামায কাযা করার পর পুনঃ নামায পড়তে আরম্ভ করে। বেশ কিছুদিন পড়ার পর শরয়ী ওযর বশতঃ আবার 'দুই ওয়াক্তের নামায' কাযা হল। এখন এই পরবর্তী দুই ওয়াক্তের জন্য 'তরতীব' পালন 'ওয়াজিব' নহে। কারণ ইহাও পূর্ববর্তী গুলির সহিত যোগ হয়ে পাঁচ ওয়াক্তের বেশী হয়েছে। উপরোক্ত তিন প্রকার 'ওযর' ব্যতীত কাযা নামায না পড়ে সজ্ঞানে 'ওয়াক্তিয়া নামায' পড়লে, ওয়াক্তিয়া নামায নিজ জিম্মা থেকে আদায় হওয়া বা না হওয়া স্থগিত থাকবে। অর্থাৎ উক্ত কাযা আগে আদায় ব্যতীত যার উপর আরও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পার হয়, নামায ও আদায় করেছে পূর্বের; কিন্তু স্বজ্ঞানে কাযা পড়েনি, তাহলে যত ওয়াক্তের ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করেছে বা কাযা নামায আদায় ব্যতিরেকে পড়া হয়েছে; সবই ফাসেদ (অনাদায়ী) হিসাবে গণ্য হবে। পুনঃবার কাযা সহ আদায় করতে হবে বা- তারতীব।

ওমরী কাযা নামাযের বিবরণ ঃ

ওমরী কাযা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটাকে অস্বীকার করা হাদীস অস্বীকার করার নামান্তর।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى

অর্থাৎ- হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায থেকে গাফেল হয়ে যায় তাহলে তার যখন বোধোদয় হবে তখন সে যেন তা' আদায় কওে নেয়। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, (আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় কর)" [২৭৭]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا» فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ

অর্থাৎ হযরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র.) খন্দকের দিন সূর্য ডুবার পর কুরাইশ কাফেরদেও তিরস্কার করতে করতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আসরের নামায পড়তে পারিনি। আর এরই মাঝে সূর্য ডুবে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হায় আল্লাহ! আমরাও তো পড়তে পারিনি"। তার পর আমরা সমতল ভূমিতে দাঁড়ালাম। আর তিনি নামাযের জন্য অযু করলেন। আমরাও নামাযের জন্য অযু করলাম। তারপর সূর্য ডুবে গেলেও প্রথমে আমরা আসর পড়লাম তারপর মাগরিব পড়লাম। [২৭৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ: «كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

অর্থাৎ- হযরত আনাস (র.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে নামায রেখে ঘুমিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ও নামায সম্পর্কে গাফেল ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, "এর কাফ্‌ফারা হল যখনই নামাযের কথা স্মরণ হবে তখনই তা আদায় কওে নিবে"। [২৭৯]

লা মাযহাবীদের অঘোষিত ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন,

---

[২৭৭]. সহীহ্ মুসলিম-১৬০১, মুসনাদে আহমদ-১২৯৩২, সুনানে কুবরা-৪১৮২।
[২৭৮]. সহীহ বুখারী-৫৯৬,৬৪১, ৯৪৫, ৪১১২।
[২৭৯]. সহীহ ইবনু খুযাইমাহ-৯৯১, মুসনাদে আবি আওয়ানা-১০৪১, মুসনাদে আহমদ-১৩২৬২, মুসনাদে আবি ইয়া'লা-৩০৬৫, সুনানে নাসায়ী কুবরা-১৫৮৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জুমা' পড়বে। যোহরের ক্ষেত্রে ফরজের পর দু দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করতঃ পূর্বের অনাদায়ী মুয়াক্কাদা সুন্নাত আদায় করবে।

কাযা আদায়ের সময় (ওয়াক্তিয়া নামাযের) শুধু 'ফরয' এবং বিতিরের কাযা আদায় করতে হয়। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অধিক কাযা না হয়। অন্যথায় মুয়াক্কাদা সুন্নাত সহ আদায় করতে হবে।

মসজিদ সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল:

- 'মাযুর' (অপারগ রুগ্ন ব্যক্তি) ব্যতীত মসজিদে কেবলার দিকে পা টানা মাকরূহ। শয়ন কালে হউক বা জাগ্রত অবস্থায়। ছোট শিশুদেরকেও কেবলার দিকে পা টেনে শোয়ায়ে দেয়া মাকরূহ। যারা শোয়াবে তারা গুনাহগার ও দোষী হবে।
- মসজিদের ছাদের উপরও অপবিত্র করা হারাম। মসজিদের ছাদের আদব ও মসজিদের ন্যায়, মসজিদের ছাদের উপর বিনা প্রয়োজনে উঠা মাকরূহ। এছাড়া ইমামের হুযরা বা থাকার ঘর বানানোও অবৈধ।
- মসজিদকে সাধারণের চলাচলের রাস্তা বানানো বা রাস্তা করে নেয়া; অর্থাৎ মসজিদ দিয়ে যাতায়াত করা নাজায়েজ। ইহা অভ্যাস করে নিলে শরীয়ত মতে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।
- মসজিদের ভিতরে বা উপরে পেশাব খানা নির্মাণ বা দুর্গন্ধ আসে এমন ভাবে নির্মাণ বা মসজিদের ভিতর কোন পাত্রে পেশাব করা জায়েজ নেই, ছোট শিশু বা পাগল যা দ্বারা মসজিদ অপবিত্র ও অপরিস্কার হওয়ার আশংকা, মসজিদে নেয়া, যেতে দেয়া হারাম। অপবিত্র হওয়ার আশংকা না হলেও মাকরূহ।
- মসজিদের মেহরাবে বা দেয়ালে কুরআন শরীফের আয়াত লিখা ভাল নয়। কারণ তাহা খশে পড়ে পায়ের নিচে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এই বে আদবীর আশঙ্কায় বালিশ, বিছানা, দস্তরখানা, জায়নামায ইত্যাদির উপরও আয়াত, হাদীস বা আরবী ভাষায় পদ্য গদ্য ইত্যাদি লিখা নিষেধ।[২৮১]
- মসজিদের ভিতরে অযু করা, মসজিদের দেয়ালে, চাটাইর উপর বা চাটাইর নিচে নাকের ময়লা থুথু, যে কোন ময়লা ঢালা নিষেধ। যদি নাক

[২৮১]. আলমগীরী-১/১০৯

المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة اولى من الأشتغال بالنوافل، و اما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها احسن،

অর্থাৎ- যদি কাযা নমাযের পরিমাণ অনেক বেশী হয়, তবে সুন্নাত নামাযে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ছুটে যাওয়া ফরয নামায সমূহ আদায় করাই উত্তম। আর যদি কাযা নামাযের পরিমাণ কম হয়, তবে ফরযের সাথে সুন্নাত নামায আদায় করলে তা একটি উত্তম কাজ হবে।[২৮০]

ওমরী কাযার নিয়ত:

বহু ওয়াক্তের নামায (যা দৃঢ়তার সাথে অনুমান করা যায়) কাযা হলে, তাকে 'ওমরী কাযা' বলে। নামায কাযা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নেয়া ওয়াজিব। অতএব যাদের 'ওমরী কাযা' আছে, সাংসারিক কাজ কর্ম, জীবিকার ঝামেলার দরূণ তা একাধারে আদায় করা সম্ভবপর না হলে প্রত্যহ অবসর সময়ে কিছু কিছু করে আদায় করে নেয়া জায়েয। 'ওমরী কাযা' আদায় করার সময় নামাযের দিন, তারিখ স্মরণ না থাকলেও 'ওমরী কাযার' নিয়ত করতে পারা যাবে।

যেমন আমি আমার সর্ব প্রথম বা সর্বশেষ জোহরের কাযা নামায আদায় করছি। কাযা নামাযের সংখ্যা নির্ণয় করতে না পারলে চিন্তা করে অনুমানে একটা সংখ্যা স্থির করে নেবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তা হলে কাযা নেই বলে মনের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন না হওয়া পর্যন্তকাযা পড়তে হবে। আসরের পরও মাকরূহ্ সময় ছাড়া যে কোন সময় উক্ত ওমরী কাযা পড়া যাবে।

- ফযরের নামায কাযা হলে, দিপ্রহরের পূর্বে একে কাযা হিসাবে আদায় করতে হবে। তবে ফযরের সুন্নাতসহ।
- উল্লেখ থাকে যে, ফযরের সুন্নাত ও অন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছাড়া অন্যান্য সুন্নাতের কাযা দিতে হয়না।
- জুমা বা যোহরের ফরযের পূর্বে সুন্নাত পড়া সম্ভব না হলে, জমাআতের পর উক্ত ওয়াক্তের মধ্যে উক্ত সুন্নাতসমূহ পড়ে নেবে। তার মানে প্রথমতঃ 'জুমা' ও তারপর 'বাদাল জুমা' পড়বে, তারপর 'কাব্লাল

[২৮০]. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া-২২/১০৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিস্কার করার, থু থু ফেলার বা গলা পরিস্কার করার প্রয়োজন হয় তবে কাপড়ের আঁচলে নিয়ে ফেলবে বা আহরণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রিন্ট ছাড়া কাগজ, টিস্যু,পেপার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের পকেটে রাখবে পরে মসজিদের বাইরে আসলে নির্দিষ্ট ডাষ্টবিনে ফেলে দেবে। (আলমগিরী)।

- মসজিদে নাপাকী নিয়ে যাওয়া নিষেধ, যদিও তা মসজিদে না লাগে। তদ্রুপ যার শরীরে নাপাকী লাগা থাকে; তারও মসজিদে যাওয়া অবৈধ।
- নাপাক দুর্গন্ধ, তৈল মসজিদ আলোকিত করার জন্য ব্যতীত মসজিদে জালানো রাখা নিষেধ।
- মসজিদে যদি অযু করার জন্য কোন জায়গা মসজিদের নির্মাতারা মসজিদ আরম্ভ করার আগে হতে আলাদা ভাবে তৈরী (অযুখানা হিসাবে) করে থাকেন, তবে সেখানেই অযুখানা পুনঃ বানাতে ও মসজিদের আলাদা কোন জায়গায় বা প্রান্তে পূর্ণ সতর্কতার সাথে বানাতে (মেরামত করতে) হবে, যাতে কোন ছিটা ফোটা মসজিদে না পড়ে, স্বাচ্ছন্দে অযুও করতে পাওে। [২৮২]
- অযু করার পর মুখ হাত মুছে মসজিদে ঝাড়া নাজায়েজ। মসজিদে ঝাড়ু দেয়ার পর মসজিদের ধূলাবালু ইত্যাদি এমন জায়গায় ফেলবেন না যাতে বে আদবী হয়। সে গুলো কবরস্থান বা ভিন্ন জায়গায় দাফন করা চাই। [২৮৩]
- মসজিদের কাজ সমাপ্ত হলে বা মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ হবার আগে, শুধুমাত্র মসজিদের মালামাল রাখার জন্য মসজিদে হুযরা বা কামরা বানাতে পারে । [২৮৪]
- এছাড়া মসজিদের জন্য সাওয়াল (ভিক্ষা) করা হারাম এবং সায়েলকে দেয়াও নিষেধ।
- কাঁচা রসূন পিয়াজ বা বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে যাওয়া জায়েজ নয়। যতক্ষণ দুর্গন্ধ বাকি থাকে। তদ্রুপ ওই সমস্ত দ্রব্য যাতে দুর্গন্ধ থাকে, তাহা হতে মসজিদকে বাঁচাবে। একে দূরীভূত করা ছাড়া মসজিদে যাবে না। এমনকি যেই রোগী দুর্গন্ধ যুক্ত ঔষধ ব্যবহার করবে (যেমন গন্ধক ইত্যাদি) মসজিদে যাবে না। বরং কুষ্ঠরোগী বা যে কোন দুর্গন্ধ

[২৮২]. আলমগীরী-১/১১০।
[২৮৩]. দুররে মুখতার-১/৬৫৫।
[২৮৪]. আলমগীরী-১/১১০।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এমনকি ওই বদজবান যার জবান (কথা) দ্বারা লোকজনকে কষ্ট দেয়, মসজিদে যাওয়া হতে বিরত রাখবে। [২৮৫]

- জায়েজ কথা বার্তা ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদে বলার এজাজত নেই। উচ্চবাক্য করাও জায়েজ নেই। (ছগিরী)।
- মসজিদকে পবিত্র ও পরিস্কার রাখার উদ্দেশ্যে বাদুর, কবুতর, চড়ুই ইত্যাদির বাসা ভেঙ্গে ফেলাতে দোষ নেই। [২৮৬]
- মহল্লার মসজিদে (ইবাদতখানা জামে মসজিদ নহে) নামায পড়া যদিও জামাআত ছোট হয়: জামে মসজিদ হতে উত্তম, বরং যদি মহল্লার মসজিদে জমাআত না হয়, একা গিয়ে আযান একামত দিয়ে নামায পড়বে। ইহা জামে মসজিদের জমাআত হতে উত্তম। [২৮৭]

সালাতে জানাযার নিয়ম

জানাযার নামাযে নিয়ত করে হাত উঠায়ে তকবীর 'আল্লাহু আকবর' বলবে। তারপর হাত বেঁধে 'দোয়ায়ে সানা' পড়বে, তবে শেষ ভাগে وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ 'ওয়ালা ইলাহা গাইরুকার' পূর্বে وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ 'ওয়া জাল্লা সানাউকা' বাড়ায়ে পড়বে। পরবর্তী তিন তাকবীরে হাত উঠাবেনা। শুধু মুখে নিজে নিজে তাকবীর বলবে, নিজে শুনে মত অর্থাৎ নামাজের মত।

২য় তকবীর বলে, ওয়াক্তিয়া নামাযের শেষের বৈঠকে যে সালাত বা দুরূদে ইব্‌রাহীমী পড়া হয়, তা পড়বে। ৩য় তকবীর বলে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ-

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মাগফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগিরে না ওয়া কাবিরি না ওয়া জাকারিনা ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্‌য়াইতাহু মিন্না ফাআহয়েহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল্ ঈমান।' [২৮৮]

[২৮৫]. দুররে মুখতার-১/৬৫৪।
[২৮৬]. প্রাগুক্ত।
[২৮৭]. প্রাগুক্ত।
[২৮৮]. আবু দাউদ-৩২০১, তিরমিযী-১০২৪, নাসায়ী-১৯৮৬, ইবনু মাজাহ-১৪৯৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এছাড়া উপরোক্ত দোয়ার সাথে ভিন্ন এক রেওয়াতে বর্ধিত,

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ــ

"আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুফতিন্না বা'দাহু বি রাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন"ও পড়ার বিধান রয়েছে। [২৮৯]

নাবালেগের জানাযা হলে উপরোক্ত দোয়ার স্থলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا ــ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্ আলহু লানা ফারতাও ওয়াজ্ আলহু লানা আজরাও ওয়া যুখরাও ওয়াজ্ আলহু লানা শাফেয়াও ওয়া মুশাফ্ফায়া।[২৯০]

৩য় তকবীরে দো'আ পড়ার পর ৪র্থ তকবীর বলে অল্পক্ষণ (তিন তাসবিহ্) পরিমান দাঁড়ানোর পর ডানে এবং বামে সালাম ফিরাবে। সালামে ডান এবং বামের মুসল্লী এবং ফেরেস্তাদেরকে সালামের নিয়ত করবে। মৈয়্যাতকেও সালামের নিয়ত করবে।

উল্লেখ্য যে, দুই সালাম ফেরানোর পরই (নামাযের মত দাঁড়িয়ে যেভাবে দু'হাত বাঁধা হয়েছিল) দুই হাতের বাঁধন খুলবে; এবং কাতার বন্দি অবস্থাতেই একবার সূরা ফাতেহা, তিনবার সূরা এখ্লাস, তিনবার দুরূদ শরীফ পড়ে হাত উঠায়ে মৈয়্যাতের মাগফেরাত, হাজেরীন এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্যে দো'আ করা অতিব উত্তম আমল। কারণ অনেক সময় দাফনের পর পর্যন্তসবাই থাকে না। জানাযার পর মৈয়্যাতকে মাটি দেবার আগ পর্যন্ত প্রয়োজনে চেহারা দেখাও জায়েজ। [২৯১]

- প্রকাশ থাকে যে, পাগল অর্থ যে বালেগ হওয়ার পূর্বে পাগল হয় (গুনীয়া)
- মৃত ব্যক্তির কাফনে 'আহাদনামা' পীরের 'শাজরা' (বুকে দেয়া) কপালে ও বুকে কালেমায়ে তৈয়ব ও বিসমিল্লাহ্ শরীফ লেখার (আঙ্গুল দ্বারা) ফযীলত অনেক যেমনঃ ফকিহ্ সুফিয়ায়ে কিরামদের মতে মৃত ব্যক্তির

[২৮৯]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক-৭৭৫, বিনায়-৩/২১৭, তাবহাবী-১/৫৮৬, দুররে মুখতার-২/২১২।
[২৯০]. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-৬৫৮৮, বাদায়ে'-১/৩১৩, আল-মুহীত-২/১৭৯, আল-জাওহারাহ-১/১০৭, দুরওে মুখতার-২/২১৫।
[২৯১]. আলমগীরী-১/১৬৪, তাতারখানিয়া, গুনিয়া।

কাফনে আহাদনামা লিখে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। (দুররে মোখতার, ফতোয়ায়ে আজীজি, ইত্যাদি)

- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর বিনা কালীতে 'হাতের আঙ্গুলী' দ্বারা 'কপালে' 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং বুকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' লিখে দেয়া বৈধ ও ভাল। [২৯২]
- জানাযার নামাযে পিছনের কাতারে দাঁড়ান বেশী ফযীলত। মৃত ব্যক্তি পাগল হলে এর তকবীরের পর নাবালেগের জন্য যে দো'আ পড়া হয়, ওই দোয়াই পড়বে। [২৯৩]
- জানাযার পর মৃত ব্যক্তি কেমন ছিল, তদুত্তরে ভাল ছিল বলা হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মত ও প্রমাণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবাসহ এক মৃত ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবাগণ উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন, ওয়াজিব হয়েছে। তারপর আর একটি মৃত ব্যক্তির লাশ দেখতে পেলে সাহাবাগণ তাঁহার দোষক্রটি নিয়ে সমালোচনা করতে লাগলেন। এবারও নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ওয়াজিব হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেন, তাহাদের জন্য যথাক্রমে বেহেশত ও দোযখ ওয়াজিব হয়েছে। কারণ জমিনে তোমরা আল্লাহ্র সাক্ষী স্বরূপ। সুতরাং যাহার সম্বন্ধে যেরূপ সাক্ষী দিয়েছ, তাই গৃহীত হয়েছে। [২৯৪]

  অপর বর্ণনায় এসেছে, হযরত ফারূক আযম (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, চার ব্যক্তি, যে মৃত মুসলমানের ভাল প্রশংসা করে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ গফুরুর রাহীম তাকে জান্নাতে দাখিল করবে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম তিন বা দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে? ফরমালেন তিন বা দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেও জান্নাতে দাখিল করবে। [২৯৫]

[২৯২]. প্রাগুক্ত।
[২৯৩]. দুররে মুখতার-২/২১৪।
[২৯৪]. সহীহ বুখারী-১৩৬৭, , ২৬৪২, ২৬৪৩, সহীহ মুসলিম-৯৪৯, আবু দাউদ-৩২৩৩।
[২৯৫]. সহীহ বুখারী-১৩৬৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- জানাযার আগে বা পরে মৃত ব্যক্তির চেহেরা দেখা এবং رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم বলা উত্তম।[২৯৬]
- মুসলমান যত বড় পাপীই হউক না কেন, তাহার জানাজা পড়তে হবে। তবে নিম্নলিখিত অপরাধীদের জন্য জানাযার নামায পড়তে হয় না।

যাদের জানাযা পড়া যাবে নাঃ

১. রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে মৃত্যুদন্ড হলে বা মারা পড়লে; বা এমন ব্যক্তি, যে লোক নেককার ইমাম মুসলমান ও খলিফা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে এবং সে গর্হিত কাজের অপরাধে নিহত বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। [২৯৭]

২. লুঠতরাজ, ছিনতাই-ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হলে। [২৯৮]

৩. যে মাতা বা পিতাকে হত্যা করেছে। [২৯৯]
ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে,

وَمَنْ قَتَلَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِهَانَةً لَهُ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা অথবা মাতাকে হত্যা করেছে তার কর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থে তার জানাযা পড়া যাবেনা।" [৩০০]

৪. যে অন্যায়ভাবে জোর জবরদস্তি করে অন্যের সম্পদ দখল করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। [৩০১]

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ

রাষ্ট্রদ্রোহী ও ডাকাতের মৃত্যুর পর গোসলও দিতে হবে না। ফাতওয়ার কিতাবে এসেছে,

وَمَنْ قُتِلَ لِبَغْيٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا

[২৯৬]. আল-মাবসূত লিস-সারাখসী-৪/১৩, বাদায়ে'-২/১৪৯।
[২৯৭]. বাদায়েউস সানায়ি'-১/৩১২।
[২৯৮]. প্রাগুক্ত।
[২৯৯]. আলবিনায়া শরহুল হিদায়া-৩/২৭৯।
[৩০০]. আলমগীরী-১/১৬৩।
[৩০১]. আলমগিরী, দুররে মোখতার, সগীরি, কবীরি, শরহে মুনিয়া ইত্যাদি।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হয়েছে, তাদের গোসলও দেয়া যাবেনা এবং তাদের জানাযাও পড়া যাবে না। [৩০২]

তবে রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাত যদি রাষ্ট্রদ্রোহীতা বা ডাকাতির কাজ ছাড়া অন্য কারণে মারা যায়, তবে তাদের জানাযা পড়তে হবে।

আত্মত্যাগকারীর আত্মহত্যাকারীর জন্য জানাযা পড়তে হবে। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসায় 'অপরকে হত্যাকারী' নাহক ব্যক্তিকে 'কিসাস' অর্থাৎ অন্যায়ভাবে হত্যা করার দোষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে তার জানাযা পড়তে হবে। [৩০৩]

একই ব্যক্তির একাধিক জানাযা পড়ার বিধানঃ

প্রকাশ থাকে যে, একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিকবার জানাযা পড়া যেমন না-জায়েয অনুরূপভাবে একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার ব্যবস্থা করাও নাজায়েয। তবে মৃত ব্যক্তির অলি-ওয়ারেছ, পীর-মুর্শিদ, ওস্তাদ ও বয়োজ্যেষ্ট মুরব্বী কিংবা নিকটাত্মীয় ছাড়া সালাতে জানাযা পড়া হলে তাঁদের পক্ষে পুণরায় জানাযা পড়া জায়েয।

হাদীস শরীফে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ»

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তির জানাযা পড়ালেন। জানাযা আদায় শেষ হলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদল লোক নিয়ে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "জানাযার নামায পুণরায় আদায় করা যায়না। তবে মইয়েতের জন্য দোয়া কর এবং তার জন্য ইসতেগফার কর!" [৩০৪]

এ ব্যাপারে বাদায়েউস সানায়েতে এসেছে,

[৩০২]. আলমগীরী-১/৫৯, বাদায়েউস সানায়ে'-১/৩১১।
[৩০৩]. আলমগীরী-১/১৬৩।
[৩০৪]. আল-মুহীতুল বুরহানী-২/২০১, বাদায়েউস সানায়ে'-১/৩১১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَالتَّنَفُّلُ بِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ صَلَّى مَرَّةً لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ الْوَلِيِّ فَصَلَّى إِنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "একের অতিরিক্ত জানাযা আদায় করা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। যে ব্যক্তি একবার জানাযা পড়েছে সে পূণরায় পড়তে পারবেনা। তবে অলি ওয়ারেছ ছাড়া একবার জানাযা হয়ে গেলে তাদের পক্ষে পুণরায় জানাযা পড়া জায়েয।" [৩০৫]

ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে,

وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَالتَّنَفُّلُ بِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ

অর্থাৎ "একজন মৃত ব্যক্তির উপর একাধিক জানাযা পড়া যাবেনা। যেহেতু নফল (অতিরিক্ত) সালাতে জানাযা শরীয়ত অনুমোদিত নয়।" [৩০৬]

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিভিন্ন সাহাবীর দ্বিতীয়বার সালাতে জানাযা আদায় সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও তা' তাঁর জন্য খাস বা 'খুসুসিয়াতে নববী' এর অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য প্রত্যেক ঈমানদারের সাধারণ অভিভাবকত্ব (General Gardianship) সংরক্ষিত। তাই তিনি প্রত্যেক ঈমানদার মুসলিমের অভিভাবক হিসেবে জানাযা পড়ার অধিকার রাখেন। এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানদারদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়ে অগ্রাধিকার রাখেন"। [৩০৭]

[৩০৫]. বাদায়েউস সানায়ে'-১/৩১১।
[৩০৬]. আলমগীরী-১/১৬৩।
[৩০৭]. সূরা আহযাব-৬।

কবর স্থানান্তরিত করার বিধানঃ

সাধারণত কোন মুসলমান ইনতিকাল করলে তাকে যথাযথভাবে দাফন বা কবরস্থ করা জীবিতদের উপর কর্তব্য। একজন মুসলমানকে দাফন করার পর কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া সেই কবর স্থানান্তরিত করা সম্পুর্ণরূপে হারাম। এমনকি কোন অনিবার্য কারণ ব্যতীত মাটি চাপা দেয়ার পর সেই কবর খোলাও হারাম। হ্যাঁ, তবে যদি কোন যুক্তিসংগত কারণ পরিলক্ষিত হলে, যেমন মৃত ব্যক্তিকে গোসল ব্যতিরেকে দাফন করা হলে অথবা অবৈধভাবে অর্জিত কাপড় দ্বারা দাফন করা হলে কিংবা কবরে কোন মুল্যবান সম্পদ রয়ে গেলে তা নেয়ার জন্য কবর খোলা জায়েয।

অনুরূপভাবে হিংশ্র জীব-জন্তুর আক্রমনের আশংকা থাকলে অথবা পানির ঢলে কবর ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা করলে বা অপরের ভুমিতে অন্যায়ভাবে দাফন করা হয়ে থাকলে তবে কবর স্থানান্তরিত করা বৈধ।
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন,

فَإِنْ أَهَالُوا التُّرَابَ لَمْ يُخْرَجْ

অর্থাৎ "যদি মাটি চাপা দেয়া হয় তাহলে সেই কবর আর খোলা যাবেনা"। [৩০৮]
ইমাম তাহাবী (র.) বলেন,

ولا ينبش القبر إذا أهيل التراب لأن النبش حرام، ولا يجوز إلا لغرض صحيح، كإخراج مال ذي قيمة ترك بالقبر، أو الخشية على صاحب القبر من السباع أو السيل ونحوه، بل إن الأحناف قد منعوا ذلك مطلقا

অর্থাৎ "মাটি চাপা দেয়ার পরে কবরকে খোলা যাবেনা কেননা কোন সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়া কবর খোলা হারাম বা অবৈধ যেমন কবরে রেখে দেয়া সম্পদ বের করা, হিংশ্র পশুর আক্রমনের আশংকা অথবা ঢলে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে। সর্বোপরি হানফীগণ কবর খোলাকে সম্পুর্ণরূপে হারাম বলে থাকেন।"। [৩০৯]

[৩০৮]. বাদায়েউস সানায়ে'-১/৩১৯।
[৩০৯]. তাবয়ীনুল হাকায়েক-১/২৪০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুরাতন কবরের মধ্যে পুণরায় কবরস্থ করার বিধানঃ

প্রকাশ থাকে যে, একটি কবরের মধ্যে অপর মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা যায়েয নাই। কেননা এতে প্রথম দাফন করা ব্যক্তির অসম্মান করা হয় যা অবৈধ। তবে হ্যাঁ শুধুমাত্র তখনই পুণরায় দাফন করা বৈধ হবে যখন প্রথম দাফন করা ব্যক্তির কোন চিহ্ন না থাকে।

হাদীস শরীফে এসেছে.

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

অর্থাৎ "মৃত ব্যক্তির হাঁড় ভাঙ্গাও জীবিত ব্যক্তির হাঁড় ভাঙ্গার মত (সমান অপরাধ)"। [৩১০]

ফাতওয়ায়ে শামীতে এসেছে,

ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم

অর্থাৎ "কোন কবরে অপর লাশ দাফন করার জন্য পুণরায় খোড়া যাবেনা। তবে প্রথম দাফন করা ব্যক্তির হাড়গুড় নিশ্চি হয়ে গেলে তখন অপরকে দাফন করা যাবে"। [৩১১]

শাইখ যাইলায়ী হানাফী (র.) تبيين الحقائق গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

وَلَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ "যদি কবর পুরাতন হয়ে মৃত ব্যক্তি মাটির সাথে মিশে যায়,. তাহলেই শুধু সেখানে অপর মইয়্যত দাফন করা, সেখানে ক্ষেত-খামার করা এবং গৃহ নির্মাণ করা জায়েয"। অর্থাৎ শতাধিক বছর পূর্বে লোক মুখে শোনা যায় যে এ স্থানে কবরস্থান ছিল সেরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তা বৈধ হবে। [৩১২]

শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকাহর কিতাব হাশিয়ায়ে বুজাইরামীতে বলা হয়েছে,

ولو حفر قبراً فوجد فيه عظم ميت قبل تمام الحفر أعاده ولم يتم الحفر

অর্থাৎ "যদি কবর খোঁড়ার সময় পুরাতন মইয়্যেতের হাঁড় পাওয়া যায় তাহলে সেটা না খোঁড়ে আবার ভরাট করে দেবে। [৩১৩]

---

৩১০. সুনানে ইবনু মাজা-১৬১৬।
৩১১. দুররে মুখতার-২/২৩৩।
৩১২. তাবয়ীনুল হাকায়েক-১/২৪৬।
৩১৩. হাশিয়াতুল বুজাইরামী-১/৪৯৩।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সমাজে উচ্চবিত্ত ও মধ্য উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে, তারা মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তাদেরকে পিতা-মাতা বা স্বামী/স্ত্রীর কবরে দাফন করার জন্য অসিয়ত করে যায় যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এই ধরণের অসিয়ত করাও অবৈধ এবং এধরণের অসিয়ত পালন করাও অবৈধ। যেহেতু পূর্বে দাফন করা ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা হাড়গুড় এখনো উক্ত কবরে বিদ্যমান রয়েছে।

সালাতে জানাযা সম্পর্কিত বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

আমাদের সমাজে জানাযার 'নামায' নিয়ে বিরাট কোন্দল। বিশেষতঃ লা মাযহাবী, জামাতী, কওমী, ওহাবীগণ ইহাকে নামায স্বীকার করেনা, দো'আ বলে এবং সালাম ফেরানোর পর দো'আ করাকে বিদ'আত ও মাকরূহ বা বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সমাজে ভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। তাই সমাজকে সত্য পথের দিশা দেয়ার উদ্দেশ্যে শরয়ী ফয়সালা প্রকাশ করছি। এছাড়া অপর পক্ষের দাবী হলো, ইহা নামায নয় বরং দো'আ। কারণ সালাতে জানাযার মধ্যে দো'আ মাছুরা পড়া হয়। পুণঃ দো'আ করা নিস্প্রয়োজন। যেহেতু এর মধ্যে রুকু, সিজদা, কিরাত ও তাশাহুদ নেই। অতএব, ইহা নামায নয়।

এ সম্পর্কে আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদিস ইমাম বুখারী (রহ.) ছহীহ্ বুখারী শরীফে 'জানায়েয' অধ্যায়ে বলেছেন ইহা রুকু, সিজদা, কিরাত ও তাশাহুদ বিহীন নামায এবং সালাত বা নামাযের জন্য কতেক হাদীস ও কুরআন পাকের আয়াত দ্বারা নামায প্রমান করেছেন। [৩১৪]

এ ছাড়াও সমস্ত হাদীস গ্রন্থে এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের যাবতীয় কিতাবে কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে 'সালাতে জানাযা' লিখেছেন। 'দো'আর' অধ্যায়ে লিখেননি। জানাযার নামায 'ফরযে কিফায়া' এই মতের উপর ফোকাহা ও মুহাদ্দেসীনের ইজমা হয়েছে। যে ইনকার করবে ফিকাহ্র কিতাবে প্রমাণ; সে অমুসলিমে সাব্যস্থ হবে।

একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, যদি ইহা নামায না হয়ে দো'আ হতো তাহলে অজু বা তায়াম্মুমের দরকার হতোনা। বিনা অজুতে যেকোন সময় এ দো'আ করা যেত, মধ্যখানে কথা বলা যেত, দাড়াবার প্রয়োজন হতো না। শুয়ে ও বসে দো'আ করা যেত।

---

৩১৪. সহীহ বুখারী-২/৮৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতএব, একমাত্র দ্বন্দ নিরসনের উদ্দেশ্যে হাদীস শরীফ ও ফিকাহের মুস্তানাদ কিতাব হতে দলীলাদি সংগ্রহ করে জানাযার নামাযের সালামান্তে দো'আ করা সুন্নাত যা আমিও আমল করি। আশা করি, সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ আদ্যপান্ত পাঠ করে আমল করবেন ও আমাকে দো'আয় স্মরণ করবেন।

এছাড়া এখানে আমি পাঠক খেদমতে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা যা তা প্রকাশ করছি যে, জানাযার নামাযের সম্মিলিত ভাবে দো'আ মুনাজাতের বিরোধীতাকারী উপরোক্ত সম্প্রদায় ছাড়াও আরো একটি শ্রেণীর লোক আলেম (জ্ঞানী!) লেবাসের রয়েছে। যাদের আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল নেই, মাদ্‌রাসার ফকিহ/মুহাদ্দিস খতিব বটে, কিন্তু মোতাওয়াল্লি/ সেক্রেটারী/ সভাপতির গোলাম হিসাবে পরিচালিত হয়। তাদের পিছনে ইকতেদা যেমন অবৈধ তেমনি তাদের বক্তব্যও গ্রহণযোগ্যতার অবকাশ নেই।

সুপ্রিয় পাঠক! একথা সত্য, যে মানুষটি দুনিয়াতে এসেছিল আল্লাহ্‌র একজন মেহমান হিসেবে। আল্লাহ্‌র দেয়া ফল-ফুল আরাম-আয়েশ ভোগ করতে এবং মহান রাব্বুল আলামিনের স্বীকৃতি আনুগত্যতা প্রদর্শনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে। এবং হঠাৎ তাকে সে মহানের ডাকে সাড়া দিতে হয়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, দেশী-বিদেশী সকলের মায়া জাল ছিন্ন করে যেতে হয়। তাই আল্লাহ্ বিধান করলেন জীবিতদের জন্য, যেন তারা সকলে মিলে তার প্রভুর সাথে মিলনের প্রথম ঘাটী কবরস্থানে একত্রিত হয়। আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনে তার ভুল ভ্রান্তির জন্য সম্মিলিত দো'আ করে আল্লাহ্‌র দরবারে সোপর্দ করেন। এ দো'আটি একটি সামাজিক কায়দায় করতে হবে। যা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই পছন্দনীয়। তার নাম পরিভাষায় সালাতে জানাযা'। ইহা দো'আ এবং নামাযও বটে।

অতএব উহার সঠিক সমাধানের জন্য আমাকে আপনাকে দেখতে হবে আল্লাহর দেয়া কুরআন করিম। রাসূল কারীমের সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ্ ও ফকীহগণের সম্মিলিত মতামত। এর মোকাবেলায় পরিত্যাগ করতে হবে নিজস্ব যুক্তি ও বাতিল পন্থীদের অভিমত। গ্রহণ করতে হবে হযরত রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রি.) এর আমল পরবর্তী যুগের আয়িম্মায়ে দ্বীনের সম্মিলিত মতামত। পরিত্যক্ত মতের ছায়াতলে থেকে নিজেকে অভিশপ্ত করা ঠিক নয়। তাই মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে চার তাকবীরের সাথে কিবলামুখী হয়ে পূর্ণ

পবিত্রতার সাথে যে নামায ক্বিরাত, রুকু, সিজদা ও তাশাহুদ ব্যতিত জামাত সহকারে বিনা আযানে ও বিনা একামতে আদায় করা হয়, তাকে "সালাতে জানাযা" বলা হয়। এর উৎপত্তিস্থল হযরত আদম আলাইহিস সালাম।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বেহেশ্‌তী আঙ্গুর খেতে চাওয়ায়, তাঁর আওলাদগণ তালাশ করতে লাগলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সাক্ষাত পেলে পর ফেরেশতারা বললেন, যাও আঙ্গুরের প্রয়োজন নেই। তিনি ইন্তেকাল করছেন। ফিরে এসে আওলাদগণ মৃত অবস্থায় পেলেন। তাঁকে গোসল দিলেন, খোশবু মাখালেন, কাফন পরালেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আ.) এসে ইমাম হলেন, ফেরেশতাগণ পেছনে দাঁড়ালেন, নামায পড়ে বললেন, এটা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য সুন্নাত তরীকা। অতঃপর আবু কোবাইস পাহাড়ের 'কানয' নামক গর্তে দাফন করলেন।[৩১৫]

সালাতে জানাযা সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন ঃ

প্রিয় পাঠক! উপরের বর্ণনায় নিশ্চয় অবগত ও বোধগম্য হয়েছেন যে, হযরত আদম (আ.) এর ইন্তেকাল পরবর্তী বিষয় গুলো দাফন পর্যন্ত নুরের তৈরী ফেরেশতা কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। তবে নুরের ফেরেশতা হিসাবে নয় বশরীরূপে মানবিক বেশে ও আকৃতিতে মানব দ্বারাই সম্পাদন হতে পারে এমন কর্মই নুরের তৈরী ফেরেশতারা করেছেন। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা মানব সমাজের শিক্ষার জন্য। যদি হযরত আদম (আ.) ইন্তেকাল পরবর্তী কাজ; নুরের তৈরী ফেরেশতা মানব রূপ ধারণকে আমরা অকপটে মানতে আমল করতে ও গ্রহণ করতে পারি তাহলে হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুরের তৈরী। শুধু মাত্র আমাদের শিক্ষার জন্য মানবের রূপ ধারণ করেছেন একথা মানতে আমাদের আপত্তি কোথায় এবং কেন?

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে ১/১৭৬ পৃঃ একটি অধ্যায় প্রনয়ণ করেন। হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে জানাযা বা সালাতে জানাযা বলেছেন। যেমন:

سُنَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ —

অর্থাৎ- জানাযার নামাযের সুন্নাত তরীকা।

---

[৩১৫]. কাসাসুল আম্বিয়-১/৪৭, আখবারু মাক্কাহ লিল-আযরাকী-১/৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছতর ঢাকা, কেবলামূখী হওয়া, তাকবীর সমূহ রোকনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা কারমানী বলেন, ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে জানাযার নামাযে যদিও রুকু সেজাদ নেই তথাপিও উহাকে নামায বা সালাত বলা হবে।

তাই, তিনি এমন কতকগুলি হাদীসের অংশ দলীল হিসেবে উক্ত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে হযরত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সালাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা: مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ল"। আরেক জায়গায় এসেছে, صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের সাথীর উপর জানাযার নামায পড়" অপর স্থানে এসেছে صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ অর্থাৎ "তোমরা হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর উপর জানাযার নামায পড়"।

سَمَّاهَا صَلَاةً ـ لَيْسَ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَلَا سُجُوْدٌ ـ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهَا ـ

অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) এমন কতেক হাদিস সংকলনের প্রয়াস করেছেন; যেগুলোতে স্বয়ং 'সালাতে জানাযা' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে এবং যা এমন একটি নামায যাতে রুকু ও সিজদা নেই। হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহার উপর সালাত শব্দ ব্যবহার করে উম্মতের জন্য নির্ধারণ করলেন, ইহা জানাযার নামায ।[৩১৬]

সালাতে জানাযার ফজিলত সম্পর্কিত একটি হাদিসে নববী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম :

عن هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হুজুর সাফেয়ে ইয়াওমে নুসুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে জানাযায় আসল; এবং মৃতের উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে এক "কিরাত" ওজনের পূণ্য পাবে আর যে ব্যক্তি ঐ মৃতের দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকল তার জন্য দুই "কিরাত" পরিমাণের সওয়াব বরাদ্দ হয়ে যাবে। হযরত রাসুল

[৩১৬]. সহীহ বুখারী-২/৮৭।

সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কে জিজ্ঞাসা করা হল "দুই কিরাত" এর পরিমাণ কি রকম। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উত্তরে বললেন "দুই বড় পাহাড়ের সমতুল্য"।[৩১৭] সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের ঐ রকম পূণ্য হাসিলের তৈফিক দিক আমিন।

- সহিহাইনে বিশেষতঃ জানাযার নামায সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) এ ধরণের অভিমত দেয়ার কারণ হলো-সহীহ বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী তদীয় গ্রন্থে লিখেছেন: এবং আল্লামা কারমানী সহীহ বুখারী শরীফের অপর একজন ব্যাখ্যাকার তিনিও বলেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.) সালাতে জানাযা অধ্যায়ে হাদীস সমূহ উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, صَلَوَاتُ الْجَنَازَةِ কে হযরত রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত অর্থাৎ নামায বলেছেন, দো'আ বলেননি। যদিও এ নামাযে রুকু, সিজদা নেই। অতঃপর ইহাকে নামায প্রমাণ করার জন্য সাহাবাকে "নামায পড়" বলেছেন। আবার কখনও সালাতে জানাযা এভাবে আদায় করেছেন, যে পদ্ধতিতে জানাযার নামায আমরা আদায় করি। যেমন কথা না বলা, চুপ থাকা, তাকবীর বলে নামায আরম্ভ করা, তাসলীমের সাথে নামায শেষ করা। অজু না করে জানাযা পড়লে তা সহীহ হবে না। তবে মাকরূহ সময়েও জানাযার নামায পড়া যাবে। তাহরীমা'র তাকবির অর্থাৎ ১ম বার ছাড়া পরবর্তী ৩টি জানাযার তাকবীরের সময় শুধু হাত না উঠানো, এছাড়া সালাতে জানাযা নামায হওয়ার কারণেই তো মুক্তাদী ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হয় এবং তাকবীর তাহরিমা বলে নামায শুরু করা।
- নামাযে যেরূপ কাতার বেঁধে দাঁড়াতে হয়, ইমাম থাকে, জানাযার নামাযেও অদ্রুপ ইমাম আছে, কাতার আছে। এতে প্রমাণ হলো, সালাত শব্দটি দ্বিমুখী শব্দ। ইহাকে আরকানে মখসুছা অর্থাৎ কিয়াম, ক্বিরাত, রুকু, সিজদা বিশিষ্ট নামাযের উপর ব্যবহার করা চলবে। রুকু, সিজদা, ক্বিরাত, তাশাহুদবিহিন নামাযকেও সালাত বলা যায়। তাই উভয় ক্ষেত্রে ইহাকে 'নামায' বলা হবে।

[৩১৭]. সহীহ বুখারী-১৩৫২, সহীহ মুসলিম-৯৪৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালাতে জানাযা সম্পর্কে ফোকাহাদের অভিমত

'মাজমাউল আনহার' কিতাবে আছে যে-মুসলিম মৃত ব্যক্তির উপর নামায পড়া সমস্ত আয়িম্মায়ে দ্বীনের মতে ফরজে কিফায়া। কিয়দাংশ লোক জানাযার নামায পড়লে অন্যদের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলে গুনাহ্ গার হবে। যে ব্যক্তি জানাযার নামাযের ফরযকে স্বীকার করবে না, একদল ইমামের মতে, সে কাফির। কেননা, সে জানাযা নামাযের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করলো। জানাযার নামায বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া।

সুতরাং কাফেরদের উপর জানাযার নামায জায়েয নয়। এভাবে মৃত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে গোসল দিয়ে পবিত্র করতে হবে। যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হয়নি, ঐ ব্যক্তির উপর নামায পড়া অবৈধ। কেননা সে ব্যক্তি যেহেতু নাপাক। সেহেতু মৃতকে গোসল দেয়ার পর পুনঃ নামাযে জানাযা পড়তে হবে। গোসল দেয়ার পর যদি বিনা জানাযায় দাফন করা হয় তাহলে কবরের উপর জানাযার নামায পড়া চাই। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ জনৈকা আনসারী মহিলার উপর নামায পড়েছেন।[৩১৮]

'দুররে মুখতার' কিতাবেও আছে যে-মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায পড়া ইমাম গণের ঐক্যমতে ফরযে কিফায়া। যে ব্যক্তি উহা অস্বীকার করবে সে কাফির। কেননা সে ইজমাই উম্মতকে ইনকার করল।[৩১৯]

জানাযার মধ্যে ২টি বস্তু ফরয। (১) ৪টি তাকবীর (২) কিয়াম অর্থাৎ ৪টি তাকবীর ৪ রাকাআত সমতুল্য এবং জানাযার নামাযের ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। বিনা ওজরে বসে পড়লে জায়েয হবে না।

'তাহতাবী' কিতাবে আছে যে-মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়া জীবিতদের জন্য ফরযে কেফায়া। যেরূপ মৃত ব্যক্তির কাফন পরান, দাফন করা, সাজানো ফরযে কিফায়া। এটা আয়েম্মাদের সম্মিলিত মত। যে কেউ এটা ইনকার বা অমান্য করবে সে কাফির হবে। এরূপ বাদায়ে ও কুনিয়া

[৩১৮]. মাজমাউল আনহার-১/১৮২।
[৩১৯]. দুররে মুখতার-১/২০৭।

কিতাবে লিখিত আছে। এর মূলে রয়েছে মহান আল্লাহ্র বাণী যথা- وصل علیهم তাদের উপর নামায পড়ুন।[৩২০]

দ্বিতীয়ঃ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর বাণী। তোমরা নামায পড়: এর তাকবীর সমূহ ফরয এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয। তবে ১ম তাকবীর শর্ত। ইহা আদায়ের জন্য ৬টি শর্ত রয়েছে।

১। মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, কেননা এ নামাযটি মূলতঃ শাফায়াত তুল্য। অতএব, সুফারিশ কাফিরের পক্ষে করা মুসলমানের জন্য হারাম।
২। মৃত ব্যক্তি পবিত্র হওয়া।
৩। জানাযার নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া; এবং যে জমিনে লাশের জানাযা আদায় করবে তার মালিক কর্তৃক জানাযার নামায পড়ার জন্য অনুমোদিত হওয়া।
৪। নামাযীদের সামনে মৃতের লাশ থাকা।
৫। সম্পূর্ণ লাশ বা অধিকাংশ অথবা অর্ধেক অঙ্গ মস্তকসহ নামাযীদের সামনে বিদ্যমান থাকা।
৬। নামাযী ব্যক্তি যানবাহনের উপর না থাকা (চলমান না থাকা)। কেননা, নামায দাঁড়ানো অবস্থায় মৃতকে সামনে রেখে পড়া ফরয।
৭। মৃত ব্যক্তির লাশ যমীনে বা ভূমিতে থাকা। (চলন্ত না থাকা)

এভাবে জানাযার নামাযে হস্তদ্বয় উপরে উঠায়ে (তাকবীরে তাহ্রীমার মতই) তাকবীর বলে আরম্ভ করবে। অতঃপর আর বাকী তাকবীরে হাত উপরে উঠানো যাবে না। দো'য়ায়ে ছানা পড়া হলে পুনরায় তাকবীর বলবে। হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরুদ শরীফ (দুরূদে ইব্রাহীমি) পাঠ করবে। তৎপর তাকবীর বলবেও দো'অ-এ মা'সুরা পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। জানাযার নামাযে কিরাত ও তাশাহুদ নেই। ইমাম মাইয়্যেতের ছিনা (বক্ষ) বরাবর দাঁড়াবে। মুসলমান মৃত ব্যক্তির উপর জীবিতদের জানাযার নামায পড়া ফরজে কিফায়া। এ ব্যাপারে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহা ইমামগণের সম্মিলিত মত। উক্ত জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যাবতীয় শর্তাবলী নামাযের শর্ত সমূহের অনুরূপ।

[৩২০]. তাহতাবী-১/৫৮০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

❖ উপরোক্ত শর্তের আলোকে গায়েবী জানাযা হানাফী মাযহাব অনুসারীদের জন্য জায়েয নয়। এমন কি লাশ ইমামের সামনে যমীনে থাকতে ও রাখতে হবে। চতুস্পদ জন্তু বা কোন কিছুর উপর লাশ চলন্ত রাখাও চলবে না। লাশকে ইমামের পিছনে রাখা যাবে না। সুতরাং যারা এটাকে নামায না বলে দো'আ বলেন, তারা কোন পর্যায়ের ধর্ম বিশারদ চিন্তা করুন। অতএব নিজ জ্ঞানের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রি.) যে কাজ করেছেন আমরা কি সে কাজ করবো না উহার বিপরীত করবো? তবে একথা ঠিক যে, জীদ ও হঠকারী ভাল নয়।

❖ এ ধরনের আরো একটা অভান্তর কথা ও কিছু জ্ঞানপাপীরা বলেন যে, যদি জানাযার নামাযের পর দো'আ করা হয় তাহলে দাফন কাজে দেরী হবে। যেহেতু হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন "জানাযার পরপরেই লাশকে দাফন কর"। উত্তরে বলা যেতে পারে; তাড়াতাড়ি দাফন করার আদেশটি ওয়াজিব নয়; এবং দোয়া মুস্তাহাব; এজন্য যে, নামাযের পর অনেক লোক দাফন না করে বাড়ী ঘরে নিজ নিজ কাজ কর্মে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সে জন্যই সালাম ফেরানোর পরেই খাস দো'আ মাইয়্যেতের জন্য করার আদেশ হাদীস শরীফে এসেছে। যেন সকলে উক্ত দোয়ায় শরীক থাকেন।

সিহা সিত্তাহ্ গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফে আছে যে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, যখন তোমরা মাইয়্যেতের উপর নামায পড়ে শেষ করবে। তৎপর মাইয়েতের জন্য খাছ করে দো'আ কর" ৩২১। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মীরক বলেছেন, যথা-

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوْبِ تَخْصِيْصِ الْمَيِّتِ بِالدُّعَاءِ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ اُدْعُوْا بِالْاِعْتِقَادِ وَ الْاِخْلَاصِ ـ

[৩২১] . আবু দাউদ-৩১৯৯, ইবনু মাজাহ-১৪৯৭, সহীহ ইবনু হিব্বান-৩০৭৬।

বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত, মাইয়্যেতের জন্য খাছ দো'আ করা ওয়াজিব। ইবনে মালিক বলেছেন, মাইয়্যেতের জন্য নীরেট আন্তরিকতার সাথে দো'আ করতে বলা হয়েছে। যা আমরা দো'আয়ে মাসূরায় পড়ে থাকি

ঐ দোয়াটি উপস্থিত সকল মুসল্লী ও সকল মুসলিম উম্মাহ্র জন্যই। স্ববিশেষভাবে মাইয়্যেতের জন্য নয়। উপস্থিত মুসল্লি ও বিশ্বমুসলিমের জন্য দোয়ার কথা উক্ত দোয়ায়ে মাসুরাতে রয়েছে।

হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযান্তেদো'আ করেছেন ও নামাযীগণকে মাইয়্যেতের নির্দিষ্ট নাম উল্লেখপূর্বক মাগফেরাত তলব করার জন্য বলেছেন। কবীরী দ্রষ্টব্য।

❖ এছাড়া ঐতিহাসিক আল্লামা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন সালেহ আসেম বিন ওমর বর্ণনা করেছেনএছাড়া হাদীস নববী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র বর্ণনাও পেয়েছি আবদুল জব্বার বিন ওমারা ও আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর হতে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, যখন মুসলমানগণ মুতার রণাঙ্গনে যুদ্ধলিপ্ত ছিলেন, তখন হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরে ওয়াজরত ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর জন্য শাম (সিরিয়া) হতে মদীনার মসজিদে নববী শরীফ পর্যন্তদীর্ঘ দুরত্বের পর্দা আল্লাহর হুকুমে উঠায়ে দেয়া হয়েছিল। এর ফলে হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুতার' রনাঙ্গণ স্বচক্ষে দেখতে দেখতে বলতেছিলেন; এখন হযরত জায়েদ বিন হারেছা (রা.) ঝান্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করেছেন ও শহীদ হয়ে গেলেন। এই বলে তিনি তাঁর উপর (আমরাসহ) জানাযার নামায পড়লেন ও দো'আ করলেন। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম (রি.)'কে বললেন তোমরা তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা কর। আমি দেখতেছি- সে জান্নাতে প্রবেশ করে ছুটাছুটি করছে; এবং এবার জাফর বিন আবু তালিব (রা.) ঝান্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করছে; এমনকি এখন শাহাদাতের জাম পান করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তিনি একথা বলে তার জানাযার নামায পড়লেন ও তার জন্য দো'আ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

(রি.)'কে তাঁর জন্য ইসতেগফার করতে বললেন। আরো ইরশাদ করলেন; সে বেহেশতে প্রবেশ করে দু'বাজু দ্বারা সেখানে উড়ছে।[৩২২]

- ❖ কতহুল কাদীর কিতাবে, জানাযার নামাযের অধ্যায়ে হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) ও জাফর বিন আবু তালিব (রা.) মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার ঘটনা। ইমাম ওয়াকেদীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে; মুহাম্মদ বিন সালেহ ও আব্দুল জাব্বার বিন ওমারা দু'জনে ইনারা ইমাম ওয়াকেদী থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর এবং ভিন্ন এক মুহাদ্দিস হযরত আছেম বিন ওমর হতেও উপরোল্লিখিত বর্ণনা রয়েছে।
- ❖ এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রা.)'র মত প্রখ্যাত মুতাখেরীন সাহাবাদ্বয় জনৈক সাহাবীর জানাযা শেষ হওয়ার পর উপস্থিত হলে তাঁরা পুনঃ নামায পড়লেন না। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য শুধু দোয়ায়ে মাগফিরাত করলেন।[৩২৩]
- ❖ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) ইয়াহুদী ধর্মের বড় প্রজ্ঞাবান আলেম ছিলেন। পরে মুসলমান হয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ফারুকে আযম (রা.)'র উপর মুসলমানগণ জানাযার নামায শেষে তিনি উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন;

إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ

আপনারা যদিও আমাকে জানাযার নামায পড়ে মসবুক করেছেন; কিন্তু তার জন্য দো'আ করার সময় আমাকে মসবুক করবেন না।[৩২৪]

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানা হতে সালাতে জানাযার পর দো'আ করার রীতিনীতি বর্তমানের মত ছিল; অতএব, এটা বিদায়াত নয়; বরং সুন্নাত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) ছিলেন মুতাকাদ্দেমীনে সাহাবার অন্তর্ভুক্ত। আর হযরত ওমর (রা.)'র পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.)'র পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা.)'রা ছিলেন মুতাখেরীনে সাহাবার অন্তর্ভুক্ত। এতে সম্মানিত পাঠক অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন, মূলতঃ জানাযার নামাযান্তে দো'আ করা

[৩২২]. মাগাযিউল ওয়াকেদী-২/৭৬২।
[৩২৩]. মাবসূতে সারাখসী-২/৬৭।
[৩২৪]. মাবসূতে সারাখসী-২/৬৭।

সাহাবায়ে কেরাম (রি.)'র যুগেও বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া উক্ত আমলের কেহ প্রতিবাদ করেননি; বরং সর্বসম্মত ঐক্যমত্য বা ইজমা হয়েছিল।

ফিক্বহ্শাস্ত্রের বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ, ফাতওয়ায়ে শামীতে রয়েছে, যখন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়, যা কোন ৪ বরহক মাযহাবের ইমামগণে ইজতেহাদী মাসয়ালার খেলাফ বা বিপরীত না হয়, এমতাবস্থায় উক্ত হাদীস শরীফের উপর আমল করা হবে সর্ব্বৈব বৈধ। আর ঐ হাদীস শরীফ অনুযায়ী আমল করা প্রকৃত পক্ষে চার বরহক ইমামের- মযহাব অনুযায়ী আমল করারই নামান্তর। এতে ঐ ব্যক্তি হানাফী বা কোন মাযহাব হতে বের হয়ে যাবে না।[৩২৫]

কেননা, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) সহ সকল মাযহাবের ইমামগণ (রাহেমাহুমুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন- إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ অর্থাৎ সহীহ হাদীস শরীফ আমার মযহাব বা মত ও পথ। ইমাম শা'রানী উক্ত বাণী চারি মযহাবের ইমামগণ হতে বর্ণনা করেছেন।

'মীযানে কুব্রা' গ্রন্থে আল্লামা শা'রানী (রাহ্.) লিখেছেন- تَعْزِيَتْ বা শোক প্রকাশ দাফনের পরে না করে আগে করাই উত্তম। তিনি লিখেছেন-ইমাম আবু হানীফা ও ছুফিয়ান সাওরী (রাহ্.) বলেছেন, দাফনের আগে শোক প্রকাশ করা সুন্নাত, পরে নয়। কেননা, দাফনের পূর্বে অত্যাধিক পেরেশানী থাকে। তাই দাফনের আগেই শোক প্রকাশ করবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করবে। তাছাড়া হাদীস শরীফে আছে- اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দো'আ এবাদত বা আসল এবাদতই হচ্ছে দো'আ।[৩২৬]

দো'আ করার জন্য কোন খাস সময় নিদ্ধারিত নেই। সুতরাং দাফনের আগে ও পরে দো'আ করা জায়েয। এমনকি জানাযার নামায বাদ সাথে সাথেই দো'আ করা জায়েয।

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ তাহতাবী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,

- وَإِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ لَمَّا مَاتَ فَخَتَمَ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قَبْلَ الدَّفْنِ-

ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) এর ইন্তেকালে তার লাশ দাফন করার পূর্বে ৭০ হাজার বার কুরআন শরীফ খতম তিলাওয়াত করা হয়েছে।

[৩২৫]. দুররে মুখতার-১/৬৩।
[৩২৬]. জামে' তিরমিযী-৩৩৭১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস শরীফে এসেছে-اَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ তোমরা বেশী বেশী দো'আ কর। সুতরাং যদি কেহ বলে সালাতে জানাযা দো'আ বটে; নামায নয়। অতএব দো'আ তো হয়ে গেছে! পুনঃ দো'আর কি প্রয়োজন? তদুত্তরে আমি বলব যে, আমরা মুসলমান হিসাবে যে কোন নামায পড়ি; উক্ত ফরয নামাযে নুন্যতম পাঁচ ওয়াক্ত এর রাকাতে ফরিযা বিবেচনা করলে প্রত্যেক দুই, তিন, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকাতে দো'আয়ে মাসুরা ১৭ বার পাঠ করতে হয় (বিতিরের ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ব্যতিরেকে) তাও তো দো'আ। অতএব, পাঁচ ওয়াক্তে ১৭ বার পাঠ না করে শুধু এক ওয়াক্ত নামাযে পাঁচ বার পড়ে নিলে তো হয়; কিন্তু আমরা আপনারা কি তা করি? না। কেননা এ দ্বারা নামায হবে না।

তাছাড়া হাদীস শরীফে এসেছে: হযরত রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কে প্রশ্ন করা হয়ে ছিল। মহান আল্লাহ্ কোন দো'আ বেশী শুনেন ও মঞ্জুর করেন। তদুত্তরে তিনি এরশাদ করেছেন, শেষ রাত্রির দো'আ ও ফরজ নামাযান্তের দো'আ। [৩২৭]

সর্বোপরি পাঠক খেদমতে আমার মতে যৌক্তিক একটা দিক উপস্থাপন করছি যে, সালাতে জানাযা আদায়ের পর দাফন কার্য সম্পাদন করতে অবশ্যই কিছু সময়ের প্রয়োজন হয় ঐ পর্যন্তদূরদূরান্তহতে আগতরা চলে যান; বিধায় সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস দরুদ শরীফ পড়ে দো'আ করলে অপরাধটি কোথায় আমার আজো অবধি বোধগম্য নয়।

প্রিয় পাঠক! আপনারা সকলে জানেন, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মাইয়্যেতের উপর অলীর অনুপস্থিতিতে অন্যান্য লোকেরা কয়েক বার জানাযার নামায পড়েন। উহা সকল ইমামের মতে জায়েয। অতএব দো'আর পরে দো'আ, সকল ইমামের মতে দো'আ করা জায়েয। আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা (রা.) এর ৬ বার সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ্।

নির্ভরযোগ্য ফিক্বহ্ শাস্ত্রের ইতিহাসের গ্রন্থ পর্যালোচনায় দেখতে পাই, যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম জানাযার নামাযকে বড় গলায় দো'আ বলেন। নামায স্বীকার করতে চান না! তাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলছি, অযথা গালমন্দ না করে জনগণকে ধোকা না দিয়ে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিন।

[৩২৭]. জামে' তিরমিযী-৩৪৯৯, সুনানে কুবরা নাসায়ী-৯৮৫৬।

দেখুন; ছাহেবে শরীয়ত ও বিশ্ববিখ্যাত সর্বজন শ্রদ্ধেয় শরীয়তের আলেম সম্প্রদায় এ নামাযে কয়টি ফরয, কয়টি ওয়াজিব, কয়টি সুন্নাত ও শর্ত রয়েছে বিস্তারিতভাবে কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

সম্মানিত পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, হানাফী ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর সার কথা হল যে, মাইয়্যেতের জানাযার নামায পড়া ফরযে কেফায়া এবং বর্তমান আমাদের রূপে মাইয়াতকে কাফন, দাফন ও মাইয়্যেতকে সাজানো ফরয। এ নামাযের ফরয হচ্ছে দাড়ানো অবস্থায় নামায পড়া ও তাকবীর সমূহ বলা। তবে প্রথম তাকবীর এক হিসেবে শর্ত অন্য দিক দিয়ে রোকন বা ফরয। যেমন বাকী ৩ তাকবীরও ফরয এবং প্রত্যেকটি তাকবির রাকাত সমতুল্য। এভাবে জানাযার নামাযের শর্ত সমূহ ফিক্হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব "মুহিত" নামক গ্রন্থে ৬টি শর্তের ও ৪টি সুন্নাতের ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা উপরে করা হয়েছে।

তাছাড়া বিশ্ববিখ্যাত ফক্বিহ্ মুহাদ্দিস গ্রন্থারিকগণ যেমন- ছাহেবে কুদুরী, শরহে বেকায়া, হিদায়া, কাযীখান, মাযমাউল আনহার, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদি গ্রন্থে জানাযার নামাযান্তে দাফনের আগে বা পরে দো'আ মুনাজাত না করার ব্যাপারে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। অর্থাৎ দো'আ মুনাজাত করতে পারবেনা বা দো'আ করা নিষেধ এমন কোন কিছুর আলোচনা নেই। তার মানে বাদ সালাতে জানাযা দোয়া করা বিদআতে সাইয়া একথা তো বলেনই নাই, বরং দোয়া বাদ সালাতে জানাযা উত্তম আমল হিসাবে সাব্যস্থ করেছেন। বিপুল সংখ্যক মুফাচ্ছেরিন মুহাদ্দেসিন রাহমাহুমুল্লাহ্গণ। আসলে এর মূল রহস্য ভিন্ন জায়গায়। যা বিজ্ঞ পাঠক বলতেই জানেন যে, মিশকাতে উলুমে মুস্তাফাবিয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিস্সা সকল মুহাদ্দেসীন ও ফকীহগণ সমভাবে প্রাপ্ত হননি। নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ। ফলে তাঁদের জ্ঞান; ও গবেষণার ফসল ফতোয়া বা জ্ঞানও সমান নয়।

সকলের নজরে সব হাদীস পরিলক্ষিত হলেও রির্চাসের দ্বারা নিজ নিজ গবেষণা সম্ভার বের করেছেন যেমন আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে (র.) হুমাম ফতহুল কাদীর শরহে হিদায়া গ্রন্থে আল্লামা ওয়াকেদী হতে মুতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারেছা ও জাফর বিন আবী তালেবের (রা.) শাহাদাতের হাদীস বর্ণনা করে হযরত রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামায পড়া ও দোয়া করা সাব্যস্ত করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এভাবে শায়খ ইব্রাহীম হালবী (রাহ.) কবীরী নামক বিশ্ববিখ্যাত ফিক্বাহ্ শাস্ত্র গ্রন্থে আল্লামা ওয়াকেদী (রাহ্.) হতে মুতার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত যায়েদ বিন হারেছা ও জাফর বিন আবি তালেবের (রা.) উপর জানাযার নামায পড়া ও দোয়া করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামছুল আয়িম্মা ছারাখসী (রাহ.) মবসুত গ্রন্থে জানাযার নামাযান্তে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা.) হতে দোয়া ও ইসতেগফার করার হাদিস বর্ণনা করছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম হতে হযরত ওমরের (রা.) জানাযার পর দোয়া ইসতেগফার করা সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা আইনী ছহীহ বুখারী শরীফের বিশদ ব্যাখ্যাকার তদীয় গ্রন্থে নামাযে জানাযার পর মুতার যুদ্ধের দোয়া করার হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা উপরে স্ববিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া এ সম্পর্কে আরো একটি হাদিস বা সিহাহ্ সিত্তার কিতাব আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ ـ

হযরত রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এর বাণী তোমরা যখন মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায সমাপ্ত করবে: তৎক্ষনাত তার জন্য খাস দোয়া কর।

বর্ণিত হাদীছ শরীফের বাক্য فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ পবিত্র কুরআন কারীমের সূরা তাহ্রীমের একটি আয়াতের অর্থের মত সামঞ্জস্যপূর্ণ;- فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا অর্থাৎ- তোমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে খাওয়ার পর বিলম্ব না করে যখন তখন বের হয়ে যাও। এছাড়া অনুরূপ এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মাইয়্যেত কে তাড়া তাড়ি দাফন কর। তার মানে হচ্ছে, দাফন কাজে দেরী না করা মুস্তাহাব। তাই জানাযার সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই বিলম্ব না করে দোয়া করা সুন্নাত। এভাবে এই পন্থায় উভয় হাদীস শরীফের উপর আমল করা যায়।

এখন কথা হলো এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ব্যক্তিগত কোন মত আছে কিনা? উত্তরে বলবো, পরম ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণ দরবেশ বাদশা আলমগীর আওরঙ্গজেব সারা ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ৭০০ আলেম দ্বীনদের একত্রিত করে হাদীস তাফসীর ফিক্হ শাস্ত্রের বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন ও গবেষণা ব্যয়ভার

প্রদান করে মুসলিম জাহানের অনন্য দিশারী গ্রন্থ 'ফাতোয়ায়ে আলমগীরি' নামক ফতোয়ার কিতাব সংকলন করায়েছেন। যার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ وَ لَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ ـــ

অর্থাৎ- অতঃপর জানাযার নামাযের ৪র্থ তাকবীর বলে দু'সালাম দিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম দেয়ার পূর্বে কোন দোয়া নেই।[৩৮]

কিন্তু সালাম দেয়ার পর কোন দোয়া আছে বা নেই এ সমন্ধে কোন মতামত বিশ্ববিখ্যাত ঐ ফতোয়া গ্রন্থে লিখেননি। হ্যাঁ এর উত্তরে বলব সব বিষয়ে সব কিতাবে মতামত দিতে হবে, এটা শর্ত নয়, আর যেহেতু পবিত্র সুনান ও আলে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা বিষয়টি সভ্যস্ত, তাই মতামত দেয়নি। তাছাড়া কতগুলি উল্লেখ যোগ্য কিতাবে এ দোয়া, ইসতেগফার করার কথা উল্লেখ আছে এবং ফিক্হ শাস্ত্রের উর্দ্ধতন তবকার কিতাবেও এসব হাদীস সমূহ অত্যন্ত বিশুদ্ধতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত সুন্নাহ্ সমূহ নিখুত হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

এভাবে ইমাম আজম, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্মল (র.) সকলের ঐক্যমত্য-اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ সহীহ্ হাদীসই আমার পথ ও মত। যার ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে তাই যে সমস্ত মুফতীগণ জানাযার নামাযের সালাম দেয়ার পর দোয়া করাকে মকরূহ বা বিদয়াত লিখেছেন; তা ভিত্তিহীন। কারণ কোন সুন্নাহ্ বা হাদীস শরীফ এর আমল বাতিল করতে হলে তার প্রতিকূলে সুন্নাহ্ বা হাদীস পেশ করতে হবে।

অতএব, উক্ত দোয়া না করা সংক্রান্ত অনুকূলে কোন হাদীস শরীফ উল্লেখ নেই। ফিক্হ শাস্ত্রের কোন নির্ভরযোগ্য ও উর্দ্ধতন কিতাবের বরাত পৃথিবীতে মওজুদ নেই। তাই দূর্লভ অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাতের মতবাদ গ্রহণীয় নয়; বরং বর্জনীয়। কেননা সালাতে জানাযায় দোয়ায়ে মাসূরার মধ্যে আম ভাবে সমস্ত জীবিত ও মৃতদের পুরুষ হউক মহিলা ছোট বড় সবার জন্য এমনকি উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্য দোয়া করা হয়।

---

৩৮. আলমগীরী-১/১৬৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষান্তরে হাদীস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র নির্দেশ মোতাবেক খাসভাবে মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করার সালামান্তে আমল করতে তাছাড়া হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বাদ সালাতে জানাযা সালামান্তে দোয়া করেছেন এবং তাঁরা ঐ আমল করে উম্মতগণকে দোয়া করতে আদেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং দোয়া করা সুন্নাত সাব্যস্ত হলো। দোয়া না করা পক্ষান্তরে হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় সাহাবায়ে কেরামের (রা.) সুন্নাত তরীকার বিরোধীতা করা নামান্তর। কেননা নবী পাকের সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা;

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

অর্থাৎ- আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের (রি.) সুন্নাত ধারণ করা তামাদের উপর আবশ্যক। সেগুলোকে তোমরা মাড়ির দাঁত দ্বারা আকড়ে ধর।[৩২৯]

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র স্বরূপ, তাঁদের যে কোন একজনকে অনুকরণ করলে সত্যের সন্ধান পাবে।[৩৩০]

তাছাড়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল যাবতীয় নামাযের ভিতরে আমরা দোয়ায়ে মাছুরা পড়ি। আবার সালামান্তেহুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র নির্দেশ মতে আমরা দোয়াও করে থাকি। অতএব জানাযার নামায তো সালাতে ফরযে কেফায়া; এক্ষেত্রে দোয়া করতে বাধা কিসের? এছাড়া সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণ যে, নামায বাদ দোয়া আল্লাহ্র নিকট বেশী মকবুল।

[৩২৯]. তাহাবী-১১৮৬, আস-সুন্নাহ লিল-মিরওয়াযী-৭২, শরহুস সুন্নাহ লিল-বাগভী-৪/১১৯।
[৩৩০]. আশ-শরীয়াহ লিল-আজরী-১১৬৬, আল-ইবানাতুল কুবরা-৭০২।

জানাযার নামায বাদ হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইয়্যেতের জন্য খাছ দোয়া করেছেন। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ক'টি সুনানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠক খেদমতে পেশ করছি যেমন "কানযুল উম্মাল" নামক বিশ্ববিখ্যাত সর্ব্ব মাযহাব সমভাবে সমাদৃত গ্রন্থে বর্ণিত

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهِجْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ اَوْفَى وَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَ مَاتَتِ ابْنَتُهُ اِلَى اَنْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَدْعُوْ - وَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ عَلَى الْجَنَائِزِ هٰكَذَا

-

অর্থাৎ- হযরত ইবরাহীম হিজরী (র.) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত ইবনে আওফাকে (র.) দেখেছি. যিনি বাইয়াতুর রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কন্যার মৃত্যু হলে তিনি ৪ চার তাকবীরে জানাযার নামায পড়েন। অতঃপর দু'তাকবীরের মাঝখানের যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তৎসমপরিমাণ দাঁড়িয়ে দোয়া করছেন এবং বলছেন, নিশ্চয়ই হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইয়্যেতের উপর এইরূপ দোয়া করতেন। [৩৩১]

নিম্নে হযরত ওয়াসেলা (র.) কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীস যা আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ - وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ—

অর্থাৎ- ওয়াছিলা ইবনু আসকা (র.) হতে বর্ণিত হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে এক ব্যক্তির-উপর জানাযার নামায পড়লেন। আমি শুনলাম। তিনি মহান আল্লাহ্র দরবারে ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করলেন এভাবে; হে প্রভু! ওমুকের পুত্র ওমুক তোমার জিম্মায় ও তোমার

[৩৩১]. কানযুল উম্মাল-১৫/৭১৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশ্রয়ে, তাকে তুমি কবরের পরীক্ষা হতে রক্ষা কর। দোযখের আযাব হতে বাচাও। তুমি ওয়াদাও হক পূরণ কারী। অতএব তুমি তাকে মাফ কর ও দয়া কর তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান । [৩৩২]

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি রাওয়ায়েতও নিম্নে পেশ করলামঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ"-

অর্থাৎ- হযরত আউফ বিন মালিক আশজায়ী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক মাইয়্যেতের উপর নামায পড়ে এই দোয়া করলেন। হে প্রভু! তাকে ক্ষমা করে দাও, দয়া কর, রক্ষা কর, গোনাহের প্রতি দৃষ্টি দিওনা। তাকে সম্মানিত স্থানে রাখ, তার বাসস্থান, প্রশস্ত কর, তাকে ঠাণ্ডা ও বরফের বিশুদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও। যে রূপ সাদা পোশাক হতে ময়লা দূর করা হয় তদ্রুপ গোনাহ হতে তাকে ছাফ পবিত্র করে দাও। তার বাসগৃহ হতে উত্তম ঘর তাকে দান কর। তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার দাও। তার বিবি হতে উত্তম বিবি প্রদান কর, তাকে বেহেশতে দাখিল কর, কবরের আযাব, কবরের পরীক্ষা ও দোযখের আযাব হতে নিস্কৃতি দাও। [৩৩৩]

ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দিওবন্দ ৫/৪১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। যথা-জানাযার নামাযের পর যদি সকল লোক অথবা কিছু লোক সূরা ইখলাছ তিন বার পড়ে মৃত ব্যক্তির প্রতি ছওয়াব রসানী করে তাতে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। যদিও ঐ ফতওয়ার কিতাবের ভিতর কয়েক জায়গায় জানাযার পর দোয়া করা মাকরূহ লিখেছেন। তবে মজার ব্যাপার হল, তার অনুকূলে কোন দলীল উল্লেখ নেই। মনে হয়, উল্লেখিত জবাব লিখকের ভ্রম সংশোধনী জবাব।

[৩৩২]. সুনানু আবু দাউদ-৩২০২।
[৩৩৩]. সহীহ মুসলিম-৯৬৩।

অতএব, উপরোল্লেখিত দলীলাদি পাঠ করে সকলে আমল করবেন; মু'মিন ভাইগণের খেদমতে আমি এ প্রত্যাশা রাখি। উল্লেখ্য যে, মাযহাবের ইমামগণের পক্ষ হতে কোন বাধা না থাকলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও আমল পালন করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য একান্ত জরুরী ও ওয়াজিব। শুধুমাত্র খুসুসিয়াতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া ভিন্ন বিষয় নিয়ে অযথা বাক বিতণ্ডা করে নিজেকে এবং অপর মুসলমান ভাইকে সৎ কর্ম পালন থেকে বিরত রাখা নিরর্থক এবং নিজেকে কৃপণের লিষ্টভুক্ত করারই নামান্তর। আশা করি উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারিদের মনে কোন সন্দেহ বাকি থাকবে বলে আমি মনে করিনা।

এছাড়া প্রিয় পাঠক বৃন্দের খেদমতে একথাও আরজ করা সমীচীন মনে করছি যে, এতগুলো হাদিস, আমালে রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমালে সাহাবা ও তাবেয়ীন তাবে-তাবেয়ীনদের (রি.) কৃত কার্য এবং ফুক্হায়ে কিরামগণের (রাহ্.) কুরআন সুন্নাহ্ নির্যাসিত ফতোয়া আপনি আপনার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য কৃপনতাবশতঃ না করলে আমার করার বা বলার কিছুই নাই। আর এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, হাদিস জয়িফ (দুর্বল) হলে বেশী সংখ্যক বর্ণনার প্রেক্ষিতে ঐ হাদিস সবলের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়। তাই আমি বলব চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণকারী আপনার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সদয় হয়ে সালাতে জানাযাতো পড়বেনই: এর পর ফাতেহা, সুরা এখলাস, দরুদ শরীফ পড়ে মাইয়তের রূহের সাওয়াব রসানীর উদ্দেশ্য দোয়া করবেন।

অতএব, মনগড়া ও দলীল ছাড়া ফতওয়া প্রদান বা মুখের বাহুবলের কথা বর্জন করবেন। দুনিয়া ও আখেরাতে এর ফল অবশ্যই পাবেন। ইয়া আল্লাহ্! আমার অবুঝ ভাইদেরকে বুঝবার শক্তি দাও এবং বিশুদ্ধ ফতোয়া মোতাবেক আমল করার তাওফীক ইনায়ত কর। আমীন।

সালাতে জানাযা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য:

জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির লাশ মুসল্লীদের বা ইমামের সামনে থাকতে হবে। গায়েবানা জানাযা হানাফী মাযহাব মতে দুরস্ত নহে। [৩৩৪]

[৩৩৪]. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী-১/১৬৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা অজানা বশতঃ বা গোঁড়ামীতে বশীভূত হয়ে হানাফী মাযহাবে ভিত্তি নেই এমন এক পন্থা 'সালাতে গায়েবানা' নামায পড়ে বসে এবং এতে বাড়াবাড়ির এক পর্যায়ে গিয়ে মহাবনী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজস্ব কিছু কর্মকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে যা সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত গর্হিত কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃত গায়েবানা জানাযা খুসুসিয়াতে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তেই অন্তভূর্ক্ত। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩টি বিবাহ্ করা। কিন্তু উম্মতের জন্য ৪টির উর্দ্ধে বৈধ নয়। [৩৩৫]

নিম্নে গায়েবানা জানাযা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল।

গায়েবানা জানাযা: শরয়ী অবস্থান

মানুষ মারা গেলে তাকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য এবং তার রূহের মাগফিরাতের জন্য যে শেষ-বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং তাতে যে বিশেষ পদ্ধতিতে নামায পড়া হয়, তার নাম সালাতুল জানাযা। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও অনাড়ম্বর পরিবেশে এই জানাযার নামায আদায় করা হয়ে থাকে। মৃতের মাগফিরাত কামনায় এই জানাযার নামায আদায় করা জীবিতদের জন্য শরয়ী দায়িত্ব। হযরত আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«حَقُّ الْـمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْـمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْـجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».

অর্থাৎ- একজন মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থের খোঁ-জখবর নেয়া, জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেওয়া। [৩৩৬]

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

[৩৩৫]. প্রাগুক্ত।
[৩৩৬]. সহীহ বুখারী-১২৪০

«خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْـجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً».

অর্থাৎ-পাঁচটি আমল এমন আছে যে ব্যক্তি কোনো দিন ওই আমলগুলো করে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতবাসীদের অর্ন্তভুক্ত করে দেবেন। রুগীর খোঁজখবর নেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, জুমুআর দিন রোযা রাখা, জুমুআর নামাযের জন্য প্রত্যুষে রওয়ানা করা এবং একটি গোলাম আযাদ করা। [৩৩৭]

আরেক হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ جَبَلَيْنِ عَظِيْمَيْنِ».

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযায় অংশগ্রহণ করে জানাযার নামায আদায় করে তার জন্য রয়েছে এক কিরাত সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি জানাযায় শরিক হয়ে দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তার জন্য রয়েছে দুই কিরাত সমপরিমাণ সাওয়াব। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুই কিরাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি বৃহৎ পাহাড়ের সমপরিমাণ সাওয়াব। [৩৩৮]

শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার নামায আদায় করা ফরজে কিফায়া। কোনো এলাকায় যদি কাউকে জানাযার নামায ছাড়া দাফন করে দেওয়া হয় তাহলে ওই এলাকার সবাই ফরয তরক করার কারণে গুনাহগার হবে। তবে কিছু লোক যদি জানাযা আদায় করে, তাহলে সবাই দায়মুক্ত হবে।

[৩৩৭]. সহীহ ইবনে হিব্বান-২৭৭১
[৩৩৮]. সহীহ বুখারী-৩০৭৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ

জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে।

১. মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। কোনো অমুসলিম, কাফের, নাস্তিক-মুরতাদের জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়।

২. মৃত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। কাজেই মৃত নবজাতক বা মৃত ভ্রূণের জানাযার নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।

৩. মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাপড় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের নাপাকি থেকে পবিত্র হতে হবে। চাই সে পবিত্রতা গোসলের দ্বারা হোক বা তায়াম্মুমের দ্বারা হোক। সুতরাং কোনো মৃত ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবে গোসল ও অপারগতাবশত তায়াম্মুম করানো ছাড়া জানাযার নামায পড়ালে তা শুদ্ধ হবে না। পবিত্র করানোর পর পুনরায় নামায পড়াতে হবে।

৪. মৃতের সতর আবৃত থাকতে হবে। অন্যথায় জানাযার নামায সহিহ হবে না। সুতরাং পুরুষ ও মহিলার জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণ তার সতর হিসেবে গণ্য, সে পরিমাণ সতর ঢেকে রাখতে হবে। অন্যথায় তার জানাযার নামায শুদ্ধ হবে না।

৫. মৃতের লাশ ইমাম ও মুক্তাদিগণের সামনে থাকতে হবে। পাশে বা পিছনে থাকলে বা একেবারে অনুপস্থিত থাকলে জানাযা শুদ্ধ হবে না।

৬. মৃতের লাশ মাটিতে বা খাটিয়ার ওপর রাখতে হবে। কোনো ওজর ছাড়া মৃতের লাশ জানবাহনের ওপর বা মানুষের কাঁধের ওপর রেখে জানাযার নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না।

৭. মৃতের লাশ অবশ্যই জানাযা স্থলে উপস্থিত থাকতে হবে। অনুপস্থিত লাশের ওপর জানাযা অর্থাৎ গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয নয়।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আমাদের সমাজে যারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে বা সহিংসতায় মারা যান, কর্মসূচি দিয়ে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয়। যেহেতু এক জায়গায় একত্রিত হয়ে সবাই মিলে তার জানাযার নামায পড়া সম্ভব নয় সে কারণেই মৃত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার গায়েবানা জানাযা পড়া

হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় বড় কোনো আলেম বা পীর-মাশায়েখ মারা গেলে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান থাকার কারণে তার জানাযার নামায পড়তে আগ্রহ বোধ করে। এসব ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত গায়েবানা জানাযার আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু গায়েবানা জানাযা জায়েয কিনা এ বিষয়টিকে কেউ ক্ষতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন না। যেহেতু জানাযার নামায একটি ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয় তাই ধর্মীয় শর্তাবলী ও বিধি-বিধান মেনেই তা পালন করা উচিত। দুঃখের বিষয় হলো,সম্প্রতি জানাযার বিধি-বিধানকে চরম উপেক্ষা করে এই মহান ইবাদতটিকে পলিটিক্যাল ফ্যাশনে রূপ দেয়া হয়েছে,যা কিছুতেই কাম্য নয়।

হানাফী, মালিকী মাযহাবের সব ফকিহ ও হাম্বলী মাযহাবের ফকিহদের একাংশের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, লাশ অনুপস্থিত রেখে গায়েবানা জানাযা জায়েয নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ যুগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সে যুগে গায়েবানা জানাযা পড়ার কোনো প্রচলন ছিল না। অথচ সে যুগেও বড় বড় সাহাবি দূর-দূরান্তে ইন্তেকাল করেছিলেন; কিন্তু তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয়নি। যেমন বীরে-মাউনার ঘটনায় সত্তরজন কারী আলেম সাহাবির শাহাদাতের খবর পেয়েও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবানা জানাযা পড়েননি। এমনকি স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পরও কোথাও কোনো সাহাবী এমনকি মক্কা শরিফ যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান সেখানেও কোনো গায়েবানা জানাযা পড়া হয়নি। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো কাজ ব্যাপকভাবে বর্জন করা তা বর্জনীয় হওয়ার প্রমাণ।

হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন,

وَشَرْطُ صِحَّتِهَا إِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَوَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي، فَلِهَذَا الْقَيْدِ لَا تَجُوزُ عَلَى غَائِبٍ وَلَا حَاضِرٍ مَحْمُولٍ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا مَوْضُوعٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي، وَهُوَ كَالْإِمَامِ مِنْ وَجْهٍ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

'জানাযা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, মৃতকে মুসলমান হতে হবে। পবিত্র হতে হবে এবং লাশ মুসল্লিদের সামনে রাখতে হবে। কাজেই অনুপস্থিত লাশের ওপর গায়েবানা জানাযা জায়েয নয়।[৩৩৯]

এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লাশ ছাড়া জানাযা তথা গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয নয়। ফাতহুল কদীরেরই অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

ثُمَّ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى غَائِبٍ إِلَّا عَلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ سِوَى النَّجَاشِيِّ صَرَّحَ فِيْهِ بِأَنَّهُ رُفِعَ لَهُ وَكَانَ بِمَرْأًى مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تُوُفِّيَ خَلْقٌ مِنْهُمْ j غَيْبًا فِي الْأَسْفَارِ كَأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَالْغَزَوَاتِ وَمِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ كَانَ الْقُرَّاءُ، وَلَمْ يُؤْثَرْ قَطُّ عَنْهُ بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَكَانَ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَرِيْصًا حَتَّى قَالَ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُوْنِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ لَهُ» عَلَى مَا سَنَذْكُرُ.

'বহু সাহাবায়ে কেরাম এমন রয়েছেন, যারা বিভিন্ন সফরে মদিনার বাইরে ইন্তেকাল করেছেন। যেমন সিরিয়া বা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে। এক বীরে মাউনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডেই শহীদ হয়েছেন সত্তরজন সাহাবী। যারা ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; কিন্তু তিনি তাদের কারো গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জানাযায় শরীক হতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যে কারণে তিনি বলে রাখতেন, তোমাদের মধ্যে কারো ইন্তেকাল হলে আমাকে সংবাদ দিবে। যাতে আমি তার জানাযা পড়তে পারি। কারণ আমি যার জানাযায় শরীক হবো তা তার জন্য রহমতের কারণ হবে।[৩৪০]

আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন,

وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ.

[৩৩৯]. আওনুল মা'বুদ শরহু সুনানি আবী দাউদ- ৯/৮

[৩৪০]. ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া-২/১১৭

এজন্যই আমাদের ওলামারা বলেছেন, অনুপস্থিত লাশের ওপর জানাযা তথা গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না।[৩৪১]

বিখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থ আদ-দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে,

حُضُوْرُهُ (وَوَضْعُهُ) وَكَوْنُهُ هُوَ أَوْ أَكْثَرُهُ (أَمَامَ الْمُصَلِّي) وَكَوْنُهُ لِلْقِبْلَةِ فَلَا تَصِحُّ عَلَى غَائِبٍ.

জানাযা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, মৃতের লাশ মুসল্লিদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা। কাজেই গায়েব বা অনুপস্থিত লাশের ওপর জানাযা জায়েয নয়।[৩৪২]

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ভাষ্যকার হাফিজ ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ غَائِبٍ فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ غُيَّبٌ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ-গায়েবানা জানাযা পড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দূর-দূরান্তে বহু সাহাবায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেছেন; কিন্তু তিনি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়েননি।[৩৪৩]

মোটকথা হানাফী ও মালিকী মাযহাবের ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, গায়েবানা জানাযা জায়েয নয়। জানাযা পড়তে হলে অবশ্যই লাশ মুসল্লিদের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে।

কেউ কেউ গায়েবানা জানাযা জায়েয বলতে চান। তারা দলিল হিসেবে ইথিওপিয়ার মুসলিম বাদশাহ হজরত নাজ্জাসী (রাহ.)-এর ঘটনা এবং মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল-মুযানী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ঘটনা পেশ করেন।

নাজ্জাসীর জানাযার ঘটনা

নাজ্জাসীর জানাযার ঘটনাটি সহীহ ইবনে হিব্বানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

[৩৪১]. ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত-২/১১৮

[৩৪২]. আল-বাদায়িউস সানাই -১/৩১২

[৩৪৩]. আদ-দুররুল মুখতার তানওয়ীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার-২/২০৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «أَنْبَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ ^، أَنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ، فَقُومُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ^، وَصَفُّوْا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ».

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ভাই নাজ্জাশী ইন্তিকাল করেছেন। চলো তাঁর জানাযার নামায পড়ি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে বাইরে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম তার পেছনে কাতারবন্দি হলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরের সাথে নামায পড়ালেন। সাহাবায়ে কেরামের ধারণা নাজ্জাশীর জানাযা নবী করিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা ছিলো।[৩৪৪]

সহিহ আল-বুখারীতে ঘটনার বিবরণ এভাবে রয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَعَى النَّبِيُّ ^ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَصَفُّوْا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا».

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামের কাছে উপস্থিত হয়ে নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ শোনালেন এবং জানাযার নামায পড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। সাহাবায়ে কেরাম তার পেছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর দিলেন।[৩৪৫]

সহীহ আল-বুখারীর অন্য বর্ণনায় হজরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ^ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: «مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ».

[৩৪৪]. সহীহ ইবনে হিব্বান-৩১০২
[৩৪৫]. সহীহ বুখারী-১৩১৮

একদিন নবী করীম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাবশার অধিবাসী একজন নেককার লোক মারা গেছেন। তোমরা তার জানাযা পড়ার জন্য প্রস্তুত হও। হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমরা জানাযার নমাজ পড়ার জন্য কাতারবদ্ধ হলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। তখন আমরা কাতারে দাঁড়ানো ছিলাম।[৩৪৬]

ইবনে মাজাহ শরীফে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ: «صَلُّوْا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ» قَالُوْا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: «النَّجَاشِيُّ».

হুযায়ফা ইবনে আসীয়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বের হলেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী তোমাদের এক ভাইয়ের জানাযা পড়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি নাজ্জাসী।[৩৪৭]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহসহ সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত অন্যান্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় হাবশার অধিপতি নাজ্জাসী স্বদেশে ইন্তিকাল করেছেন আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জানাযার নামায পড়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো, গায়েবানা জানাযা জায়েয আছে।

মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল-মুযানী (র.)-এর গায়েবানা জানাযার ঘটনা

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল-মুযানী (র.)-এর গায়েবানা জানাযার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম তাবারানী (রহ.) তার আল-মুজামুল কাবীর গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেন,

[৩৪৬]. সহীহ বুখারী- ৩৮৭৭
[৩৪৭]. সুনান ইবনে মাজাহ-১৫৩৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ^، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَاتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ، أَتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَضَرَبَ بِجَنَاحَيْهِ فَلَمْ تَبْقَ شَجَرَةٌ، وَلَا أَكَمَةٌ إِلَّا تَضَعْضَعَتْ، وَرَفَعَ لَهُ سَرِيْرَهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْ كُلِّ صَفٍّ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ^ لِجِبْرِيْلَ: «يَا جِبْرِيْلُ! مَا بَلَّغَ هَذَا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ مِنَ اللهِ؟» قَالَ: بِحُبِّهِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا جَائِيًا وَذَاهِبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.

হযরত আনাস (র.) বর্ণনা করেন, একদা জিবরাইল (আ.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রাসুল! মুআবিয় ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী ইন্তেকাল করেছেন। আপনি তার নামাযে জানাযা পড়তে আগ্রহী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। তখন জিবরাইল (আ.) তার উভয় ডানা দ্বারা জমিনে আঘাত করলেন। ফলে জমিনের সকল গাছ-পালা টিলা-টুম্বর সমান হয়ে গেল। অতঃপর মুআবিয়ার লাশ উঠানো হলো। যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। পেছনে দু'কাতার ফেরেশতা দাঁড়ালেন। প্রতি কাতারে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা ছিল। নামায শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। কোন আমলের বরকতে মুআবিয়া এই মর্যাদা লাভ করল। উত্তরে হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, মুআবিয়া সুরা ইখলাসকে খুবই মুহাব্বত করতেন এবং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় তিনি সুরা আল-ইখলাস তেলাওয়াত করতেন। [৩৪৮]

এই ঘটনা দ্বারাও অনেকে বোঝাতে চান যে,, গায়েবানা জানাযা পড়া বৈধ।

[৩৪৮]. আল-মু'জামুল কবীর- ১০৪০

নাজ্জাসীর হাদীসের উত্তর

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাসী (রহ.)-এর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে যে দাবি করা হয়েছে তা এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় না; বরং হাদীস দ্বারা যেটা বোঝা যায় সেটা হলো, নাজ্জাসীর লাশ মুজিযা-স্বরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও এই মনে করে জানাযার নামায পড়েছেন যে, লাশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আছে। যেমন সহীহ সনদে মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ^ قَالَ: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَّ رَسُوْلُ اللهِ ^، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوْعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ.

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المهلب الجرمي فمن رجال مسلم.

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (র.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের ভাই নাজ্জাসী ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা তার জানাযা পড়।' বর্ণনাকরী বলেন, এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করে দাঁড়ালেন। আমরাও তার পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের ধারণা হচ্ছিল লাশটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা হয়েছিল। [৩৪৯]

বিষয়টি সহীহ ইবনে হিব্বানেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে,

[৩৪৯]. মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল-২০০০৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «أَنْبَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ».

সাহাবায়ে কেরাম প্রবলভাবে ধারণা করেন যে, লাশটি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা হয়েছে। [৩৫০]

বিষয়টি নাসবুর রায়া গ্রন্থেও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা হুবহু উল্লেখ করা হলো:

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعِيْنَ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ، مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ، قَالَ: إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ، فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَصَفُّوْا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ إِلَّا أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. الثَّانِي: أَنَّهُ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِأَرْضٍ لَمْ يُقَمْ فِيْهَا عَلَيْهِ فَرِيْضَةُ الصَّلَاةِ، فَتَعَيَّنَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ثَمَّ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَى غَائِبٍ غَيْرِهِ، وَقَدْ مَاتَ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَهُمْ غَائِبُوْنَ عَنْهُ، وَسَمِعَ بِهِمْ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِلَّا غَائِبًا وَاحِدًا وَرَدَ أَنَّهُ طُوِيَتْ لَهُ الْأَرْضُ حَتَّى حَضَرَهُ، وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِي، رَوَى حَدِيْثَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ». وَ«كِتَابِ مُسْنَدِ الشَّامِيِّيْنَ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُوَيِّ السَّكْسَكُ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِتَبُوْكَ، فنزل عليه جبرئيل، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِي. [৩৫১]

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে ইয়াহইয়া ইবনে কসীরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর লিখেন,

[৩৫০]. সহীহ ইবনে হিব্বান- ৩১০২

[৩৫১]. নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া-৩-২৮৩

আমরা নাজ্জাসীর জানাযা পড়েছি এই অবস্থায় যে, তার মৃতদেহ আমাদের সামনে উপস্থিত ছিল।'

وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَامَ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ إِلَّا أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيْقِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْهُ وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيْقِ أَبَانَ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ الْجِنَازَةَ قُدَّامَنَا وَمِنَ الِاعْتِذَارَاتِ أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّجَاشِيِّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ غَيْرِهِ، قَالَ الْمُهَلَّبُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ قِصَّةُ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ.

উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, নাজ্জাসীর নামাযে জানাযা গায়েবানা ছিল না, বরং নাজ্জাসীর লাশ মদীনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হয়েছিল। তা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা তাঁর নির্দেশ ছাড়া উম্মতের জন্য আমল করা বা শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা যায় না। [৩৫২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এমন বহু মুজিযা সংঘটিত হয়েছে। তিনি যখন মিরাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসেন, মক্কার কাফের সম্প্রদায় তা অস্বীকার করে বসে এবং তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলে। তারা প্রশ্ন করে, আপনি যদি সত্যিই বাইতুল মাকদিস হয়ে উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে বলুন তো, বাইতুল মাকদিসের দরজা ও জানালা কয়টি? স্বাভাবিকভাবে এসব অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দরকার নেই, তা ছাড়াও ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বায়তুল মাকদিসের দৃশ্য হাজির করে দেন। তিনি তা দেখে দেখে জবাব দেন। উক্ত ঘটনায় দেখা যায়, দূরের কোনো জিনিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করার ঘটনা একাধিক এবং এগুলো তার মুজিযা। এসব মুজিযা দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান প্রমাণ করা

[৩৫২]. ফতহুল বারী -৩/১৮৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায় না। যতক্ষণ তিনি সেটাকে উম্মতের আমলের জন্য শরিয়তের বিধান হিসেবে প্রমাণিত না করেন।

দ্বিতীয় উত্তর

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাসীর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন, তারপরও তার দ্বারা ব্যাপকভাবে গায়েবানা জানাযা বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা। যা তাঁর খুসুসিয়তের অন্তর্ভূক্ত। যেমন চারের অধিক বিয়ে করা তাঁর জন্য খাস। তা না হলে খুলাফায়ে রাশেদীন সোনালী যুগে তাঁরা কোন ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে কোন নজির নেই কেন?

অনুরূপ ঘুমালে অযু না ভাঙ্গা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস। এসব বিশেষ বিধান দ্বারা উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে কোনো বিধান প্রমাণ করা যায় না। উল্লিখিত ঘটনা যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তার বড় প্রমাণ হলো, কুরুনে সালাসা তথা শ্রেষ্ঠতম তিন যুগে অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনের যুগে কখনো গায়েবানা জানাযা হয়নি। কাজেই নাজ্জাসীর ঘটনাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এর দ্বারা গায়েবানা জানাযা জায়েয প্রমাণিত হয় না।

মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল-মুযানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনার জবাব

মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া আল মুযানি (র.) এর হাদীসের ব্যাপারে প্রথম কথা হলো অনেক মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসটি দুর্বল। তদুপরি এই হাদীস দ্বারা গায়েবানা জানাযা প্রমাণিত হয় না। কেননা হাদীসের বর্ণনা দ্বারাই স্পষ্ট যে, সব পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দিয়ে তার লাশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এনে দেয়া হয়েছিল।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ^ قَالَ: مَاتَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيُّ، فَتُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ضَرَبَ بِجَنَاحِهِ الْأَرْضَ فَلَمْ يَبْقَ شَجَرَةٌ وَلَا أَكَمَةٌ إِلَّا تَضَعْضَعَتْ، فَرَفَعَ سَرِيرَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ

صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فِيْ كُلِّ صَفٍّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ^: يَا جِبْرِيْلُ، بِمَ نَالَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ مِنَ اللهِ؟ قَالَ: بِحُبِّهِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا، وَقَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক (র.) বর্ণনা করেন, একদিন জিবরাইল (আ.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রাসুল! মুআবিয় ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী ইন্তেকাল করেছেন। আপনি তাঁর নামাযে জানাযা পড়তে আগ্রহী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। তখন জিবরাইল (অ.) তাঁর উভয় ডানা দ্বারা জমিনে আঘাত করলেন। ফলে জমিনের সকল গাছ-পালা টিলা-টুম্বর সমান হয়ে গেল। অতঃপর মুআবিয়ার লাশ উঠানো হলো। যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়ালেন। পেছনে দু'কাতার ফেরেশতা দাঁড়ালেন। প্রতি কাতারে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা ছিল। নামায শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। কোন আমলের বরকতে মুআবিয়া এই মর্যাদা লাভ করল। উত্তরে হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, মুআবিয়া সুরা আল-ইখলাসকে খুবই মুহাব্বত করতেন এবং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় তিনি সুরা আল-ইখলাস তেলাওয়াত করতেন।[৩৩]

উক্ত হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হজরত মুয়াবিয়া আল-মুযানীর জানাযা গায়েবানা জানাযা ছিল না। তাঁর মৃতদেহ উপস্থিত করেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা পড়েছেন। এই বর্ণনা দ্বারা এই বিষয়টিও পস্কার হয়ে যায় যে, গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই। কেননা যদি গায়েবানা জানাযা জায়েযই হত তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কেন এত অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাঁর লাশ হাজির করা হলো। বরং স্বাভাবিকভাবেই তিনি গায়েবানা জানাযা পড়ে নিতেন। দেওবন্দের বিখ্যাত

[৩৩]. মুসনদ আবু ইয়ালা -৪২৬৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফায়যুল বারীতে লিখেন,

أما الصلاة على الغائب فلم يثبت فيها إلا واقعة النجاشي وأما واقعة معاوية الليثي فاختلفوا فيها والظاهرأنه منكر فاذا لـم يثبت تلك الصلاة في عهد النبي ^ مع أن كثيرا من المسلمين في دار عزابة في عهده ^ فانسب أن نختم بعهده سيما اذا لـم تجري عليها توارث الأمة أيضا بخلاف الصلاة على القبر فإن بعضهم عملوا بها فيما بعد.

অনুপস্থিত মৃতদেহের ওপর জানাযা পড়া নাজ্জাসীর ঘটনা ছাড়া আর কোনো ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। ইবনে মুয়াবিয়ার যে কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সহীহ বর্ণনা হলো, ইবনে মুয়াবিয়ার এই ঘটনা ভিত্তিহীন।

অতএব গায়েবানা জানাযার আর কোনো ঘটনা যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি, অথচ বহু সাহাবী দূর-দূরান্তে ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই নাজ্জাসীর এই ঘটনাটিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা গণ্য করা উচিত। বিশেষ করে যখন যুগ পরম্পরায় গায়েবানা জানাযার প্রচলন ছিল না, তাই তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহণ করে যে, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।'[৩৫৪]

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম ইবনে তাইমিয়া এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি নাজ্জাসীর ঘটনা দ্বারা গায়েবানা জানাযার পক্ষে দলিল পেশ করা হয় তাহলে গায়েবানা জানাযা ওই সব মুসলামানেরর ওপর পড়া যাবে যাদের ওপর কোনো মুসলমান না থাকার কারণে সরাসরি জানাযা পড়ানো সম্ভব হয় না। নাজ্জাসীর ওপর এই জন্য জানাযা পড়া হয়েছিল,যেহেতু ইথিওপিয়ায় তখন কোনো মুসলমান না থাকার

[৩৫৪]. ফয়যুল বারী-৬/৪৬৭

কারণে সরাসরি তাঁর ওপর জানাযা পড়া সম্ভব হয়নি। একারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় সাহাবীদের নিয়ে তার জানাযার নামায সম্পন্ন করেছিলেন। যদি গায়েবানা জানাযা পড়া যদি জায়েযই হত তাহলে এইভাবে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

বুখারী শরীফের হাদীসটির উত্তর হলো, যেহেতু ওই মহিলা মসজিদে নববীর ঝাড়ু দিতেন, তাই তার বিশেষ প্রতিদান হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। তা ছাড়া দ্বিতীয় জানাযা কেবল ওই ক্ষেত্রে পড়া যেখানে প্রথম জানাযা অলীর অনুমতি ছাড়া পড়া হয়। সেমতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুমিনের সবচেয়ে বড় অভিভাবক। তাই তিনি ওই সাহাবী অথবা সাহাবিয়ার জানাযা পুনরায় পড়েছিলেন।

সৈয়দুস শুহাদা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বদরী সাহাবী ছিলেন। একাধিক জানাযাসহ ভিন্ন পদ্ধতিতে তথা চারের অধিক তাকবীরের সাথে জানাযা পড়া বদরী সাহাবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল।

أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُوْلُ: صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا، فَقَالُوْا: مَا هَذَا التَّكْبِيْرُ؟ فَقَالَ: هَذَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَلِأَهْلِ بَدْرٍ فَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَكُمْ فَضْلَهُمْ وَاحِدٌ.

'যেমন হযরত উমায়ের ইবনে সাঈদ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহল ইবনে হুযায়ফ রাযি. ইন্তেকাল করলে হযরত আলী (র.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং এতে পাঁচ তাকবীর বলেন। ফলে লোকেরা বলেন, এই অতিরিক্ত তাকবীর কিসের? তিনি বললেন, ইনি সাহল ইবনে হুযায়ফ (র.)। তিনি বদরী সাহাবী। আর বদরী সাহাবীদের অন্যান্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'[৩৫৫]

মোটকথা গায়েবানা জানাযার পক্ষে যেসব দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, সেগুলোর কোনোটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস, কোনোটি

[৩৫৫]. আত-তাবাকাতুল কুবরা- ৩/৪৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা, আবার কোনোটি এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনো কারণবশত মুসলামানগণ জানাযার নামায পড়তে পারেননি। কোনোটা দ্বারা গায়েবানা জানাযা প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এমন কাজের প্রচলন ঘটানো যা শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয় তা সম্পূর্ণ বিদআত। যা অত্যন্ত ঘৃণিত। মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করতে হলে, তার রূহের মাগফিরাত কামনা করতে হলে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় যাবতীয় শর্ত-শরায়েত মেনেই করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার তওফীক দান করুন। আমীন।

মসজিদে জানাযার নামায পড়ার বিধান ঃ

আমাদের হানাফী মাযহাব মতে মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। যেহেতু হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়বে সে তার কোন পুরষ্কার নাই। অপর বর্ণনায় এসেছে, "তার জন্য কিছুই নাই"।[৩৫৬]

তবে মইয়্যেত বাইরে রেখে মসজিদের ভিতরে জানাযা পড়াতে কোন দোষ নেই। মাকরূহ হওয়াটা মইয়্যেতকে মসজিদে প্রবেশ করানোর মধ্যেই নিহিত। মাবসূতে সারাখ্সীতে এসেছে,

وَعِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ الْجِنَازَةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَمْ يُكْرَهْ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا الْكَرَاهَةُ فِي إدْخَالِ الْجِنَازَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ» فَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ يُنَحَّى عَنْ الْمَسْجِدِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى

[৩৫৬] . সুনান আবু দাউদ-৩১৯১, ইবনু মাজাহ-১৫১৭, মুসনাদে আহমদ-৯৭৩০, মুসনাদে ইবনুল জাআদ।

অর্থাৎ- যদি মইয়্যেতকে মসজিদের বাইরে রেখে মসজিদে জানাযা পড়া হয় তাতে মাকরূহ হবে না। কারাহাত হচ্ছে মইয়্যেতকে মসজিদে প্রবেশ করানোর মধ্যেই। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা শিশু ও পাগলদের থেকে মসজিদকে রক্ষা কর"। অতএব, শিশুদেরকে যদি মসজিদকে রক্ষা করতে হয় তাহলে মইয়্যেত থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।[৩৫৭]

যদি জানাযার নামাযে ইমাম সাহেব তিন তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে শুদ্ধ না হওয়ার কারণে জানাযার নামায দুহরাতে হবে। আর যদি ইমাম সাহেব চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম না ফিরিয়ে পঞ্চম তাকবীর দিয়ে দেয়, তাহলে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ইমামের সালাম ফেরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[৩৫৮]

মাসবুকও (এক-দুই তাকবির পায়নি) জানাযায় শরীক হবে। সে ইমামের সঙ্গে যে যে তকবীর আদায় করবে, তাছাড়া অবশিষ্ট তাকবীর ইমামের সালাম ফিরাবার পর একাকী আদায় করবে। যদি জানাযার খাট উঠায়ে নেবার আশংকা হয় শুধু তকবীর বললে চলবে।

মুসলমান সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য জীবনের (প্রাণের) অংশ পাওয়া গেলেও তাহার জানাযার নামায পড়তে হবে। কাফন দাফনের পূর্বে নামও রাখা উচিত।[৩৫৯]

স্মরণতব্য যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মাথা বের হওয়ার পর চীৎকার করলে, ও সীনা পর্যন্ত বা বেশীর ভাগ শরীর বের না হওয়ার পূর্বে মারা গেলে, জানাযা পড়তে হয় না। শুধু গোসল দিয়ে একটি কাপড়ে জড়ায়ে দাফন করতে হয়। সন্তান মৃত অবস্থায় জন্মিলে, এমনকি শরীর সম্পূর্ণরূপে গঠিত হওয়ার পূর্বে মৃত ভূমিষ্ঠ হলেও দাফনের পূর্বে নাম রাখা উচিত। কেননা কেয়ামতের দিন তারও হাশর হবে এবং মা-বাবার জন্য শাফায়াত করবে।

[৩৫৭] . মাবসূতে সারাখসী-২/৬৮।
[৩৫৮] . ফাতওয়ায়ে আলমগীরী-১/১৬৪।
[৩৫৯] . ফাতওয়ায়ে আলমগীরী-১/১৬৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মইয়্যেতকে যদি জানাযার নামায পড়া ছাড়া দাফন করা হয়, যতদিন শরীর কবরের মাটিতে খাওয়ার আশংকা না হয়, ততদিনের মধ্যে কবরের পাশে গিয়ে জানাযার নামায আদায় করা একান্ত বাঞ্চনীয়। [৩৬০]

যদি পাঁচ ওয়াক্তের নামায, জুমা ও ঈদের নামাযের সময় জানাযা উপস্থিত হয় আগে ফরয নামায ও ঈদের নামায পড়ে জানাযার নামায আদায় করবে, পরে সুন্নাত ও ঈদের খোতবা আদায় করবে। তবে মাগরিবের সুন্নাত আদায়পূর্বক জানাযা পড়বে। কারণ যেহেতু মাগরিবের নামাযের জন্য সময় কম। ইহাই আরজা, আসাহ্ এবং আক্ওয়া (বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য) ফতোয়া [৩৬১]।

জানাযা নিয়ে চল্লিশ কদম চলার বয়ানঃ

মুহসিনে ইনসানিয়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كُفِّرَتْ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً»

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জানাযা বহন করে চল্লিশ কদম নিয়ে যাবে আল্লাহ পাক তার চল্লিশটি কবীরা গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন"। [৩৬২] অপর বর্ণনায় এসেছে,

«مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً»

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাটিয়ার চতুর্পাশে ধরে বহন করবে আল্লাহ পাক তার চল্লিশটি কবীরা গোনাহ মাফ করে দিবেন"। [৩৬৩]

ফুকহায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) উল্লেখিত হাদীসের আলোকে জানাযা বহনে সুন্নাত নিয়ম এটাই বর্ণনা করেছেন যে, একের পর এক খাটের চার দিকটা কাঁধে উঠাবে এবং প্রত্যেক বার দশ কদম দশ কদম গুনে গুনে প্রতি দশ কদমে খাট মাটিতে রাখবে আর কদম গণনা মইয়্যেতের ডান পাশ হতে আরম্ভ করবে। অর্থাৎ মইয়্যেতকে কাঁধে বহনকারী চার ব্যক্তি চল্লিশ কদম গণনা পর্যন্ত ঐ চার ব্যক্তি পরিবর্তন হাওয়া সুন্নাতের খেলাফ। অর্থাৎ মইয়্যেতকে কাঁধে বহনকারীদের মধ্যে ডান হাতের মাথার পাশ দিয়ে কাঁধে বহনকারী ২য় দশ কদমে মইয়্যেতের ডান পায়ের দিকেরটা বহন করবে আর ডান পায়ের অংশে থাকা ব্যক্তি বাম পায়ের অংশ কাঁধে নিয়ে দশ কদম যাবে।

[৩৬০]. আলমগীরী-১/১৬৩।
[৩৬১]. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির-১/৩৬৬।
[৩৬২]. বাদায়ে'-১/৩০৯, আল-মাবসূত-২/৫৬.
[৩৬৩]. আল-মু'জামুল আওসাত-৫৯২০।

এভাবে প্রথম কদম গণনাকারী মইয়্যেতের হাতের ডান পাশ থেকে আরম্ভকারী ব্যক্তি ১ম দশ কদম আরম্ভকৃত স্থানে এসে পৌঁছলে মইয়্যেতকে কাঁধে নেয়া ব্যক্তিরা আপন আপন স্থানেও এসে পৌঁছবে এবং ৪০ কদমও শেষ হবে। [৩৬৪]

তার পূর্ণ নিয়ম এই যে, প্রথমে এক ব্যক্তি মাথার দিকের ডান পার্শ্বে খাটের (মইয়্যেতের), তারপর অপর ব্যক্তি পায়ের দিকের ডানপার্শ্বে, তারপর আর এক ব্যক্তি মইয়্যেতের মাথার দিকের বামপার্শ্বে, তারপর পায়ের দিকের বাম পার্শ্বে কাঁধে নেবে, এবং প্রত্যেক বার দশ দশ কদম চলবে এবং কাঁধ পরিবর্তন করবে। এতে মোট চল্লিশ কদম হবে। এভাবে ওই চার ব্যক্তির দ্বারা চল্লিশ কদম পূর্ণ হলে অন্যান্যরাও খাট কাঁধে নিয়ে তাসবিহ, তাহমিদ বলতে বলতে সালাতে জানাযার মাটের দিকে যাবে।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকে যে, মৃতের খাট মঞ্জিল করা নির্দিষ্ট স্থান হতে জানাযা কবরস্থ করার জন্য প্রথম চল্লিশ কদম চলা পর্যন্ত ওই চার ব্যক্তিরা কোন প্রকার দো'আ আদ্ইয়া পড়বে না; যখন চল্লিশ কদম শেষ হবে তখন সবাই স্বর মিলিয়ে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' অথবা 'আল্লাহু রাব্বি' 'মুহাম্মদ নবী' বলতে বলতে সালাতে জানাযার ময়দানের দিকে যাবে। সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত মাঠে সালাতে জানাযা আদায় করতঃ দোয়া মুনাজাত শেষ করে কফিনের খাটকে আবার কাঁধে নিয়ে সমস্বরে কালেমা তাইয়েবা সবাই তিলাওয়াত করতে করতে কবরস্থান পর্যন্ত নিয়ে যাবে। মু'মিন ব্যক্তির ইনতিকাল থেকে শুরু করে দাফন পর্যন্ত আগত কোন ব্যক্তিই দুনিয়াবী কথা-বার্তা বা রাজনৈতিক আলোচনা বা মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে কোন প্রকারের অশোভন সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং গুনাহের কাজ।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মৃতের খাট কাঁধে নিয়েও আমাদের দেশে ভ্রান্ত মতবাদীরা কখনো রাজনৈতিক আলোচনা করে অথবা দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলে কিংবা বিষন্ন মনে নিরবে হাঁটতে থাকে। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا كَمَا يَهْدِمُ السَّيْلُ الْبُنْيَانَ " ،

[৩৬৪]. আলমগীরী-১/১৫১, বাদায়ে'-১/৩০৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَقَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَهُوَ لَقَّنَ الإِمَامَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ لَقَّنَ الإِمَامَ عَلِيًّا زَيْنَ الْعَابِدِينَ ، وَهُوَ لَقَّنَ الإِمَامَ مُحَمَّدَ الْبَاقِرَ ، وَهُوَ لَقَّنَ الإِمَامَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ ، وَهُوَ لَقَّنَ سُلْطَانَ الْعَارِفِينَ أَبَا يَزِيدَ الْبَسْطَامِيَّ

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালক্বীন কর, কেননা উহা পাপারাজিকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমনিভাবে পানির স্রোত গৃহকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে তালক্বীন করানোটা হযরত মওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে শিকিয়ে দিয়েছেন, আর হযরত মওলা আলী (র.) ইমাম হোসাইন (র.)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, হযরত ইমাম হোসাইন (র.) স্বীয় শাহযাদা ইমাম আলী যাইনুল আবেদীন (র.)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বীয় শাহজাদা ইমাম মুহাম্ম বাকের (র.)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বীয় শাহজাদা হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহ.) কে।[৩৬৫]

এখানে আমাদের দেশের একটি ভুল আমলের কথা সবারই পরিত্যাগ করা চাই যে, একজন উপরোল্লিখিত কালেমার প্রথম অংশ পড়ে, আর অন্য সবাই দ্বিতীয় অংশ পড়ে, ইহা ভুল। হাদীস মতে নিয়ম হচ্ছে মইয়্যেত বহনকারীরাসহ সবাই উচ্চস্বরে উল্লেখিত কালেমাগুলো অথবা হাদীসে বর্ণিত বা আওলিয়ায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন দ্বারা কৃত কালেমা গুলো একত্রে সমন্বয়ে পড়াই হচ্ছে উত্তম ও অগ্রগণ্য। হাদীস শরীফে আছে,

عن أَبِي رَافِعٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يُجَنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَثَ»

[৩৬৫]. মুসনাদুল ফিরদাওস লিদ-দাইলামী-১০।

অর্থাৎ- হযরত আবু রাফে' (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মইয়্যেতকে গোসল দিবে এবং তাঁর দোষ গোপন করবে আল্লাহ পাক তার চল্লিশটি কবীরা গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মু'মিন ভাইকে দাফন করার জন্য কবর খনন করবেন সে যেন আপন ভাইকে পুণরুত্থান পর্যন্ত থাকার ঘরের ব্যবস্থা হল"[৩৬৬], সুবহানাল্লাহ।

অপর হাদীসে এসেছে,

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً»

অর্থাৎ হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত মুসলিম ব্যক্তির জানাযার খাটিয়া বহন করবে, আল্লাহ পাক বহনকারীর চল্লিশটি কবীরা গুণাহ্ মোচন করে দিবেন।[৩৬৭]

জানাযা বহন করতে খাট হাতে ধরে স্কন্ধের উপর রাখবে। অন্যান্য মাল-সামানের মত স্কন্ধে বা পিঠে বোঝাই করে নেয়া মাকরূহ।[৩৬৮]

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা সম্পর্কে:

মুসলমানগণ অপর মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় নিম্নলিখিত দো'আ পড়ে শোয়ায়ে দেবে বা কবরে রাখবে। দো'আটি নিম্নরূপঃ

بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চরণ: 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ্'[৩৬৯]

এবং রাখার পর দেখবে যে তার চেহারা ক্বিবলামুখি আছে কিনা। সাধারণত "রূহ" যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির দুই হাতকে নামায অবস্থার মত এবং চেহারা ক্বিবলার দিকে ফিরায়ে দেয়া অধিক উত্তম। এরপর মাটি দেয়া শুরু করলে প্রথম মৃতের মাথার দিক থেকে শুরু করবেন এবং এই দোয়া পড়বে مِنْهَا

[৩৬৬]. আল-মু'জামুল কবীর লিত-ত্বাবারানী-৯২৯।
[৩৬৭]. আল-মুজামুল আওসাত লিত-ত্বাবারানী-৫৯২০।
[৩৬৮]. জাওহারাতুন নাইয়ারাহ।
[৩৬৯]. জামে' তিরমিযী-১০৪৬, ইবনু মাজাহ-১৫৫০, মুসনাদে আহমদ-৪৮১২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

خَلَقْنَاكُمْ "মিনহা খালাকনাকুম" অতপরঃ সিনা বরাবর মাটি দেবে অতঃপর পায়ের দিকে মাটি দেবে এবং এই দোয়া পড়বে وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى "ওয়া মিন্হা নুখ্রিজুকুম তারাতান উখরা" পড়বে। [৩৭৩]

মনে রাখতে হবে যে, তিনবার দুই হাতে যা মাটি নিতে পারা যায় তা নিয়ে উপরোক্ত নিয়মে মাটি দিয়ে তারপর সম্মিলিতভাবে মাটি দেয়া শুরু করবে এবং খুব আদবের সাথে তাড়াহুড়া না করে দাফনকারীরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে একাগ্রচিত্তে স্মরণরত অবস্থায় মাটি দেয়া উত্তম। কবর দেয়া হলে সবাই সম্মিলিতভাবে জিয়ারত করা মৃত ব্যক্তির মাগ্ফেরাত কামনা করা সবার জন্য উত্তম। এরপরে কোন এক পরহেজগার আলেম ব্যক্তি দ্বারা সিনা বরাবর কবরকে সামনে নিয়ে তারতীব মত মৃত ব্যক্তির কবর তালক্বীন করা হাদীসে নববী ও বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক স্বীকৃত আমল।

কবর তালক্বীন প্রসঙ্গেঃ

পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের কল্যাণ ও ভাল'র জন্যে হাজারো পথ নির্দেশ উপহার দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। যেমন প্রামাণ্য হাদীস দ্বারা কবর তালক্বীন সংক্রান্ত নির্দেশ। যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি মুসলিম বিশ্বে পূণ্যময় কাজ হিসেবে স্বীকৃত আমল।

হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কবর তালক্বীন এর ব্যাপারে নিম্নরূপ পথ নির্দেশ প্রদান করেন যা কবরবাসীর জন্যে নিতান্ত উপাদেয় এবং ভরসার ব্যাপার। তিনি বলেন যে, মৃতব্যক্তির দাফনের পর তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব থেকে কোন ব্যক্তি বা কোন বুজর্গ আলেমে দ্বীন, তার কবরের পাশে গিয়ে এই কালিমাগুলো বলবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، يَاعَبْدَ اللهِ هَذَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ هَذَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ هَذَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ هَذَا بَيْتُ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ هَذَا اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَ آخِرُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ

[৩৭৩]. মুসনাদে আহমদ-১৮৫৩৪, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-৬৭৩৭।

الدُّنْيَا فَاِذَا اَتَاكَ الْمَلَكَانِ الْكَرِيْمَانِ الْمَخْلُوْقَانِ الْمَامُوْرَانِ لَايَنْفَعَانِكَ وَ لَايَضُرَّانِكَ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ فَيَسْأَلَانِكَ عَنْ رَبِّكَ وَ عَنْ دِيْنِكَ وَ عَنْ نَبِيِّكَ فَلَا تَخَفْ وَ لَاتَحْزَنْ فَقُلْ لَهُمَا اَللهُ رَبِّيْ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّيْ وَ الْاِسْلَامُ دِيْنِيْ وَ الْقُرْآنُ اَمَامِيْ وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِيْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَانِيْ وَ اَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اِيْمَانًا بِرُبُوْبِيَّتِهِ وَ اعْتِرَافًا بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ نَبِيُّهُ وَ سَفِيْرُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَ لَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

আরবী উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ইয়া সাব্বিতুল্লাহুল লাযিনা আমানু বিল-কাওলিস সাবিতি ফিল হায়াতিত্ দুনিয়া ওয়াল আ-খিরাতি, ইয়া আবদাল্লাহ হাযা বাইতুল ওয়াহ্শাতি হাযা বাইতুল ওয়াহদাতি, হাযা বাইতুল গুরবাতি, হাযা বাইতুল হাসরাতি ওয়ান নাদামাতি, হাযা আওয়ালু মানজিলিম মিন মানাযিলিল আ-খিরাতি, ওয়া আখিরু মানজিলিম মিম মানাযিলিদ দুনিয়া, ওয়া ইযা আতাকাল মালাকানি, আল কারীমানিল মাখলুকানিল মামুরানি, লা ইয়ান ফায়ানিকা ওয়া লা ইয়াদুররানিকা ইল্লা বিইযনিল্লাহি, ফা ইউসয়ালানিকা আন রাব্বিকা ওয়া আন দীনিকা ওয়া আন নবীয়্যিকা, ফালা তাখাফ ওয়া লা তাহ্যান, ফাকুল লাহুমা- আল্লাহু রাব্বী, ওয়া মুহাম্মাদু নাবিয়্যী, ওয়াল ইসলামু দ্বীনি, ওয়াল কুরআনু ইমামী, ওয়াল কা'বাতু ক্বিবলাতি, ওয়াল মু'মিনুনা ইখ্ওয়ানী ওয়া আনা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকা লাহু, ঈমানান বিরুবুবিয়্যাতিহী ওয়া ই'তিরাফান বিওয়াহদানিয়্যাতিহি, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু ওয়া নাবিয়্যুহু ওয়া সাফীরুহু, আরসালাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু আলাদ দ্বীনি কুল্লিহি ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকুন।

উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তি পুরুষের বেলায় يَا عَبْدَ اللهِ ইয়া আবদাল্লাহ্ আর মহিলার স্থলে يَا اَمَةَ اللهِ ইয়া আমাতাল্লাহ্ বলবে। এতে প্রশ্নোত্তর পর্ব-সহজ হবে আর কবরবাসীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে পারে। ইনশা'আল্লাহ।

নিম্নোক্ত ইবারতগুলো তালক্বীনকারী কবরের ডান পার্শ্বে সিনা বা মাথার নিকটবর্তী হয়ে পাঠ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত নিয়মগুলো ছাড়াও ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও সুফিয়ায়ে কিরামগণ নিম্নোক্ত আরো একটি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ دَائِمٌ قَائِمٌ قَادِرٌ قَاهِرٌ عَادِلٌ فَاضِلٌ لَا يَنَامُ وَ لَا يَمُوْتُ وَ لَا يَفُوْتُ وَ لَا يَحُوْلُ وَ لَا يَزُوْلُ اَبَدًا اَبَدًا ذُوْ الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ اللهُ تَعَالٰى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهُهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ-

يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ اَمَةِ اللهِ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِيْ ـــ يَا اَمَةَ اللهِ بِنْتَ حَوَاءَ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِيْ خَرَجْتِ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا اِلٰى دَارِ الْاٰخِرَةِ وَ هُوَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ اَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْمُنْكَرَ حَقٌّ وَ النَّكِيْرَ حَقٌّ وَ اَنَّ السُّؤَالَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْجَوَابَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْمِيْزَانَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ اَنَّ الْحَشْرَ حَقٌّ وَ اَنَّ الرُّؤْيَةَ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِي الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ حَقٌّ وَ اَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَ اَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ وَ اِنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ تَعَالٰى رَبًّا وَّاحِدًا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَسُوْلًا نَبِيًّا هٰذَا اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ وَ آخِرِ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا اَلْاٰنَ يَأْتِيْكَ يَأْتِيْكَ الْمَلَكَانِ

الْكَرِيْمَانِ الْمُوَكَّلَانِ الْمُحَاسِبَانِ فَلَا يَفْزَعَاكَ وَ لَا يَرْهَبَاكَ وَ لَا يَرُوْعَاكَ وَ لَا يَهُوْلَاكَ فَاِنَّهُمَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالٰى فَاِذَا سَاَلَكَ مِنْ رَبِّكَ وَ مَنْ نَبِيُّكَ وَ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ وَ مَا اِمَامُكَ وَ مَا دِيْنُكَ وَ مَا قِبْلَتُكَ وَ مَا اَخْوَانُكَ فَقُلِ اللهُ رَبِّيْ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّيْ وَ هٰذَا حَبِيْبِيْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْقُرْاٰنُ اِمَامِيْ وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِيْ وَ الْاِسْلَامُ دِيْنِيْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ اِخْوَانِيْ وَ عَلٰى ذَالِكَ خُلِقْتُ وَ عَلٰى ذَالِكَ حُيِّيْتُ وَ عَلٰى ذَالِكَ مِتُّ وَ عَلٰى ذَالِكَ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى وَ اَنْتَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ-

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ لِاَنَّكَ قُلْتَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَ اَيْضًا قَالَ يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ فِيْ قُبُوْرِهِمُ الضِّيَاءَ وَ النُّوْرَ وَ الْفَتْحَةَ وَ السُّرُوْرَ وَ الْبَهْجَةَ وَ الْحُبُوْرَ وَ الْمَغْفِرَةَ عَلٰى اَهْلِ هٰذَا الْقُبُوْرِ اِنَّكَ مَلِكٌ رَبٌّ عَفُوٌّ غَفُوْرٌ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ-

আরবী উচ্চারণ:

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুয়া হাইয়ুন "দায়িমুন" "কায়িমুন" "কাদিরুন" "কাহিরুন" "আ'দিলুন" "ফাদিলুন" লা ইয়ানামু-ওয়া লা ইয়ামুতু-ওয়া লা ইয়াফুতু-ওয়া লা ইয়াহ্বলু-ওয়া লা ইয়াযুলু-আবাদান আবাদা, যুল-জালালি ওয়াল ইকরাম, বি ইয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুয়া আ'লা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর। কালাল্লাহু তা'য়ালা কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাওত। ওয়া ইন্নামা তুওয়াফ্ফুনা ওজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামতি-ফা-মান যুহযিহা আনিন না-রি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফা-যা। ওয়া মাল হায়াতুত দুনয়া ইল্লা মাতাউল গুরুরি মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু ওয়া মা ইনদাল্লাহি বাকিন কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহুহু। লাহুল হুকমু ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইলাইহি তুরজাউন। কুল্লু মান আ'লাইহা ফানিন ওয়া ইয়াব্‌কা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল-জালালি ওয়াল ইকরাম। ইন্নাকা মাইয়িতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুন। ছুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইনদা রাব্বিকুম তাখ্‌তাসিমুন।

পরে তালক্বীনকারী ডান পার্শ্বে মৃত ব্যক্তির কবরের ডান বুক বরাবর ডান হাত রেখে উচ্চস্বরে নিম্নোক্ত ইবারতগুলো পাঠ করবে।

আরবী উচ্চারণ: ইয়া আ'বদাল্লাহ ইবনে আমাতিল্লাহি উযকুরিল আ'হদাল্লাযি খারাজতা (পুরুষের ক্ষেত্রে), ইয়া আমাতাল্লাহি বিনতা হাওয়ায়ে ওজকুরিল আ'হদাল্লাযি খারাজতি (মহিলার ক্ষেত্রে) আলাইহি মিন দারিদ দুনইয়া ইলা দারিল আখিরাতে ওয়া হুয়া শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি. ওয়া আন্নাল জান্নাতা হাককুন, ওয়া আন্নান নারা হাককুন. ওয়া আন্নাল মাওতা হাককুন, ওয়া আন্নাল কবরা হাককুন. ওয়া আন্নাল মুনকারা হাককুন. ওয়া আন্‌ন্নাকিরা হাককুন, ওয়া আন্নাছ ছুয়ালা হাককুন, ওয়া আন্নাল জাওয়াবা হাককুন, ওয়া আন্নাল হিসাবা হাককুন. ওয়া আন্নাল মীযানা হাককুন, ওয়া আন্নাল বা'ছা হাককুন, ওয়া আন্নাল হাওযা হাককুন, ওয়া আন্নাশ শাফায়াতা হাককুন, ওয়া আন্নাস সিরাতা হাককুন, ওয়া আন্নাল হাশরা হাককুন. ওয়া আন্নার রু'ইয়াতা লিল্লাহি তায়ালা ফিল জান্নাতি লিল মু'মীনীনা হাককুন, ওয়া আন্নাচ্ ছা-য়াতা আ-তিয়াতুন লা রাইবা ফি-হা ওয়া আন্নাল্লাহা ইয়াবয়া'ছু মান ফিল কুবুরে ওয়া ইন্নাকা রাদ্বি-তা (পুরুষের ক্ষেত্রে) রাদ্বি-তি (মহিলার ক্ষেত্রে) বিল্লাহি তায়ালা রাব্বাঁও ওয়া-হিদান, ওয়া বিল-ইসলামি দ্বীনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাসূলান নবীয়ান, হাজা আওয়ালু মানযালিন মিন মানাযিলিল আখিরাতি ওয়া আখিরু মানযালিম মিন মানাযিলিদ দুন্‌ইয়া। আল আনা ইয়াতিকাল মালাকানিল কারীমানিল মুয়াককালানিল মুহাছিবানে ফালা ইয়া ইয়াফযিয়া'কা ওয়া লা ইয়ারহিবাকা ওয়া লা ইয়ারু'য়াকা ওয়ালা ইয়াহুলাকা ('কা' হবে পুরুষের ক্ষেত্রে 'কি' মহিলার ক্ষেত্রে) ফা-ইন্নাহুমা খালকুন মিন খালকিল্লাহি তায়ালা ফা-ইজা ছায়ালাকা. মান রাব্বুকা, ওয়া মান নবীয়ুকা, ওয়ামা কুনতা. তাকুলু ফি হাককি হাজার রাজুলি ওয়া মা ইমামুকা, ওয়ামা দ্বীনুকা, ওয়ামা কিবলাতুকা, ওয়ামা ইখওয়ানুকা, ফাকুল আল্লাহু রাব্বী, ওয়া মুহাম্মাদুন নবীয়্যী, ওয়াহুয়া হাবীবী সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ওয়াল কোরআনু ঈমামী, ওয়াল কা'বাতু কিবলাতী ওয়াল ইসলামু দ্বীনি. ওয়াল

মু'মিনিনা কুল্লুহুম ইখওয়ানি, ওয়া আলা জালিকা তুবয়াছু ইন্‌'শা-'আল্লাহু তায়ালা ওয়া আন্তা মিনাল আ-মিনীনা।

নিম্নোক্ত ইবারতগুলো দ্বারা কবরকে সামনে নিয়ে হাত তুলে দো'আ করবেঃ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাব্বিতহু বিল কওলিস্ সাবেতে লিআন্‌নাকা কুলতা ইউসাব্বিতুল্লাহু ল্লাজিনা আ-মানু বিল্ কওলিস্ সাবেতে ফিল হায়াতিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া ফিল আখেরাতে ওয়া আইজান ক্বালা ইয়া আইয়াতুহান্নাফ্‌সুল মুতমায়িন্নাতু ইরজিয়ী ইলা রাব্বিকে রাদ্বিয়াতাম মারদ্বি'য়াতান ফাদখুলী ফী ইবা-দী ওয়াদ্‌খুলী জান্নাতি। আল্লাহুম্মাগ ফির লি আহলিল কুবুরে মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ওয়াল মুসলিমিনা, ওয়াল মুসলিমাতে ওয়াজ্‌য়ালিল্লাহুম্মা ফি কুবুরেহিমিদ্ দিয়া-য়া ওয়ান নূ-রা ওয়াল ফাত্‌হাতা ওয়াছ্ ছুরুরা ওয়াল বাহজাতা ওয়াল হাবুরা ওয়াল মাগফেরাতা আ'লা আহলি হাউয়ায়িল কুবুরি, ইন্নাকা মালেকুন রাব্বুন আ'ফুয়ুন গফুরুর রাউফুর রাহীম।

কবর যেয়ারতের নিয়মঃ

কবর যেয়ারতের সুন্নাত তরীকা হল. নারী-পুরুষ সকলে আদব ও নম্রতার সাথে কবরস্থানে গিয়ে সর্বপ্রথম কবরবাসীকে সালাম পেশ করবে। সালাম নিম্নরূপঃ

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ"

উচ্চারণঃ আস-সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মু'মিনীনা ওয়া ইন্না ইন-শাআল্লাহু তা'আলা বিকুম লাহিকুন। ওয়া নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আ-ফিয়াতি।

যিয়ারতকারী মনে মনে মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী অনাগত মনযিল সমূহ এবং রোজ হাশরে পুণরায় জীবিত হয়ে দরবারে ইলাহীর হাজেরীর কথা স্মরণ করবে। অতঃপর কেবলাকে পেছনে রেখে কবরকে সামনে নিয়ে কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে এসে সীনা (বক্ষ) বরাবর দাঁড়িয়ে যতটুকু সম্ভব ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করবে।

বিশেষ করে সূরা আল-বাকারা এর শুরু থেকে আল-মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাকারা এর শেষ রুকু, সূরা ইয়াসীন, সূরা আল-

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুল্‌ক, সূরা তাকাসুর এবং সূরা ইখলাস এগার বার/সাতবার/ তিনবার পড়ে সরকারে দুআলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ পেশ পূর্বক উদ্দেশ্যকৃত মইয়্যেত, নিজের আত্মীয় স্বজন ও সকল মুসলমানের জন্য সওয়াব রসানী ও মাগফিরাতের দোয়া করবে। উল্লেখ্য যে, কেরাআত ও দোয়া উভয় অবস্থায় কবরকে সামনে রাখা মুস্তাহাব। উত্তম কাজ হল সপ্তাহে অন্তত একদিন কবর যেয়ারত করা। আর তা জুমাবারে হওয়া অতি উত্তম। [৩৭১]

উল্লেখ্য যে, পীর-মুর্শিদ, বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যেয়ারতের জন্য সফর করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ এবং এতে করে অনেক ফয়েয বরকত অর্জনের সুযোগ লাভ হয়। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ওহাবী মওদূদী সহ ভ্রান্তবাদীরা মসজিদ সংক্রান্ত একটি হাদীসকে মাযারের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

" لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "

অর্থাৎ "তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করিওনা। আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী), মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসা।" [৩৭২]

উল্লেখিত হাদীসে নিষেধের বিষয়টি একান্ত মসজিদের সাথে নির্দিষ্ট। মাযারাতে আউলিয়ায়ে কেরামের কোন ইশারা ইঙ্গিতও তাতে নেই। মসজিদ সংক্রান্ত হাদীসকে ভিন্ন বিষয়ে অপপ্রয়োগ করলে তো ব্যবসা-বাণিজ্য সহ কোন উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ হবেনা। তারা তো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সফর করাকে অবৈধ বলে ফাতওয়া দেয় না। তাদের এ ধরণের ফতওয়া মূলতঃ আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ বটে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বত, শ্রদ্ধা ও সম্মান করার তাওফীক দান করুন।

[৩৭১]. দুররে মুখতার-২/২৪২, মারাকিউল ফালাহ-১/২২৯, মাজমাউল আনহার-১/৩১৪।
[৩৭২]. সহীহ মুসলিম-৮২৭।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ভিন্ন শহরে অবস্থিত অলি-বুযুর্গের মাযারের যেয়ারত আর স্বীয় পিতা-মাতা, ও পীর-মুর্শিদের কবরের যেয়ারত করার নিয়তে সফর সম্পূর্ণরূপে বৈধ। অনুরূপভাবে কোনও বড় আলেমের আলোচনা শোনার লক্ষ্যে বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির পেছনে নামায আদায়ের আকাঙ্খা নিয়ে কিংবা পীর-মুর্শিদের সান্নিধ্য লাভের মানসে মসজিদের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির আবাসস্থলের মসজিদের উদ্দেশে সফর করাও বৈধ এবং তা সুন্নাতে মুতাওয়ারেসা। বরং তাতে মাযার ও মসজিদ দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

মহিলাদের কবর যিয়ারতের বিধানঃ

উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু ওলামা মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করাকে অবৈধ আবার কেউ মাকরূহ বলে থাকেন। মুলত কবর যিয়ারত পুরুষ মহিলা সকলের জন্য বৈধ। যারা মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত অবৈধ বা মাকরূহ বলেছেন, তারা কেবলমাত্র মহিলাদের কোমল হৃদয়ের কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার আশংকা কিংবা চিল্লাচিল্লি বা কান্নাকাটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণ বলেছেন। যেহেতু হাদীস শরীফে এসেছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা কবর যিয়ারত অন্তরকে নরম করে দেয়, চোখকে অশ্রুসিক্ত করে দেয় এবং পরকালকে স্মরণ করে দেয়।" [৩৭৩]

উল্লেখিত হাদীসে কবর যিয়ারত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্তরকে নরম করা চোখকে অশ্রুসিক্ত করা আর পরকালের স্মরণ কি শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য?

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ عَلَى امْرَأَةٍ جَالِسَةٍ عَلَى قَبْرٍ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا: «يَا أَمَةَ اللهِ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي»

[৩৭৩]. মুসনাদে আহমদ-১৩৪৮৭, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী-৭১৯৮, মুসনাদে আবি ইয়া'লা-৩৭০৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বকীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলাকে মৃত সন্তানের কবরের পাশে কান্না করতে দেখে বললেন, "হে আল্লাহর বান্দী! আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।" [৩৭৪]

উল্লেখিত হাদীসে মহিলা কর্তৃক কবর যিয়ারত প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত মহিলাকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি বরং আল্লাহকে ভয় করতে ও ধৈর্য ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আরেক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ (يَعْنِيْ إِذَا زُرْتُ الْقُبُوْرَ) قَالَ " قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ "

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন কবর যিয়ারত করব তখন কি বলব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "তখন তুমি বলবে, [৩৭৫]

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

উল্লেখিত হাদীসে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কবর যিয়ারতের দোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি দোয়া শিখিয়ে দেন। যদি নিষেধ হত তাহলে বলতেন তুমি কবর যিয়ারত করতে পারবেনা। দোয়া শেখার প্রয়োজন কি?

অতএব, কবর যিয়ারত করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বৈধ। তবে মহিলারা কবর যিয়ারত করতে গেলে পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা রক্ষা করতে হবে, আতর সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হতে পারবেনা, বেগানা পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে পারবেনা এবং কবর ও কবরবাসীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে যিয়ারত করতে হবে। দূরবর্তী কোন অলি-আউলিয়ার মাযার

[৩৭৪]. সহীহ মুসলিম-৯২৬, সুনানু আবু দাউদ-৩১২৪, মুসনাদে আবু ইয়া'লা-৬০৬৭।
[৩৭৫]. সহীহ মুসলিম-৯৭৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-৬৭১২।

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করলে সফরসঙ্গী হিসেবে একজন মুহরিম পুরুষ অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে।

পাদটীকাঃ

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নী নামধারী নব্য সলফীদের একটি পুস্তকে মাসআলা লিখা হয়েছে যে, "মহিলাদের কবর যিয়ারত থেকে বাধা প্রদানের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে; বরং কবর-মাযার যিয়ারতে বের হয়ে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত তারা লা'নতের উপযোগী হয়।" (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)। অথচ সেই পুস্তকের 'কবর যিয়ারতের নিয়ম' অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে শিখিয়ে দেয়া দোয়াটিই লিখা হয়েছে।

এ সমস্ত মোল্লা-মৌং কর্তৃক ইসলামের দেয়া অধিকার থেকে নারী জাতিকে বঞ্চিত করে ইসলামের শত্রুদের দ্বারা নারী জাতিকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুন।

নামায রোজার কাফ্ফারার বয়ান:

মৃত্যুর আগে নামায বা রোজা কাজা থাকলে কাফ্ফারা আদায় করার জন্য অছীয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার কাযা নামায ও রোজার জন্য অছীয়ত করে গেলে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হতে তা আদায় করা তার উত্তরাধিকারীদের উপর ওয়াজিব ৩৭৬।

- ❖ যদি কাফ্ফারার জন্য অছীয়ত করে না যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পত্তি হতে উহা নফল হিসাবে আদায় করা অবশ্যই দরকার। প্রত্যেক ফরয নামায, বিতিরের নামায ও রোজার জন্য এক ফিতরা পরিমাণ কাফ্ফারা দিতে হবে। [৩৭৭]
- ❖ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি না থাকলে বা কম থাকলে তার উত্তরাধিকারীরা কিছু মাল সংগ্রহ করে উহা হিলা করতে পারা যায়। 'হিলা' হচ্ছে বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত নেয়ামত পাওয়ার এক বিশেষ পন্থা। রাব্বুল আলামিন গাফুরুর রাহীম থেকে তার বান্দার গুনাহ্ অন্যায়কে ক্ষমা করার জন্য ইহা এক বাহানা বিশেষ ।

[৩৭৬]. বাহরে রায়েক-২/৯৮, দুররে মুখতার-৬/৬৯৯।
[৩৭৭]. প্রাগুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- আমাদের দেশে যা সালাতে জানাযা আদায়ের পর 'এসকাত' নামে সর্বজন পরিচিত। আমির গরীব সবাই দাফনের পূর্বেই বা তৎক্ষণাৎ নগদ কিছু অর্থ সহ কুরআন করিমকে 'এসকাত' হিসাবে প্রদান করে থাকেন এবং পরবর্তী হিসাব নিকাশ করে শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক সামর্থনুসারে ঐ 'এসকাত' নামক কাফ্ফারা প্রদান করেন।
- কবরকে সামনে নিয়ে ক্বিবলাকে পিঠ দিয়ে যেয়ারত করা এবং দাফনের পর সাধ্য অনুযায়ী কবরের পাশে হাফেয-কারী নিয়োগ দেয়া শরীয়ত সম্মত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কবরে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।
- নিম্নে 'এসকাতের' নিয়মাবলী বর্ণনা করা হলো। উল্লেখ্য যে, এর উপর অনাস্থা এনে পূণ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকলে তার মানে অপারগতাবশত ও প্রচেষ্টা না করে বসে থাকলে গুনাহগার হবে মইয়েতের ওয়ারিসগণ যা আমাদের দেশে সাধারণত করে থাকেন। মৃত ব্যক্তির অপারগতার; অক্ষমতাবস্থায় দরবারে ইলাহীতে 'হিলার' কার্যকারিতার আশা করা যেতে পারে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ গফুরুর রাহীম তাঁর বান্দার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতেও পারেন; আশা করা যেতে পারে। ইহাই হিলার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য বিধান।
- হিলার (হিসাব মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ আদায় অক্ষমের জন্য) নিয়ম এই যে, উক্ত মাল বা অর্থ কোন অনাথ অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তি বা এতিমখানায় দান করবে। সে (গ্রহীতা) আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা মাল মালিক হিসাবে দান করে দেবে। যতক্ষণ পর্যন্তকাফ্ফারার হিসেব অংশ শেষ না হয়, ততক্ষণ এভাবে দেয়া নেয়া করতে থাকবে শরীয়তের পরিভাষায় একে 'তামলিক' বলে।
- মৃত ব্যক্তির মাল থাকা সত্ত্বেও. বা এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা কাফ্ফারা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা. পরিমিত মাল থাকা সত্ত্বেও হিলার ওয়াসিয়াত করে যাওয়া বা 'হিলা' বা 'তমলিক' করা গুণাহ। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে নামাযের বদলা নামায. রোজার বদলা রোজা রাখার ওয়াসিয়ত করলে তা দোরস্ত হবে না-কাফ্ফারাই আদায় করতে হবে। কারণ তা শরিয়ত সম্মত না।

কাফ্ফারা আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী:

প্রথমতঃ মইয়তের অলি ওয়ারিশ হতে কোন এক ব্যক্তি মরহুমের বয়স হিসাব করে তা হতে বালেগ হওয়ার পূর্ব বয়স ১২ বছর বাদ দিয়া: বাকি বয়সে তার কয়টি রমযান মাস গিয়েছে: প্রতি বৎসরের ৩০ দিন রোজার. প্রতি এক রোজায় এক ফিতরা এবং প্রতি বৎসরে ৩৬০ দিন. প্রতি দিনে ৬ ফিতরা নামাযের; সে অনুযায়ী মোট ৩৯০ দিনের এক বৎসরের ফিতরা ২১৯০ ফিৎরা এবং এক ফিতরা পরিমাণ গম / কিসমিস / খেজুর / যব এর পরিমাণ যথাক্রমে প্রথমোক্ত দু'টির ২ কেজি ৫০ গ্রাম এবং দ্বিতীয় ক্রমদ্বয়ের হিসাবে ৪ কেজি ১০০ গ্রাম হিসাব করলে মাল বা নগদ অর্থ সামর্থ অনুসারে কাফ্ফারা হিসাবে প্রদান করতে হবে। সাথে এক খন্ড কুরআন পাক ও কোন মোক্তাকি নিয়মিত কুরআন করীম তেলাওয়াতকারীকে প্রদান করা অধিকতর উত্তম।

তাছাড়া মইয়তের ওয়ারিশ এই কাফ্ফারা প্রদানের সময় উপরোক্ত নিয়ামানুযায়ী হিসাব করে গ্রহীতা ব্যক্তিকে বলবে: এই মাল বা টাকা এবং এই অমূল্যগ্রন্থ কুরআন করিম অমুক মইয়তের কাফ্ফারায়ে মুতলক. কাফ্ফারায়ে সালাত ও সাওম, ইয়ামিন. তেলাওয়াতে সিজদা. জিহার ইত্যাদির কাফ্ফারার এত মণ/টাকাও (সংখ্যা উল্লেখ করবে) সহ অমূল্য কুরআন করিম কাফ্ফারা হিসাবে প্রদান করছি: আপনি কবুল করেছেন? গ্রহীতা কবুল করলাম বলতে হবে।

উল্লেখ্য যে, হিসাবের সমপরিমাণ অর্থ/মাল দিতে অসমর্থ হলে প্রদানকারী কাফ্ফারা গ্রহীতাকে (মৃতের অলী ওয়ারিশের প্রতিনিধি যিনি. তিনি কাফ্ফারা গ্রহীতাকে উপরোক্ত কথাগুলো বলবে) সামর্থ মোতাবেক অর্থ বা মাল এবং একখণ্ড পবিত্র কুরআন করীম প্রদান করে বলবে যে, আপনাকে অমুক মরহুম ব্যক্তির উপরোক্ত কাফ্ফারার ৫০০ / ১০০০ / ১৫০০ মণ গম একখণ্ড কুরআন করীম সহ প্রদান করলাম, আমার গমের মূল্য পরিশোধ করুন। এর উত্তরে গ্রহীতা বলবে আমি মূল্য পরিশোধে অপারগ আমি মিসকিন-গরিব, তবে মূল্য হিসাবে এই অমূল্য ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআন করীম তিলাওয়াত করে আপনার মরহুম মৃতের রূহে ঈসালে সওয়াব করব'। অতঃপর মরহুমের কাফ্ফারা আদায়ের শোকরানা হিসাবে ফাতেহা দুরূদ সালাম পড়তঃ মৃতের মাগফেরাত কামনায় মুনাজাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ গফুরুর রাহীমের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে সম্মিলিতভাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফ্ফারা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ঃ

এছাড়া ঐ কাফ্ফারার অর্থ কোন সুন্নি মিসকিন ফান্ড আছে ঐ এতিমখানায় দিলে সাদকাই ওয়াজেবা কাফ্ফারাও আদায় হবে এবং তা সাদকায়ে জারিয়াতে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দিক। আমিন।

ফাতেহা খানী ও ঈসালে সওয়াব

প্রকাশ থাকে যে, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত অনুসারীদের মতে প্রত্যেক নেক আমল এবং প্রত্যেক এবাদত চাই শারীরিক হোক বা আর্থিক ফরয হোক কিংবা নফল যাবতীয় কল্যাণের সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো যায়। আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জীবিতদের ঈসালে সওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়। যে কোন দিন বা যেকোন সময় ঈসালে সওয়াব করা যায়। আমাদের মুসলিম সমাজে মৃত্যুর তৃতীয়, চতুর্থ দিন কিংবা দশম চল্লিশতম দিন অথবা অর্ধবার্ষিকী বা বার্ষিকী উপলক্ষে নির্দিষ্ট দিনে ফাতেহা খানী বা ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠান করাতে কোন অসুবিধা নাই।

যেহেতু, এই দিবস সমূহ ঈদ কুরবানী ও হজ্ব রোযার মত শরীয়ত কর্তৃক সময় নির্ধারিত নয় সেহেতু আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস হল বছরের যে কোন দিন যে কোন সময় ঈসালে সওয়াব করা যায়। তবে মৃত ব্যক্তির মুহিব্বীন মুতাআল্লিকীনের সহজতা ও সুবিধার্থে উল্লেখিত তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, চল্লিশতম, অর্ধবাষিকী ও বার্ষিকী দিবসে ঈসালে সওয়াব করা সুদুর অতীত থেকে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। এটা তো কেউ বলেনা যে, উল্লেখিত দিবস ছাড়া অনান্য দিনে ফাতেহাখানী বা ঈসালে সওয়াব করা যাবেনা। সাধ্য থাকলে মৃত্যুর দিন থেকে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কুরআনখানী ফাতেহাখানী তথা ঈসালে সওয়াব করা যেতে পারে। মুসলিম সমাজে যার যার তাওফীক ও সাধ্য অনুযায়ী ইহা করা হচ্ছেও।

নিষিদ্ধের সুস্পষ্ট কোন দলীল ছাড়া এই নেক কাজকে হারাম বা বেদআত বলা মুর্খতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। ওহাবী নজদীদের উদ্দেশ্যে শুধু এতুটুকুন বলাই যথেষ্ঠ যে, যেকোন কাজ বৈধ হওয়ার জন্য কোন

দলীল-প্রমাণ এর প্রয়োজন নাই। কোন বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম বা নিষিদ্ধের অকাট্য দলীল পাওয়া যাবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কাজ হালালই প্রমাণিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ওহাবী নজদীরা মুসলিম সমাজে প্রচলিত উল্লেখিত দিবস সমূহে ঈসালে সওয়াবের বিরুধীতা করতে গিয়ে মূল "ঈসালে সওয়াব" এর বিরুধী হয়ে গেছে। তাদেরকে কোন নিকটাত্বীয় দূরের কথা কোন অলি-বুজর্গের জন্যও ঈসালে সওয়াব করতে দেখা যায় না।

আউলিয়ায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ

প্রকাশ থাকে যে, আহদে রেসালাত থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াব করার রীতি চলে আসছে। সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজে আউলিয়ায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার সমূহে ভক্ত অনুরক্তরা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক মাহফিলও করে থাকেন। যাকে আমরা 'ওরস' নামে অভিহিত করি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

ওরসের (عرس) আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'শাদী' বা 'বিবাহ'। আর এ জন্যই বর-কনেকে আরবী ভাষায় عروس ও عريس বলা হয়। সালফে সালেহীনগণ বুযুর্গানে দ্বীনের ওফাত দিবসকে নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে ওরস নামে অভিহিত করেছেন। বেলাদত ও ওফাত তথা জন্ম ও ইনতিকাল দিবস পালন করা আখলাকে মুসলমানীর অন্যতম এবং পুণ্যময় একটি আমল। আর এ আমলকে ইহুদী-নাসারাদের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করা ধৃষ্টতা ও মহাপাপ। কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে-

فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ

"ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আপনি সেই কনের মত শুয়ে পড়ুন, যাকে ওর প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না।" [৩৭৮]

---

[৩৭৮]. জামে' তিরমিযী-১০৭১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি কবরে মুনকার-নকীর এর প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদানকারীর জন্য 'ওরসের দিন' বলেছেন, সেহেতু ওরস বলা হয়।

বাস্তব অর্থে প্রতি বছর ওফাত দিবসে কবর যিয়ারত করা, কুরআনখানি ও সদকা ইত্যাদির ছওয়াব পৌছানোকে ওরস বলা হয়। ওরসের উৎস হাদীছে পাক ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি থেকে প্রমাণিত আছে। এর দ্বারা মরহুমের মাগফেরাত, রফয়ে দারাজাতসহ যায়েরীনদেরও মাগফেরাত হয়।

তফসীরে কবীর উল্লেখিত আছে-

عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ رَأْسَ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ »

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি প্রতি বছর শহীদগণের কবরে তশরীফ নিতেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিতেন। চার খলিফাগণও অনুরূপ করতেন।" [৩৭৯]

তাফসীরে দুররে মনসুরে উল্লেখিত আছে-

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه عَن أنس - رَضِي الله عَنهُ -: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَأْتِي أحدا كل عَام فَإِذا تفوه الشعب سلم على قُبُور الشُّهَدَاء فَقَالَ {سَلام عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنعم عُقبى الدَّار}

"ইবনুল মুনযির ও ইবনু মুরদাওয়াইহ হযরত আনাস (র.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর 'উহুদ' পাহাড়ে তশরীফ নিতেন। যখন পাহাড়ের আঙ্গিনায় পৌঁছতেন তিনি শহীদগণের কবরকে সালাম করতেন।" [৩৮০]

অপর হাদীসে এসেছে-

---

[৩৭৯]. তাফসীরে কবীর-১৯/৩৭।

[৩৮০]. তাফসীরে দুররে মানসূর-৪/৬৪০।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ "

"মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বছরের মাথায় শহীদগণের কবরে আগমন করতেন এবং কবরবাসী শহীদগণকে সালাম করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র.), হযরত ওমর ফারুক (র.), হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান (র.) ও অনুরূপ করতেন।" [৩৮১]

ফতওয়ায়ে শামীতে এসেছে-

رَوَى ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاتِيْ قُبُوْرَ الشهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ

"ইবনে আবি শাইবা (রা:) বর্ণনা করেছেন যে হুযুর আলাইহিস সালাম প্রতি বছর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরে তশরীফ নিয়ে যেতেন।" [৩৮২]

উপরিউক্ত দলীল সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে সুনির্দিষ্ট তারিখে বার্ষিক ওরস তথা ঈসালে সওয়াব করা সুন্নাতে নববী ও অত্যন্ত মহৎ কাজ। সেই ওরস অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করাও ঈসালে সওয়াবের অন্তর্ভূক্ত তথা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

এ ছাড়াও মানুষের সুস্থ বিবেকবোধও বলে যে, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস করা অত্যন্ত ভাল কাজ। কেননা

১. ওরস হচ্ছে যিয়ারতে কবর ও সদকা খয়রাতের সমষ্টি এবং উভয়টা সুন্নাত। তাই দুই সুন্নাতের সমষ্টি (ওরস) কিভাবে হারাম হতে পারে?

---

[৩৮১]. তাফসীরে কুরতুবী-৯/৩১২, তাফসীরে ত্বাবারী-১৩/৫১৩, তাফসীরে আবুস সাঊদ-৫/১৮, তাফসীরে সা'লাভী-৫/২৮৭।

[৩৮২]. দুররে মুখতার-২/২৪২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. উরসের তারিখ নির্ধারিত থাকলে, লোকেরা সহজে জমায়েত হতে পারে এবং লোকেরা একত্রিত হয়ে কুরআনখানী, কলেমা তৈয়্যেবা, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করতে পারে এবং এতে অনেক বরকতের সমন্বয় ঘটে।

৩. পীরের ওরসের দিন মুরিদানেরা আপন পীর ভাইদের সাথে অনায়াসে সাক্ষাত করতে পারে এবং পরস্পরের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

৪. ওরসে গিয়ে দেখা যায় যে, ওখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বুযুর্গানেদ্বীন, উলামায়ে কিরাম ও সুফিয়ানে ইজাম সমবেত হয়েছেন। সবাইকে দেখে ও তাঁদের আলাপ-আলোচনা শুনে নিজেকে শুধরে নেয়ার একটা মহা সুযোগ লাভ হয়।

অত্যন্ত দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর আলিম নামধারী লোক আওলিয়ায়ে কেরামের মাযারে ওরস করাকে অবৈধ বলে ফতওয়া দেয়। তারা ওরস অনুষ্ঠানে পশু যবেহ করাকে 'গাইরুল্লাহর নামে যবেহ' বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ বলে উহা খাওয়া হারাম বলেও ফতওয়া দেয়। আমি তাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আউলিয়ায়ে কেরামের ওরসে যবেহকৃত পশুসমূহ তাঁর ভক্ত অনুরক্তরা মাযারে শায়িত আল্লাহর অলির ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে খালেছভাবেই আল্লাহর নামেই যবেহ করে থাকেন। এ সমস্ত জ্ঞানপাপীরা এখানে 'গাইরুল্লাহ' তথা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে যবেহ কোথায় পায় আমার বোধগম্য নয়।

আম্বিয়া-আউলিয়া, পীর-বুযুর্গ, আপন মুরব্বি ও উম্মতে মরহুমার ঈসালে সওয়াব, ওরস-ফাতেহা বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, গিয়ারভী শরীফ পালনে অথবা বান্দা নওয়াজ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.) এর ওরস, ওরসে দাতা আলী হাযভিরী (রহ.), ওরসে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ওরসে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (রহ.) সহ আউলিয়ায়ে কেরামের ওরস উদযাপনের উদ্দেশ্যে খরীদা পশু উপরোক্ত নিয়মে জবেহ করলে তা' যদি খাওয়া হারাম হয়, তাহলে বিশ্ব মুসলিমের পবিত্র কুরবানীর পশুর গোশত খাওয়াও হারাম হবে। কেননা পশু কেনার সময় নিয়ত বা মানত করা হয় যে,

অমুক সাতজন বা একজনের নামে উট-গরু-মহিষ বা ছাগল-ভেড়াটি কুরবানী করা হবে বা কুরবানী দিচ্ছি। এর মানে কি পশুটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ হচ্ছে? মুহতারাম পাঠক! আশা করি বিষয়টি সানুনয় বিবেচনা করবেন। আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুন।

পুণশ্চঃ

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মোল্লা-মুন্সী পবিত্র মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপনের ব্যাপারে আপত্তি করে বলে যে, সুন্নীরা তো মীলাদুন্নবীর অর্থও বুঝেনা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলাদত ও বেসাল বা জন্ম ও ওফাত রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ একই দিনে হয়েছে। জন্ম খুশী উদযাপন কামনা করে আর ওফাত শোক উদযাপন কামনা করে। সুন্নীরা জন্মের আনন্দ উদযাপন করে কিন্তু ওফাতের শোক পালন করেনা কেন? এ হল তাদের প্রশ্ন।

তাদের এ অনর্থক প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই যে, ইসলামী শরীয়তে কোন ব্যক্তির ইনতিকালের পর কেবলমাত্র তিনদিন পরান্ত শোক পালন করার অনুমতি রয়েছে। এর অতিরিক্ত শোক পালন করা বৈধ নয়। তাই আমরা রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ শোক পালন করিনা। কেবলমাত্র জশনে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.) পালন করে থাকি এবং এ মাসে শুধু একদিন নয় একনাগাড়ে ১২ দিন ব্যাপী ঈদ পালন করি আমাদের মাদরাসার ব্যবস্থাপনায়। শুধু তাই নয়, আমরা রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ তামাম কায়েনাতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এবং সেটা মনে করা ঈমানের দাবীও বটে। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ

"এবং তাদেরকে আল্লাহর (নেয়ামত প্রদানের) দিবস সমূহ স্মরণ করান"[৩৮]

মুসলমান নয় শুধু পুরো সৃষ্টি জগতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে?!

অপর আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

---

৩৮. সূরা ইবরাহীম-৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থাৎ "হে নবী! আপনি বলুন "আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার মেহেরবানী দ্বারা লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে সে সবের চেয়ে এটি অনেক উত্তম"। [৩৮৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের চেয়ে বড় অনুগ্রহ ও মেহেরবানী আর কি হতে পারে?! তাই সুন্নী মুসলমানের কাছে রবিউল আউয়াল মাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.)।

উল্লেখ্য যে, তিনদিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা বৈধ নয় বলেই আমরা আউলিয়ায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের ওফাত দিবসে শোক পালনের পরিবর্তে তাঁদের স্মরণে ওরস উদযাপন করি এবং ঈসালে সওয়াব মাহফিল স্মরণ সভা ইত্যাদি করে থাকি যা সম্পূর্ণ বৈধ ও অত্যন্ত পূণ্যের কাজ। আর শোক দিবস পালন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এছাড়া আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত অনুসারীরা বিশ্বমুসলিমের কল্যাণেষু। কারণ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইগণকে ক্ষমা কর। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখনা"। (সূরা আল-হাশর-১০)

অতএব, ইনতিকালের চতুর্থ দিবস থেকে শোক দিবস নাম দিয়ে যেকোন ধরণের অনুষ্ঠান করা শরীয়ত পরিপন্থি।

তাহাজ্জুদের নামায:

তাহাজ্জুদের নামায সুন্নাতে 'গাইরে মুয়াক্কাদা' কমপক্ষে দুই রাকাতের উর্ধ্বে ১২ (বার) রাকাত, এবং মধ্যম আট রাকাত। দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম। যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়।

এশার নামাযের পর নিদ্রা যেয়ে কিছুক্ষণ হলেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে উঠে যে ব্যক্তি নফল নামায পড়বে, তাহা 'তাহাজ্জুদের নামায' হিসাবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রার ভান করে, অতঃপর সালাতে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম।

[৩৮৪] সূরা ইউনুস ৫৮।

সালাতুত্ তাসবীহ:

প্রকৃত একজন মুসলমান দাবীদারকে অন্তত মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে যাবার পূর্বে হলেও সুন্নাত নামায হিসাবে 'সালাতুত্ তাসবীহ' পড়া অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও অধিক পূণ্যবান। এ নামায প্রত্যেক উম্মতের জন্য জীবনে একবার হলেও আদায় অপরিসিম গুরুত্বপূর্ণ। সুফিয়ায়ে কেরামগণ এর অনেক গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। সালাতুত্ তাস্‌বীহের নামায চারি রাকাত, এই চারি রাকাত নামাযে মোট তিন শতবার নিম্নোক্ত তসবীহ পড়তে হয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।

সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়ার নিয়ম:

সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়ার নিয়ম এই যে, তাকবীরে তাহরীমার পর "দোয়ায়ে সানা" বা সোবহানাকা পড়তঃ পনের বার, ক্বিরাআত শেষে দশ বার, রুকু অবস্থায় রুকুর তসবীহ পড়ার পর দশবার, রুকুর পর সোজাভাবে দাঁড়িয়ে দশবার, সেজদারত অবস্থায় প্রথম সেজদার তসবীহ'র পর দশবার, উভয় সেজদার মধ্যখানে সোজাভাবে বসে দশবার, এবং দ্বিতীয় সেজদায় তসবীহ'র পর দশবার উপরোক্ত তাসবীহ পড়বে। এই নিয়মে দ্বিতীয় রাকাতেও, প্রথম রাকাতের ন্যায়, প্রথমে পনের বার এবং পরে দশবার করে উপরোক্ত তসবীহ পড়বে। মোট কথা প্রত্যেক রাকাতে ৭৫ বার, এবং মোট চার রাকাতে ৩০০ বার পড়বে।

- এই নামাযও দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম। উহা যে কোন সূরা দ্বারা পড়তে পারা যায়। তবে প্রথম রাকাতে সূরা তাকাসুর দ্বিতীয় রাকাতে সূরাতুল আসর, তৃতীয় রাকাতে সূরা কাফেরুন, চতুর্থ রাকাতে সূরা এখলাছ দ্বারা পড়া উত্তম। তাসাবীহ্‌গুলো বৃদ্ধ আঙ্গুলের মাথায় না গুনিয়া, আঙ্গুল চাপা দিয়ে গুনবে। যদি কোন স্থানের তাসবীহ ভুলে ছুটে যায়, তবে নিকটবর্তী রুকু, সেজদায় বা কেয়ামে পূর্ণ করবে। মোটকথা চারি রাকাতের এই নামাযে মোট তিন শতবার উপরোক্ত তাসবীহ পূর্ণ তিলাওয়াত করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এস্তেখারার নামায:

হাদীস শরীফে আছে, সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন যে, মানুষের জন্য সৌভাগ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এস্তেখারা করে নিজ নিজ কর্তব্য মঙ্গল কল্যান সাধনের পথ সুগম করার বিধান দিয়েছেন এবং কল্যাণ অকল্যাণের পূর্ব ধারণার জন্য মহান আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করা ও জানার নিয়ম বাতলিয়ে দিয়েছেন। যারা এরকম প্রার্থনা করে না তারা বদবখ্ত। (তিরমিযী)

অতএব, যদি কারো কোন কাজ সম্বন্ধে চিন্তা হয়, এবং তা করা না করা সম্বন্ধে দ্বিধা হয়, তখনই এস্তেখারা করবে। সাতবার পর্যন্তএস্তেখারা করে যেদিকে মনের টান হয় তাহা করবে। এস্তেখারার পর ওই কাজই সাধিত হবে, যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক।

- স্বপ্নে কিছু দৃষ্টিগোচর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন কোন বুযর্গ হতে বর্ণিত আছে যে, রাত্রে উক্ত নামায ও দো'আ পড়ে অযুর সাথে মুসলিম রীতি অনুযায়ী কেবলামুখী হয়ে শুয়ে (ঘুমায়ে) থাকবে। যদি স্বপ্নযোগে সাদা বা সবুজ রং দৃষ্টিগোচর হয়, তবে মনে করবে এ কাজ ভাল, উহা করবে। যদি কাল বা লাল রং দেখা যায়, তবে বুঝবে উহা ভাল নয়, তা কখনও করবে না।
- ❖ হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি নেক, সৎ কাজের জন্য এস্তেখারা করা নিষিদ্ধ। তবে এসব কাজে তারিখ নির্ধারণের জন্য এস্তেখারা করা যায়। এস্তেখারার নামাযে প্রথম রাকাতের সূরা কাফেরুন, এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পড়া উত্তম। দুই রাকাত নামায পড়ে নিম্নলিখিত দো'আ পড়বে-

এস্তেখারার দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ اِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لاَ اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لاَ اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَ اصْرِفْنِیْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِ بِهٖ ـ

আরবী উচ্চারণ:

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখিরুকা বে ইলমিকা ওয়া আসতাকদেরুকা বে কুদরাতেকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্লিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাকদেরু ওয়ালা তাকদেরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাজাল আ'মরা খায়রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মায়াশী ওয়া আকেবাতে আ'মরী ফাআকদেরহুলী ওয়া ইয়াস্ সেরহু লী সুম্মা বারেক লী ফিহে, ওয়াইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল আ'মরা শার্'রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মায়াশী ওয়া আকেবাতে আ'মরী ফা আসরেফ্হু আন্নি ওয়া আসরেফ্ নি আনহু ওয়া কাদ্দের লীয়াল খায়রা হাইসু কানা সুম্মারদে বিহি।

এই দো'আর আগেও পরে সূরা ফাতেহা এবং দুরূদ শরীফ (যতক্ষণ জাগ্রত থাকে) পাঠ করা মুস্তাহাব।

সেজদায়ে সাহু আদায়ের নিয়ম:

সাহু সেজদা দেওয়ার নিয়ম এই যে, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরায়ে নামাযের ন্যায় দুই সেজদা দেবে। দু সেজদা আদায়ের পর সালাম না ফিরায়ে বসবে। উল্লেখ্য যে, সাহু সেজদা আদায়ের জন্য তাকবিরে তাহরিমা বা নতুন করে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। শুধু সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবিহ্ সমূহ আদায় করবে। অতঃপর সেজদা থেকে উঠে পুনরায় তাশাহুদ ও দুই দুরুদে ইব্রাহীম (আল্লাহুম্ম সাল্লে আলা মুহাম্মদ ও আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ) ও দো'আ মাসুরা (উপরে বর্ণিত হয়েছে) পড়ে সালাম ফিরাবে।

'জখিরা' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ছয়টি কারণের যে কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।

১. কোন রোকন যথাস্থান ও যথা সময়ের পূর্বে করলে। যথা কেরাআতের আগে রূকু করলে বা রুকুর আগে কিরাআত পড়লে।

২. কোন রোকন আদায় করতে বা দাঁড়াতে বিলম্ব করলে। যেমন কোন রাকাতে দুই সেজদার জায়গায় এক সেজদা দিলে, পরবর্তী রাকাতে স্মরণ হলে ওই রাকাতের সেজদার সাথে ওই সেজদা কাযা করতঃ ওই বিলম্বের জন্য সেজদায়ে সাহু দিবে। অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাতসমূহে দাঁড়ায়ে বিলম্ব করলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. ভুলবশতঃ কোন রোকন বারংবার আদায় করলে; যেমন রুকু দু'বার করলে বা সেজদা তিনটি করলে।

৪. কোন ওয়াজিবের বিপরীত করলে। যথাঃ চুপে চুপে পড়ার স্থলে উচ্চস্বরে পড়লে বা উচ্চস্বরে পড়ার স্থলে চুপে চুপে পড়লে।

৫. কোন ওয়াজিব ত্যাগ করলে; যথা ফরয নামায সমূহের প্রথম বৈঠক ত্যাগ করলে।

৬. পুরো নামাযের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাত তরক করলে; যেমন প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ত্যাগ করলে।

জ্ঞাতব্যঃ

উপরোক্ত উসূলের (মূলনীতির) ভিত্তিতে সাহু সেজদা সম্পর্কীয় আরো কয়েকটি মসায়েল। যেমন-

❖ তিনবার 'সোবহানাল্লাহ' পড়ার পরিমাণ সময় (এক রোকন পরিমাণ) অসাবধানতা বশতঃ কোন চিন্তায় মগ্ন থেকে নামাযের কোন রোকন বা ওয়াজিব আদায় করতে বিলম্ব করলে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে।

❖ ৩ বা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে না বসে ভুলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হতে ফিরে এসে বসলে; সেজদায়ে সাহু দিতে হবে।

❖ বসার নিকটবর্তী হতে ফিরে এসে বসলে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে না। যে কোন নামায যা দুই/চার বা তিন রাকাতের বা বিতিরের-শেষ অবস্থায় (বৈঠকেরস্থলে) ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে, সেজদা না করা পর্যন্তফিরে এসে বসবে, যথারীতি তাশাহুদ পড়ে সাহু সেজদা দিতে হবে।

❖ হ্যাঁ! ভুলবশতঃ দাঁড়ানোর পর রুকু করতঃ যদি একটি সেজদাও দেওয়া হয়, ঐ প্রেক্ষিতে আরো এক সেজদা করে রাকাত পূর্ণ করে নেবে। তবে ঐ অবস্থায় মাগরিবের তিন রাকাত। ফরয নামায বা বিতিরের তিন রাকাত ওয়াজিব নামায নফল নামাযে পরিণত হবে।ফলে ঐ অবস্থায় মাগরীব ও বিতির নামাযে আরো এক রাকাত বর্ধিত করে চার রাকাত পূর্ণ করতে হবে। এমতাবস্থায় ওই চার রাকাত নামায "নফলে' পরিণত হবে; এ জন্য যে, ঐ দুই নামাযের রাকাত সংখ্যা যথাক্রমে তিন করে। অতএব পরবর্তীতে ওই মাগরিব ও বিতির এর ফরযও ওয়াজিব নামায পুনঃরায় আদায় করতে হবে।

❖ আর চার বা দুরাকাত বিশিষ্ট নামাযে- ভুলবশতঃ দাড়ালে পরবর্তীতে আরো দু'রাকাত পূর্ণ করবে। এবং সেজদায়ে সাহু আদায় করবে। তবে ওই চার বা দুই রাকাত ফরয বা সুন্নাত নিয়ত করে শুরু করা নামাযকে আবার পড়তে হবে না। কারণ, ঐ নামায এর রাকাত ফরয সুন্নাত হওয়ার বা আদায় শুরুর নিয়তের ক্ষেত্রেই দুই বা চার রাকাতই ছিল। অতএব ভুলবশতঃ দাঁড়ানোর পূর্বের আদায় করা নামায চার বা দুই রাকাত দ্বারা ফরয বা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, এবং পরবর্তী আদায়কৃত নামাযসমূহ নফলে পরিগণিত হবে। এবং মনে রাখতে হবে যে, মাগরিবে ও বিতিরে যেহেতু এক রাকাত বা দুই রাকাত পড়লেও নামাযের সংখ্যা যেহেতু চার বা পাঁচে দাঁড়াচ্ছে, সমুদয় নামায নফল হবে। কারণ ঐ নামায এর রাকাত পরমিল হয়ে গিয়েছে সংখ্যাগত। অতএব মাগরিব বিতির এর নামায আবার পড়তে হবে।

❖ যদি শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে দাঁড়ায়ে যায়; তবে পরবর্তি সেজদা না করার পূর্ব পর্যন্তফিরে আসতে পারবে। রুকু করে ফেললেও। কিন্তু সেজদা করে ফেললে আরও এক রাকাত বাড়াবে। যাতে শেষ দু রাকাত নফল হয় (চার বা দু'রাকাত বিশিষ্ট নামাযে)। এতে করে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে।

❖ মুক্তাদী (ইমামের পিছনে নামায আদায়রত ব্যক্তি) নিজের ভুলের জন্য সাহু সেজদা দিতে হবে না। মাসবুক (ইমামে পিছনে জামাতের কিছু অংশে শরিক হয় এমন মুসল্লি) ইমামের সাথে সাহু সেজদা দিয়ে থাকলেও নিজের অবশিষ্ট নামায আদায় করার সময় সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মত (জামাতে অংশ গ্রহণের পূর্বে যে রাকাত সমূহ মুসল্লি পায়নি তা আদায় কালে) ভুল হলে (যদি ইমাম সাহেব তাঁর নামাযে কোন ভুলের কারণে সাহু সিজদা দিয়েছেন, মুক্তাদী ও ইমামের অনুকরণের জন্য দিয়েছেন তার পরেও) ওই ব্যক্তি সেজদায়ে সাহু দিতে হবে।

❖ সাধারণতঃ জুমা ও ঈদের নামাযের জমাআত বড় হয়, সেহেতু ভুলের জন্য সাহু সেজদা দিতে হবে না। নামায ও দোহ্‌রাতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব তরক করলে সাহু সেজদাই যথেষ্ট নয়, নামায দোহ্‌রাতে বা পুনরায় পড়তে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ❖ এভাবে ভুলে ওয়াজিব তরক হলে, সাহু সেজদা দিতে ভুলে গেলেও নামায দোহ্‌রাতে হবে। নামাযের কোন রোকন বা ফরয তরক হলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নামায দোহরাতে হবে। শুধু সাহু সেজদা যথেষ্ট নয়।
- ❖ ভুলে কয়েকটি ওয়াজিব তরক হলেও সাহু সেজদা একবার দেয়াই যথেষ্ট। নামাযের সুন্নাত বা মুস্তাহাব তরক হলে, সাহু সেজদা দিতে হবে না। নামায হয়ে যাবে।

নামাযের দো'আ ও নিয়ত সমূহ ঃ

যে কোন নামাযের নিয়তের পূর্বে পড়তে হয় দো'আ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ ইন্নিওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদ্বা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন ।[৩৮৫]

প্রথমে ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত দো'আ পড়তে হয়।

ফযরের দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই সালাতিল ফজরে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জিহতীল কাবা তিস্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

যে কোন নামাযের জন্য উপরোক্ত ইচারতগুলো নিয়ত হিসাবে উক্ত ওয়াক্ত নামাযের নাম উল্লেখপূর্বক পড়ে তাকবীরে তাহরিমা বেঁধে "দো'আয়ে সানা" পড়তে হবে।

দো'আয়ে সানা নিম্নরূপঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

[৩৮৫] . মুসলিম- ৭৭১, আবু দাউদ- ৭৬০, তিরমিজী- ৩৪২১।

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদেকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তায়ালা যাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

ফজরের দু'রাকাত ফরযের নিয়তঃ

উপরে বর্ণিত দু'রাকাত সুন্নাতের নিয়তের ন্যায় শুধু سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى 'সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা'র স্থলে فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى 'ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা' পড়তে হবে।

যোহরের বার রাকাত নামাযে প্রথম চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ كَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকআতে সালাতিজ্জোহরে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জিহতিল কাবাতিশ্ শারিফাতে আল্লাহু আকবর।

যোহরের চারি রাকাত ফরযের নিয়তঃ

চারি রাকাত সুন্নাতের ন্যায়, শুধু سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি তা'আলার স্থলে فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা বলবে।

অতঃপর যোহরের দু'রাকাত সুন্নাতের (মুয়াক্কাদা) নিয়তঃ

উল্লেখ্য যে, যোহর, মাগরিব, ইশা ফরজের পরের দু'রাকাত নামায সমূদয় হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ফযরের দু'রাকাত সুন্নাতের নিয়তের মত শুধু صَلٰوةِ الْفَجْرِ 'সালাতিল ফযরে'র স্থলে صَلٰوةِ الظُّهْرِ 'সালাতিজ্ জোহরে' বলবে।

যোহর, মাগবির ও এশার দু দুই রাকাত সালাতে নফলের নিয়তঃ

প্রকাশ থাকে যে, এ তিন ওয়াক্ত নামাযের ফরযের পর দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, এরপর যে দু'রাকাত নামায; তা নফল হিসাবে বিবেচিত এবং ঐ দু'রাকাত নফল নামায সমূহের নিয়ত নিম্নরূপঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই সালাতিন্ নাফলে মো তাওয়াজ্জেহান ইলা জেহতিল কাবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

আসরের চার রাকাত (ফরযের পূর্বে) সুন্নাতের (জায়েদা) নিয়ত:

যোহরের চার রাকাত সুন্নাতের নিয়তের মত, শুধু صَلٰوةِ الظُّهْرِ সালাতিয্ যোহরের স্থলে, صَلٰوةِ الْعَصْرِ 'সালাতিল আসরে' বলবে।

আসরের চার রাকাত ফরযের নিয়ত:

ফরযের নিয়ত, সুন্নাতের নিয়তের মত শুধু سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى 'সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা'র স্থলে فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالَى 'ফারদ্বুল্লাহি তা'আলা' বলবে।

মাগরিবের তিন রাকাত ফরযের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাতে সালাতিল মাগরিবে ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা মুতা ওয়াজ্জিহান ইলা জেহতিল কাবাতিশ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফি মাযহাব মতে মাগরিব নামাযের ফরজের পূর্বে কোন প্রকার নফল নামায নেই। অন্য মাযহাবে থাকলেও হানাফি মাযহাবে নেই। হারামাইন শরিফাইনে সালাতে মাগরিবের ফরযের পূর্বে ঐ নফল নামায পড়তে দেখা যায়। অতএব আপনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী হয়ে থাকলে তা পড়া হতে বিরত থাকবেন।

মাগরিবের ফরয আদায়ের পর দু'রাকাত সুন্নাতের (মুয়াক্কাদা) নিয়ত:

ফযরের দুরাকাত সুন্নাতের নিয়তের মত শুধু صَلٰوةِ الْفَجْرِ 'সালাতিল ফাযরির স্থলে صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ সালাতিল মাগরিবে বলবে।

এশার (চার রাকাত ফরযের পূর্বে) চার রাকাত সুন্নাতের নিয়ত:

যোহরের চার রাকাত সুন্নাতের নিয়তের ন্যায় শুধু صَلٰوةِ الظُّهْرِ 'সালাতিয্ যোহরের স্থলে, صَلٰوةِ الْعِشَاءِ 'সালাতিল এশায়ে বলবে।

এশার চার রাকাত ফরযের নিয়ত:

জোহরের চার রাকাত ফরযের নিয়তের ন্যায় শুধু صَلٰوةِ الظُّهْرِ 'সালাতিজ্ যোহরের' স্থলে, صَلٰوةِ الْعِشَاءِ 'সালাতিল এশায়ে' বলবে।

এশার (চার রাকাত ফরযের পর) দু'রাকাত সুন্নাতের (মুয়াক্কাদা) নিয়ত: ফযরের দু'রাকাত সুন্নাতের নিয়তের ন্যায়-শুধু صَلٰوةِ الْفَجْرِ 'সালাতিল ফযরের স্থলে, صَلٰوةِ الْعِشَاءِ সালাতিল্ এশায়ে বলবে।

তিন রাকাত বি'তরের (ওয়াজিব নামাযের) নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাক্আতে, সালাতিল বিতরে, ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জেহাতিল কাবাতিস্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

বিতিরের পর দু'রাকাত সুন্নাত (সালাতে শাফেয়াল বিতর) বসে পড়বে:

নিয়ত নিম্নরূপ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَسْوِيَةِ الْوِتْرِ شَافِعًا الْوِتْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই সালাতে তাসবিয়াতিল বিতরে শাফে'আল বিতরে সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জেহতিল কাবাতিস শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

জুমার নামাযের নিয়তসমূহ নিম্নরূপ

প্রথমতঃ দু'রাকাত তাহ্ইয়াতুল অযুর নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাতে সালাতে তাহইয়াতিল ওয়াদ্বুয়ে মুতাওয়াজ জেহান ইলা জিহতিল কাবাতিশ শারিফাতে আল্লাহু আকবর।

প্রকাশ থাকে যে, তাহইয়াতুল অযুর নামায আদায়ের পর দু'রাকাত নামায তাহইয়াতুল মসজিদ রয়েছে।

তাহ্ইয়াতুল মসজিদের নিয়ত:

তাহাইয়াতুল মসজিদের নিয়ত তাহাইয়াতুল অযুর ন্যায় শুধু وُضُوْءِ অযুর স্থলে مَسْجِدْ মসজিদ শব্দ সংযোজন করবে।

চার রাকাত কাব্লাল জুমার (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلِ الْجُمْعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাতে সালাতে কাব্লাল জুমা'আতে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জেহ্তিল কাবাতিস শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

জুমার দু'রাকাত ফরযের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمْعَةِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উসকেতা আন যিম্মাতি ফারদ্বুয্ যোহ্রে বেআদায়ে রাকআতাই সালাতিল জুমা'আতে ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জেহতিল কাবাতিস শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

চার রাকাত বাদাল জুমার (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) নিয়ত:

বাদাল জুমার নিয়ত 'কাব্লাল জুমার' নিয়তের ন্যায় শুধু قَبْلَ الْجُمْعَةِ 'কাব্লাল জুমার' স্থলে بَعْدَ الْجُمْعَةِ "বাদাল জুমা" বলবে।

দু'রাকাত 'সুন্নাতুল ওয়াক্তে'র নিয়ত:

'সুন্নাতুল ওয়াক্তের নিয়ত-'তাহ্য়াতুল মসজিদের' নিয়তের ন্যায়, কেবল تَحِيَّةُ 'তাহ্য়াতুল মসজিদের' স্থলে سُنَّةُ الْوَقْتِ الْمَسْجِدِ 'সুন্নাতুল ওয়াক্ত' বলবে।

নামাযে তারাবীর নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আ'তাই সালাতিত তারাবীহে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জেহান ইলা জেহতিল কাবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

দুই ঈদের নামাযের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالَى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতে ঈদিল ফিতরে মায়া সিত্বে তাক্‌বীরাতে ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্‌জেহান ইলা জেহতিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

সালাতে ঈদুল আযহার নিয়ত, ঈদুল ফিতারের নিয়তের ন্যায় কেবল عِيْدِ الْفِطْرِ ঈদিল ফিতরের স্থলে عِيْدِ الْاَضْحٰى ঈদিল আদ্বহা' বলবে।

জানাযার নামাযের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـــــ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উয়াদ্দিয়া আরবায়া তাক্‌বীরাতে সালাতিল জানাযাতে ফারদ্বিল কেফায়াতে, আস্‌সানাউ লিল্লাহি তা'আলা, ওয়াস্‌সালাতু আলান্নাবীয়ে, ওয়াদ্দোয়াউ লিহাজাল মাইয়েতে মুতাওয়াজ্জেহান ইলাজিহতিল কাবাতিশ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

প্রকাশ থাকে যে, মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে নিয়তে শুধু لِهٰذَا الْمَيِّتِ "লিহাজাল মাইয়েতে" এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ "লিহাজিহিল মাইয়েতে" বলতে হবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিত্ তাহাজ্জুদে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মোতাওয়াজ্জেহান ইলা জেহতিল কাবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

সালাতু-ত-তাসবীহের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ نَفْلٌ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিত্ তাসবীহি নাফল মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহতিল কাবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

উল্লেখ্য যে, সালাতুল ইশ্‌রাক, সালাতুদ্দোহা, সালাতুয যাওয়াল, সালাতুল আওয়াবীন, সালাতুস্ সফর, সালাতুল কতল, সালাতুল মুসীবত, সালাতুল ইস্তিসকা, সালাতুল হাজত, সালাতুল ইস্তিখারা, সালাতুত-তাওবা, সালাতু লায়লাতিল বারাত, সালাতু লায়লাতুল কৃদর, সালাতু লাইলাতুল ঈদ ইত্যাদির নিয়ত 'সালাতুত্ তাস্‌বীহের' নিয়তের ন্যায় কেবল "সালাতুত্ তাসবীহ" এর স্থলে যে নামায আদায় করার উদ্দেশ্য করবে শুধুমাত্র উক্ত নামাযের নাম বলতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য:

সালাতে তাহাজ্জুদসহ যে কোন নফল নামায আদায় করার বেলায় ফকিহ্‌গণের মতামত হচ্ছে, মুসল্লিরা নিজের জীবনের কোন নামায কাযা রয়েছে কিনা তা হিসাব কসে প্রথমত ওমরী কাযার নামায আদায় করে নেবে। ওমরী কাযার নামায এর তারতিব ওমরী কাযার নামাযের বিবরণের অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের একটা ভুল প্রথার কথা বলতে হচ্ছে যে, বালেগ হওয়ার পর হতে তো প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর নামায পড়া ফরয, কিন্তু আফসোস! মুসলমান! সে ২৫/৩০ বৎসর বয়স অতিক্রম করলে নামায আদায় বা পড়া শুরু করে বা বিয়ের পর হতে। যা মারাত্মক ভুল, অপরাধও বটে। আবার পড়লেও নিয়মিত না, অথচ যা নিয়মিত পড়া ফরজ ছিল। আল্লাহ্ সবাইকে তৌফিক দিন।

আবার আরেকটা প্রবণতা দেখা যায় যে, সে বালেগ হাওয়ার পর হতে অনেক দিন নামায পড়েনি। যে থেকে পড়া শুরু করেছে বিগত কাযা নামাযগুলোর ক্বাযা আদায় এর গুরুত্ব না দিয়ে নফলের দিকে ঝুকে পড়ে। বিগত কাযা নামায আদায় করে না, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ও দুঃখজনক। ওই সমস্ত ব্যক্তিরা তাহাজ্জুদ তথা নফল নামায পড়ার চাইতে ফরয নামায যা তার জীবনের কোন অংশে কাযা হয়ে রয়েছে: ঐ ফরযগুলো আদায় করা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রথম নাম্বার ফরয- অতি উত্তম।

তাছাড়া ঐ ঈমানদার ব্যক্তি দৃঢ়চেতা-ধর্ম অনুরাগী এবং আখেরাতের প্রতি যদি তার চিন্তা ও ফরযিয়াতের গুরুত্ব থাকে; তাহলে ঐ ১২/১৪ বৎসরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাযও সে ১/৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে তার সমস্যা হওয়ার কথা না। কেননা কাযা নামায আদায় সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে; তারপরেও সুপ্রিয় পাঠক খেদমতে পুনঃবার আরম্ভ করছি যে, উপরোক্ত কাযাগুলো যেহেতু ৬ ওয়াক্তের অধিক হচ্ছে, তাই ঐ কাযাগুলো আদায়ে অধিক হয়েছে, তাই ঐ কাযাগুলো আদায়ের ব্যাপারে তারতীবের অনুসরণ করতে হবে না।

অতএব, মাকরূহ সময় ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে ঐ নামাযগুলো আদায় করতে পারবে। শুধুমাত্র মাসের বৎসরের ও ওয়াক্তের গণনার হিসাব করতে হবে. আর ঐ রকম কাযাগুলোর ব্যাপারে শুধুমাত্র ফরয ও ওয়াজিবগুলো আদায় করতে হবে। সর্বোপরি প্রয়োজন হবে যে, মুসল্লীর সদিচ্ছা ও আল্লাহ্ ভীতি। আল্লাহ্ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন। হ্যাঁ পবিত্র নগরী মক্কা মদীনা শরীফাইনে ওই ব্যক্তির অবস্থান হলে নফলের দিক হতে কিছু আদায় করলেও ওমরী কাযার নামাযকে অত্যাধিক গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। কেননা ওই নামায তার উপর ফরয ছিল।

নিয়তের পর যেভাবে নামায আদায় করতে হয়:

'তাকবীর' শব্দের অর্থ উচ্চস্বর বা 'আল্লাহু আকবর' বলা। নামাযের প্রথম তাকবীর যাকে 'তাকবীরে তাহরীমা' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে, ইমাম উচ্চস্বরে, মোক্তাদী নিম্নস্বরে বলা প্রত্যেকের উপরই ফরয। পরবর্তী তাকবীরসমূহ প্রত্যেকের উপর সুন্নাতে মাওয়াক্কাদা।

'তাকবিরে তাহরিমা'র পর পর নিম্নোক্তে দো'আই সানা পড়তে হয়।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اِسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্ মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। [৩৮৬]

তা'আউয:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাযীম' বলা।

---

৩৮৬ . মুসলিম- ৩৯৯, আবু দাঊদ- ৭৭৫, তিরমিজী-২৪২, তাফসীরে কুরতুবী- ১/৮৭, আল-মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন-১/২৬০

তাসমিয়াহ্:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলা।

ফাতেহা:

পূর্ণ 'আল-হামদু সুরা' (সূরা ফাতিহা) পড়া।

যাম্মে সূরা:

যাম্মে সূরা, অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পড়ার পর অন্য যে কোন সূরা বা তিন আয়াত সম পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা বা পড়া। একাকী নামায আদায়কারী, ইমাম ও মাসবুক সালাম ফেরানোর পর বাকী নামায আদায় করার সময় ফাতেহা ও যাম্মে সূরা করবে।

প্রকাশ থাকে যে. প্রত্যেক চার ও দুই রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং প্রত্যেক নফল মুস্তাহাব. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং বিতির নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা ও জম্মে সূরা হানাফী মাজহাব মতে যথাক্রমে ফরজ এবং ওয়াজিব। যেহেতু ফরজ এবং ওয়াজিব, সেহেতু সূরা ফাতেহা ও অন্য কোন সূরা না মিলায়ে নামায আদায়কারীর নামায শুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ ওই নিয়ম শুধুমাত্র একা নামায আদায়কারীর জন্য। যদি ফরজ নামাযে বা রমযানে বিতির ও সালাতে তারাবিহ এর নামায জামাত সহকারে আদায়কারী কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতেহা ও অন্য কোন সূরা তেলাওয়াত করতে পারবে না।

যদি জামাতে নামায আদায়কারী ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মের বিপরীত করে ওই ব্যক্তিরই নামায বাতিল হবে। মনে রাখতে হবে উপরোক্ত নিয়ম শুধুমাত্র ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্য নয়, জামাতে আদায় করতে হয় বা জামাতে নামায আদায় করছে এমন প্রত্যেক নামাযের জন্য প্রযোজ্য।

একটি জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ:

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত সত্য যে. রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর (সহচর) সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানিল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনগণ ব্যতিরেকে তাঁদের পরের থেকে শুরু করে মহা প্রলয় দিবস পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর (তাকলিদে সখছি) অর্থাৎ মাজহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তার মানে চার মাযহাব (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকি, হাম্বলি) হতে যে কোন একটা মাযহাবের অনুশীলন ও অনুসরণ করতেই হবে। যে কোন দুইটা বা তিনটা অথবা চার মাযহাব হতে নিজ পছন্দের বিধানাবলি গ্রহণকারী সত্যিকার মুসলমান হতে পারে না। ইসলামী পরিভাষায় ওই রূপ গ্রহণকারীকে লা মাযহাবী বা আহলে হাদীস, আহলে কুরআন অথবা গাইরে মুকাল্লিদ বা সালাফী বলে। যেমন জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেব নিজে উপরোক্ত কোন একটি মাযহাবেরও অনুসারী নহেন বলে তার লিখিত "ইসলামী রেনেসা আন্দোলন" বইয়ে ঘোষণা দিয়েছেন।

অতএব, ইসলামী শরিয়ত কাদিয়ানীদের বেলায় যে হুকুম দিয়েছেন, তাই নির্দিষ্ট কোন না কোন এক মাযহাবের অনুসারী অনুশীলনকারী নয় এমন ব্যক্তির জন্যও একই হুকুম প্রযোজ্য।

ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তব জীবনে ইসলাম-ঈমানকে সঠিক ও পরিশুদ্ধ অনুশীলনের জন্য চার মাজহাব হতে যে কোন একটি মাজহাবকে অনুসরণ করা ওয়াজিব ও আবশ্যক। তার বিপরীতে কেউ যদি বলে আমি ক্বোরআনে হাকিমে যা নির্দেশ দিয়েছে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল-কর্ম ও হাদীসের মাধ্যমে যা বলেছেন তা পালন বা গ্রহণ করব। এই রূপ বলার বা আমল করার বা অনুশীলন অনুসরণ করার কোন বৈধতা ইসলামী শরীয়ত কাউকে দেয়নি। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের আলোকে মাজহাবের ইমামগণ উপরোক্ত চারটি হক মাজহাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অনুশীলন পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিয়েছেন সে মোতাবেকই আমাদের আমলি জীন্দেগী গড়তে হবে, বলতে, চলতে ও চালাতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে দ্রষ্টব্য।

তাসমীয়া:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলা।[৩৮৭]

মুনফারিদ, মুক্তাদী অর্থাৎ একাকী বা ইমামের পিছনে নামায আদায়কারী রুকু হতে উঠার সময় ও ইমাম রুকু হতে উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগে বা পর্যায়ে বলতে হবে।

৩৮৭. বুখারী- ৭২২।

তাহ্মীদ:

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ "রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদ" বলা।[৩৮৮]

মুনফারিদ ও মুক্তাদী সোজা হয়ে দাঁড়ায়ে বলবে। তবে ইমাম সাহেব বলবে না।

তাসবীহ:

রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ "সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম বলা।" [৩৮৯] আর সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 'সুবহানা রাব্বীয়াল আ'লা" বলা।[৩৯০]

উল্লেখ্য যে, ইমাম মুক্তাদি প্রত্যেককে নুন্যতম তিনবার বলতে হবে। আর হাদীসে বর্ণিত তাসবীহ ছাড়া অন্য কোন তাসবীহ রুকু সেজদায় পড়া হানাফী মাযহাব অনুযায়ী খেলাফে সুন্নাত হওয়ার কারণে মাকরূহ।[৩৯১]

তাশাহুদ:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ -

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু, ওয়াত্ ত্বাইয়িবাতু আস্-সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীনা, আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।[৩৯২]

প্রকাশ থাকে যে, দু'রাকাত বা তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে তাশাহ্হুদের বৈঠকে যথাক্রমে দু'রাকাতে, তিন, চার রাকাতের দু'সেজদা

৩৮৮. বুখারী- ৭৩২।
৩৮৯. মুসলিম- ৭৭২।
৩৯০. মুসলিম- ৭৭২, আবু দাউদ- ৮৭০।
৩৯১. বাদায়েউস সানায়ে।
৩৯২. তাফসীরে সামারকান্দী- ১/১৮৯, তাফসীরে কুরতুবী-১/৩৬৩, তাফসীরে রূহুল বায়ান- ৫/১২১, বুখারী-৮৩১, ১২০২, ৬২৩০, ৭৩৮১, মুসলিম-৪০২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদায়ের পর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দুরুদে ইব্রাহীমি পড়তে হবে। যা নিম্নরূপ-

দুরূদে ইব্রাহীমি:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা 'আলা সাইয়্যিদিনা ইবরাাহীমা ওয়া 'আলা আলে সাইয়্যিদিনা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলে সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আলা সাইয়্যিদিনা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলে সাইয়্যিদিনা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ । [৩৯৩] অতপরঃ

দোয়ায়ে মাসুরা:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরান ওয়া লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগ্ফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম" পড়বে।[৩৯৪]

উপরোক্ত দো'আ বা দোয়ায়ে মাসুরা হিসাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত যে কোন দো'আ পড়া যাবে। অতঃপর শেষ রোকন-

তাসলীম বা সালাম:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

[৩৯৩]. বুখারী- ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭, মুসলিম- ৪০৫, ৪০৬।

[৩৯৪]. বুখারী- ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৭, মুসলিম- ২৭০৫, তিরমিজী- ৩৫৩১, নাসায়ী- ১৩০২।

উচ্চারণ: 'আস্-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' বলা।

প্রকাশ থাকে যে, তাসবীহ, তাশাহুদ, দুরুদ, সালাত, দো'আয়ে মাসুরা ও সালাম, ইমাম-মুক্তাদী ও মোনফারেদ প্রত্যেককে পড়তে বা পাঠ করতে হবে।

বিশেষ নামাযের বিশেষভাবে পড়তে হয় দো'আ সমূহ ও পদ্ধতি

দো'আয়ে কুনুত:

যা বিতির নামাযের তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য কোন সূরা তেলাওয়াতের পর 'আল্লাহু আকবর' তকবির বলার পর হাত তুলে (তাকবিরে তাহরীমার মত) পুনরায় হাত বেঁধে পড়তে হয়, যা পড়া ওয়াজিব এবং ভুল বশতঃ না পড়লে সাহু সেজদা দিতে হবে। যা নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَ لاَ نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্ফিরুকা ওয়া নুয়্মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়ানুস্নী আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশ্কুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলায়ু ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফ্জুরুকা, আল্লাহুম্মা ই'য়াকা নাবু'বুদু ওয়া লাকা নুসালি ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস্'আ, ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজু রাহ্মাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল্ কুফ্ফারে মুলহিক। [৩৯৫]

তারাবীর নামাযের প্রতি দু'রাকাত শেষ করে দাঁড়ানোর সময় পড়বে:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الاِحْسَانِ اَحْسِنْ اِلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ —

উচ্চারণ: হাযা মিন্ ফাদলি রাব্বি ইয়া কারীমাল মারূফি ইয়া কাদীমাল ইহসানি আহসিন ইলাইনা বি এহসানিকাল কাদীমি ইয়া আরহামার রাহেমীন।

[৩৯৫]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৪৯৭০, ৭০২৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারাবীর নামাযে প্রত্যেক চার রাকাতের পর মুনাজাতের পূর্বে বসে এই দো'আ পড়বে:

سُبْحَانَ ذِيْ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِيْ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لاَيَنَامُ وَ لاَ يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـــــ

উচ্চারণ: সুবহানা যিল্ মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা যিল্ ইয্যাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরীয়ায়ি ওয়াল জাবারূত, সুবহানাল মালিকিল হাইয়িল লাযী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার্ রূহ।[৩৬৬]

তারাবীর নামাযের প্রত্যেক চার রাকাত পরপর উল্লেখিত দো'আর পর উপরে হাত উঠায়ে মুনাজাত করবে। ইমাম হলে উচ্চস্বরে নিম্নলিখিত 'দো'আ' মুনাজাতে পড়বে। মুক্তাদীরা 'আমিন' 'আমিন' বলবে, আর একাকী তারাবী নামায আদায়কারীও উল্লেখিত 'দো'আ' পড়ে পড়ে মুনাজাত ও করবে, আমিনও বলবে। প্রতি চার রাকাতের পর 'মুনাজাত' হিসাবে পড়তে পারা যায় দো'আ নিম্নরূপ-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُ ، اَللّٰهُمَّ أَجِرْنَا وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـــــ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্ আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযুবেকা মিনান্নারে 'এয়া খালেকাল জান্নাতা ওয়ান্নারে বেরাহ্মাতিকা এয়া আযীয্ এয়া গাফ্ফার এয়া কারীমু এয়া সাত্তার এয়া রাহীমু এয়া জব্বার এযা খালেকু এয়া বা-রু, আল্লাহুম্মা আজিরনা ওয়া খাল্লিস্না মিনান্নারে এয়া মুজীরুএয়া মুজীরু এয়া মুজীর বেরাহ্মাতিকা এয়া আরহামার রাহেমীন।

[৩৬৬]. তাফসীরে ত্বাবারী-৪র্থ খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা।

যাদের উপরোক্ত দো'আ মুখস্ত না থাকে তারা:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

উচ্চারণ: 'রাব্বানা যালামনা আন্ফুসানা ওয়া ইনলাম তাগফির লানা ওয়াতারা হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসেরীন', পড়লে হবে।[৩৬৭]

আশুরার দিন পড়ার দো'আ:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـــــ ১১১ দফে

سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضَاءِ وَ زِنَةَ الْعَرْشِ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبَّنَا التَّامَّاتِ كُلِّهَا اَسْأَلُكَ السَّلاَمَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ هُوَ حَسْبِيْ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ -

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়মাল ওয়াকিল। ১১১ বার।
সুবহানাল্লাহি মিল্য়াল মীযানি ওয়া মুনতাহাল ইলমি ওয়া মাব্লাগার রিদ্বায়ি ওয়া যিনাতাল আরশি লা' মালজা'আ ওয়া লা' মানজা'আ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি, সুবহানাল্লাহি আদাদাস্ শাফয়ি ওয়াল ওয়িত্রে, ওয়া আদাদা কালিমাতি রাব্বিনাত তা'ম্মাতি কুল্লিহা আস'আলুকাস সালামাতা বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, ওয়া হুয়া হাসবি ওয়া নি'য়্মাল ওয়াকীল নি'য়্মাল মাওলা ওয়া নি'য়্মান নাসীর, ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহ্বিহী ওয়া বা-রাকা ওয়া সাল্লামা। ৭ বার।

[৩৬৭]. সূরা আ'রাফ-২৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

বৎসরের প্রথম দিনে পড়ার দো'আ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَدِيْمُ الاَبَدِيُّ الاَوَّلُ وَ عَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ وَ جُوْدِكَ الْمُعَوَّلِ وَ هٰذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ اَقْبَلَ نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ اَوْلِيَائِهِ وَ جُنُوْدِهِ وَ الْعَوْنَ عَلَى هٰذِهِ النَّفْسِ الاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَ الاِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْكَ زُلْفَى يَاذَا الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লামা আল্লাহুম্মা আনতাল কাদীমুল আবাদিউল আওয়ালু ওয়া আলা ফাদলিকাল আযীমি ওয়া জুদিকাল মু'আওয়ালি ওয়া হাযা আমুন জাদিদুন ক্বাদ আক্ববালা নাস'আলুকাল ইস্‌মাতা ফী'হি মিনাশ শায়ত্বানি ওয়া আওলিয়ায়িহী ওয়া জুনুদিহী ওয়াল আওনা আলা হাযিহিন নাফসিল আম্মারাতি বিস-সুয়ি ওয়াল ইশতিগালি বিমা ইউকাররিবুনি ইলাইকা যুলফা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামে ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া বা-রাকা ওয়া সাল্লামা।

বৎসরের শেষ দিনে পড়ার দো'আ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ فَلَمْ اَتُبْ مِنْهُ وَ لَمْ تَرْضَهُ وَ نَسِيْتُهُ وَ لَمْ تَنْسَهِ وَ حَلِمْتَ عَلَيَّ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ وَ دَعَوْتَنِيْ التَّوْبَةَ بَعْدَ جُرْاَتِيْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَاِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لِيْ وَ مَا عَمِلْتُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَ وَعَدْتَنِيْ عَلَيْهِ

الثَّوَابَ فَاَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ يَا كَرِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الاِكْرَامِ اَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنِّيْ وَ لاَ تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা মা আমিলতু ফি হাযিহিস্‌-সানাতি মিম্মা নাহাইতানি আনহু ফালাম আতুব মিনহু ওয়া লাম তারদাহু ওয়া নাসিতুহু ওয়া লাম তানসাহু ওয়া হালিমতা আলাই'য়া বা'দা কুদরাতিকা আলা উকুবাতি ওয়া দা'য়াওতানিত তাওবাতা বা'দা জুরআতি আলা মা'সিয়াতিকা ফাইননি আসতাগফিরুকা ফাগ্‌ফির লি ওয়ামা আমিলতু ফিহা মিম্মা তারদাহু ওয়া ওয়াদতানি আলাইহিস সাওয়াবা ফা'আস'আলুকা আল্লাহুম্মা ইয়া কারীমু ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম আন তাতাকাব্বালাহু মিন্নি ওয়ালা তাকতা' রাজায়ী মিনকা ইয়া করীমু ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লামা।

শবে বরাতের রাত্রিতে পড়ার দো'আ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِلٰهِيْ جُوْدُكَ دَلَّنِيْ عَلَيْكَ وَ اِحْسَانُكَ قَرَّبَنِيْ اِلَيْكَ اَشْكُوْ اِلَيْكَ مَالاَ يَخْفَى عَلَيْكَ اَسْأَلُكَ مَا لاَ يَعْسُرُ عَلَيْكَ اِذْ عِلْمُكَ بِحَالِيْ يَكْفِيْ عَنْ سُؤَالِيْ يَا مُفَرِّجَ كُرَبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ فَرِّجْ عَنِّيْ مَا اَنَا فِيْهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَالِكَ نُنْجِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَ لاَ يُمَنُّ عَلَيْكَ ذَا الْجَلاَلِ وَ الاِكْرَامِ وَ ذَا الطَّوْلِ وَ الاِنْعَامِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ظَهْرُ اللاَّجِيْنَ وَ جَارُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَ مَاْمَنَ الْخَائِفِيْنَ وَ كَنْزُ الطَّالِبِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقْتَرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ - اَللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِيْ وَ حِرْمَانِيْ وَ طَرْدِيْ وَاِقْتَارَ رِزْقِيْ وَ اَثْبِتْنِيْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عِنْدَكَ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُوْ اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ أَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ التَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِيْ اللَّيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ اللَّتِيْ يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ وَ يُبْرَمُ أَنْ تَكْشِفَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَ مَا لَا نَعْلَمُ وَ أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ أَنْ تَكْشِفَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَ مَا لَا نَعْلَمُ وَ أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمْ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইলাহী জু'দুকা দাল্লানি আলাইকা ওয়া ইহসানুকা কাররাবানি ইলাইকা আশকু ইলাইকা মা লা ইয়াখফা আলাইকা আস'আলুকা মা লা ইয়া'ছুরু আলাইকা ইয 'ইলমুকা বিহালি ইয়াকফি আন সুয়া'লি ইয়া মুফাররিযা কুরাবিল মাকরুবিনা ফাররিজ আন্নি মা আনা ফীহি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায্ যোয়ালেমিন, ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মু'মিনীন।

আল্লাহুম্মা এয়া জাল মান্নি ওয়ালা ইয়ূমান্নু আলাইহি যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ওয়া যাত্তাওলি ওয়াল ইন'আম, লাইলাহা ইল্লা আন্তা জাহরুল লা'জীন ওয়া জা'রুল মুসতাজিরীন ওয়া মা'মানাল খায়িফীন ওয়া কান্যাত তালিবীন। আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা কাতাবতানি 'ইনদাকা ফি উম্মিল কিতাবে শাকিয়ান আও মাহরূ'মান আও মাতরুদান আও মুকতারান আলাই'য়া ফির-রিয্কি ফামহু, আল্লাহুম্মা বিফাদলিকা শিকাওয়াতি ওয়া হিরমা'নি ওয়া ত্বারদি ওয়া ইক্তা-রা রিযকি ওয়া আসবিত্নি ইনদাকা ফি উম্মিল কিতাবি সাঈদান মারযুকান মুয়াফ্ফিকান লিল খাইরাত ফা ইন্নাকা কুলতা ওয়া কাওলুকাল হাক্ব ফি কিতাবিকাল মুনাজ্জালি আলা লিছানি নবীয়্যিকাল মুরসালি ইয়ামহুল্লাহু মা-ইয়াশা'য়ু ওয়া ইউসবিতু ওয়া ইনদাহু উম্মুল কিতাব, আস'আলুকা আল্লাহুম্মা বিহাক্কিত তাজাল্লিয়িল আ'যামে ফিল লাইলাতিন নিসফি মিন শাহরি শা'বা'নাল মুকাররামি আল্লাতি ইউফ্‌রাকু ফীহা কুল্লু আমরিন হাকীমিন ওয়া ইউব্‌রামু আন তাকশিফা মিনাল বালায়ি মা না'লামু ওয়া মা-লা না'লামু ওয়া আন্তা বিহি

আ'লামু ইন্নাকা আন্তাল আয়াযুল আকরামু ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা সাইয়্যাদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহি ওয়াসাল্লামা।

খতমে কুরআনের দোয়া ঃ

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْآنِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ ، اَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ، وَ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

وَ عَافِنَا يَا كَرِيْمُ وَ اعْفُ عَنَّا يَا رَحِيْمُ . اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَ كَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا مَفْتُوْنِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ تَلَوْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ حَلَاوَةً ، وَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ كَرَامَةً ، وَ بِكُلِّ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِيْمَانًا، وَ بِكُلِّ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ سُرُوْراً يَقِيْنًا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، وَ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ جَزَاءاً ، وَ بِكُلِّ وَقْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ وِقَايَةً .

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْأَلِفِ أَمَنًا وَ أُلْفَةً ، وَ بِالْبَاءِ بَرَكَةً ، وَ بِالتَّاءِ تَوْبَةً ، وَ بِالثَّاءِ ثَوَابًا ، وَ بِالْجِيْمِ جَمَالًا ، وَ بِالْحَاءِ حِكْمَةً ، وَ بِالْخَاءِ خَيْرًا ، وَ بِالدَّالِ دَلِيْلًا ، وَ بِالذَّالِ ذَكَاءً ، وَ بِالرَّاءِ رَحْمَةً ، وَ بِالزَّاءِ زَكَاةً ، وَ بِالسِّيْنِ سَعَادَةً ، وَ بِالشِّيْنِ شِفَاءً ، وَ بِالصَّادِ صِدْقًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

، وَ بِالضَّادِ ضِيَاءً ، وَ بِالطَّاءِ طَرَاوَةً ، وَ بِالظَّاءِ ظُفْرًا ، وَ بِالْعَيْنِ عِلْمًا ، وَ بِالْغَيْنِ غِنًى ، وَ بِالْفَاءِ فَلَاحًا ، وَ بِالْقَافِ قُرْبَةً ، وَ بِالْكَافِ كَرَامَةً ، وَ بِاللَّامِ لُطْفًا ، وَ بِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً ، وَ بِالنُّوْنِ نُوْرًا ، وَ بِالْهَاءِ هِدَايَةً ، وَ بِالْوَاوِ وُسْعَةً ، وَ بِاللَّامْ أَلِفْ لَآلِيْء أَنْوَارِكَ, وَ بِالْيَاءِ يُسْرًا ،

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ ، وَ ارْفَعْنَا بِالْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ، وَ تَقَبَّلْ مِنَّا قِرَاءَتَنَا ، وَ تَجَاوَزْ مَا كَانَ فِيْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، أَوْ تَحْرِيْفِ كَلِمَةٍ عَنْ مَوْضَعِهَا ، أَوْ تَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ ، أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، أَوْ تَأْوِيْلٍ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ رَيْبٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ سَهْوٍ أَوْ سُوْءِ إِلْحَانٍ ، أَوْ تَعْجِيْلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ، أَوْ كَسْلٍ أَوْ سُرْعَةٍ أَوْ زَيْغِ لِسَانٍ ، أَوْ وَقْفٍ بِغَيْرِ وُقُوْفٍ ، أَوْ إِدْغَامٍ بِغَيْرِ مُدْغَمٍ ، أَوْ إِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ ، أَوْ مَدٍّ أَوْ تَشْدِيْدٍ أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ جَزْمٍ أَوْ إِعْرَابٍ بِغَيْرِ مَا كُتِبَ ، أَوْ قِلَّةِ رَغْبَةٍ وَ رَهْبَةٍ عِنْدَ آيَاتِ الرَّحْمَةِ وَ آيَاتِ الْعَذَابِ ، فَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِالْقُرْآنِ ، وَ زَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ ، وَ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ ، وَ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا ، وَفِي الْقَبْرِ مُؤْنِسًا ، وَ عَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا ، وَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا ، وَ مِنَ النَّارِ سِتْرًا وَ حِجَابًا ، وَ فِي الْعَرَصَاتِ شَفِيْعًا ، وَ إِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيْلًا ،

اَللّٰهُمَّ إِنَّا عَبِيْدُكَ بَنُوْ عَبِيْدِكَ بَنُوْ إِمَائِكَ ، نَوَاصِيْنَا بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيْنَا حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيْنَا قَضَاؤُكَ ، نَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِكُلِّ إِسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ

عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا ، وَ نُوْرَ صُدُوْرِنَا ، وَ جَلَاءَ أَحْزَانِنَا ، وَ ذِهَابَ هُمُوْمِنَا وَ غُمُوْمِنَا ، وَ قَائِدَنَا وَ رَائِدَنَا إِلَيْكَ وَ إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ،

أَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا نَسِيْنَا ، وَ عَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ، وَ ارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ يَرْضِيْكَ عَنَّا ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتْلُوْهُ فَيَرْقَيْ ، وَ لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتْلُوْهُ فَيَشْقَىْ ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ الَّذِيْنَ هُمْ خَاصَّتُكَ وَ أَهْلُكَ ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنَا بِالْقُرْآنِ لِمِنْ جَمِيْعِ الْأَدْوَاءِ وَ أَصْرِفْ بِهِ عَنَّا كُلَّ بَلَاءٍ ، وَ أَصْلِحْ لَنَا بِهِ السِّرَّ وَ النَّجْوَىْ ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِهِ الشَّرَفَ الْمُؤَبَّدَ ، وَ أَلْحِقْنَا بِكُلِّ بَرٍّ سَعِيْدٍ ، وَ اسْتَخْدِمْنَا يَا مَوْلَانَا بِهِ فِي الْعَمَلِ الرَّشِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِوَالِدِيْنَا وَ وَالِدَيْ وَالِدِيْنَا وَ جَمِيْعِ مَوْتَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَ لِنَبِيِّكَ بِالرِّسَالَةِ وَ مَاتُوْا عَلَى ذَلِكَ .

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَ ارْحَمْهُمْ ، وَ عَافِهِمْ وَ اعْفُ عَنْهُمْ ، وَ أَكْرِمْ نُزُلَهُمْ ، وَ أَوْسِعْ مُدْخَلَهُمْ ، وَ اغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرْدِ ، وَ نَقِّهِمْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّىْ الثَّوْبَ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ ، وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارُوْا إِلَيْهِ ، حَتَّى تَجْمَعَنَا وَ إِيَّاهُمْ وَ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا فِيْ دَارِ كَرَامَتِكَ مُسْتَقَرَّ رَحْمَتِكَ ، وَ مَحَلَّ أَوْلِيَائِكَ ، مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا ، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَ كَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا .

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْعَالَمِيْنَ

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

দোয়ায়ে খাতমে কুরআন ঃ

উচ্চারণ ঃ আল-হামদু লিল্লাহি রাববিল আলামীন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস- সালামু আলা রাসূলিহিল আমীন, আল-মাব'উছু রাহমাতান লিল আলামীন, সাদাক্বাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম, ওয়া সাদাক্বা রাসূলুহুন নাবীয়্যুল কারীম, ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ-শাহিদীনা ওয়াশ-শাকিরীন।

রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস-সামীউল আলীম, ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত-তাওয়াবুর রাহীম, ওয়া আ-ফিনা ইয়া কারীমু ওয়া'ফু আন্না ইয়া রাহীম, আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়িনহু ফী কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল-ফুসূক্বা ওয়াল ইস্ইয়ান, ওয়াজ'আলনা মিনার রাশিদীন।

আল্লাহুম্মা আহ্য়িনা মুসলিমীনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মুস্লিমীনা ওয়াহ্ক্বনা ফী যুম্রাতিল মুস্লিমীন, গাইরা খাযাইয়া ওয়া লা মাফতূনীন, আল্লাহুম্মার যুক্বনা বিকুল্লি হার্ফিন মিনাল কুরআনি হালাওয়াতান ওয়া বিকুল্লি কালিমাতিন মিনাল কুরআনি কারামাতান ওয়া বিকুল্লি আয়াতিন মিনাল কুরআনি ঈমানান ওয়া বিকুল্লি সূরাতিন মিনাল কুরআনি সুক্করান ইয়াক্বীনান মিন খিযয়িদ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ, ওয়া বিকুল্লি জুযয়িন মিনাল কুরআনি জাযা-আন ওয়া বিকুল্লি ওয়াকফিন মিনাল কুরআনি বিক্বায়াহ।

আল্লাহুম্মার যুক্বনা বিল আলিফি আমানান ওয়া উলফাতান, ওয়া বিল বা-য়ি বারাকাতান, ওয়া বিত্-তা-য়ি তাওবাতান ওয়া বিছ-ছা-য়ি ছাওয়াবান, ওয়া বিল জীমি জামালান, ওয়া বিল হা-য়ি হিকমাতান, ওয়া বিল খা-য়ি খাইরান, ওয়া বিদ-দালি দালীলান, ওয়া বিয-যালি যাকা-আন, ওয়া বির রা-য়ি রাহমাতান, ওয়া বিয যা-য়ি যাকাতান, ওয়া বিস সীনি সাআদাতান, ওয়া বিশ-শীনি শিফাআন, ওয়া বিচ-ছাদি ছিদক্বান ওয়া বিদ-দ্বাদি দ্বিয়াআন, ওয়া বিত-ত্বায়ি ত্বারাওয়াতান, ওয়া বিয-যায়ি যুফরান, ওয়া বিল আইনি ইলমান, ওয়া বিল-গাইনি গিনান, ওয়া বিল-ফায়ি ফালাহান, ওয়া বিল-ক্বাফি কারামাতান, ওয়া বিল-লামি লুত্ফান, ওয়া বিল-মীমি মাওয়িযাতান, ওয়া বিন-নূনি নূরান, ওয়া

বিল-হায়ি হিদায়াতান, ওয়া বিল-ওয়াবি ওসআতান, ওয়া বিল লাম আলিফ লাআলিয়া আনওয়ারিকা, ওয়া বিল ইয়া-য়ি ইউসরান।

আল্লাহুম্মান ফা'না বিল কুরআনিল আযীমি ওয়ার ফা'না বিল-আয়াতি ওয়ায-যিকরিল হাকীমি, ওয়া তাকাব্বাল মিন্না কিরাআতানা ওয়া কাজাওয়ায মা কা-না ফী তিলাওয়াতিল কুরআনি মিন খাতায়িন আও নিসইয়ান, আও তাহরীফি কালিমাতিন আন মাওদ্বায়িহা আও তাকৃদীমিন আও তা'খীর, আও যিয়াদাতিন আও নুকসানিন আও তা'বীলিন আলা গাইরি মা আনযালতাহু আলাইহি, আও রাইবিন আও শাককিন আও সাহবিন আও সূয়ি ইলহান, আও তা'জীলিন ইনদা তিলাওয়াতিল কুরআনি আও কাসলিন আও সুরআতিন আও যাইগি লিসান, আও ওয়াকৃফিন বিগাইরি ওকূফিন আও ইদগামিন বিগাইরি মুদগামিন আও ইযহারিন বিগাইর বায়ানিন আও মাদদিন আও তাশদীদিন আও হামযাতিন আও জাযমিন আও ই'বাবিন বিগাইরি মা কুতিবা, আও কিল্লাতি রাগবাতিন ওয়া রাহাবাতিন ইনদা আ-য়াতির রাহমাতি ওয়া আ-য়াতিল আযাব, ফাগফির লানা ওয়াকতুবনা মা'আশ শাহিদীন।

আল্লাহুম্মা নাওবির কুলুবানা বিল-কুরআনি ওয়া যাইয়িন আখলাকানা বিল-কুরআনি ওয়া নাজ্জিনা মিনান না-রি বিল-কুরআনি ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা বিল-কুরআন, আল্লাহুম্মাজ আলিল কুরআনা লানা ফিদ দুনইয়া ক্বারীনান ওয়া ফিল ক্বাবারি মু'নিসান ওয়া আলাস-সিরাত্বি নূরান ওয়া ফিল জান্নাতি রাফীকান ওয়া মিনান না-রি সিতরান ওয়া হিজাবান ওয়া ফিল আরাসাতি শফীআন ওয়া ইলাল খাইরাতি কুল্লিহা দালীলা।

আল্লাহুম্মা ইন্না আবীদুকা বানূ আবীদিকা বানূ ইমায়িকা নাওয়াসীনা বিইয়াদিকা মাদ্দিন ফীনা হুকমুকা আদলু ফীনা ক্বাদাউকা নাসআলুকা আল্লাহুম্মা বিকুল্লি ইসমিন হুয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আনযালতাহু ফী কিতাবিকা আও আল্লামতাহু আহাদান মিন খালক্বিকা আবি-সতা'ছারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইনদাকা আন তাজআলাল কুরআনাল আযীমা রাবীআ কুলূবিনা ওয়া নূরা সুদূরিনা ওয়া জালাআ আহ্যানিনা ওয়া যিহাবা হুমূমিনা ওয়া গুমূমিনা ওয়া ক্বায়িদানা ওয়া রায়িদানা ইলাইকা ওয়া ইলা জান্না-তিকা জান্নাতিন নাঈম।

আল্লাহুম্মা যাক্কিরনা মিনাল কুরআনি মা নাসীনা ওয়া আল্লিমনা মিনহু মা জাহিলনা ওয়ারযুক্বনা তিলাওয়াতাহু আনাআল লাইলি ওয়া আত্বরাফান নাহারি আলাল ওয়াজহিল লাযী ইয়ারদ্বীকা আন্না, আল্লাহুম্মাজ আলনা মিম্মান ইয়াতলূহু ফাইয়ারকা ওয়া লা কাজআলনা মিম্মান ইয়াতলূহু ফাইয়াশকা ওয়াজ'আলনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিন আহলিল কুরআনিল লাযীনা হুম খাস্সাতুকা ওয়া আহলুকা, আল্লাহুম্মাশ্ফিনা বিল কুরআনি মিন জামীয়িল আদওয়ায়ি ওয়া আসরিফ আন্না কুল্লা বালাইন ওয়া আসলিহ লানা বিহিস সিররা ওয়ান নাজওয়া, আল্লাহুম্মার যুকনা বিহিশ শারফাল মুআব্বাদা ওয়া আলহিক্না বিকুল্লি বাররিন সাঈদীন ওয়াসতাখদিমনা ইয়া মাওলানা তিহী ফিল আমালির রাশীদ, আল্লাহুম্মাগফির লিওয়ালিদাইনা ওয়া ওয়ালিদাই ওয়ালিদাইনা ওয়া জামীয়ি মাওতাল মুসলিমীনাল লাযীনা শাহিদূ লাকা বিল-ওয়াহদানিয়্যাতি ওয়া লিনাবিয়্যিকা বির-রিসালাতি ওয়া মাতূ আলা যা-লিকা।

আল্লাহুম্মাগফির লাহুম ওয়ার-হামহুম ওয়া আ-ফিহিম ওয়া'ফু আনহুম ওয়া আকরিম নুযুলাহুম ওয়া আওসি' মুদখালাহুম ওয়াগসিলহুম বিল-মা-য়ি ওয়াস সালজি-ওয়াল বারদি ওয়া নক্কিহিম মিনায যুনূবি ওয়াল খাত্বায়া কামা ইয়ুনাক্কিস সাওবাল আবইয়াত্বা মিনাদ দানাসি ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা ইযা সিরনা ইলা মা- সা-রূ ইলাইহি হাত্তা কাজমাআনা ওয়া ইয়্যাহুম ওয়াল মুসলিমীনা জমীআন ফী দা-রি কারা-মাতিকা মুসতাকাররি রাহমাতিকা ওয়া মাহাল্লি আওলিয়ায়িকা মাআল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম মিনান নাবিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দীক্বীনা ওয়াশ শুহাদায়ি ওয়াস সালিহীনা ওয়া হাসুনা উলা-য়িকা রাফীক্বান যা-লিকাল ফাদ্বলু মিনাল্লাহি ওয়া কাফা বিল্লাহি আলীমা।

সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াসিফূন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীসা ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি ওয়া সাল্লামা তাসলীমান কাসীরা।

(তৃতীয় অধ্যায়)

বিবাহ প্রসঙ্গ

ইসলামী শরীয়তে বিবাহের গুরুত্ব ঃ

বিবাহ হচ্ছে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে বেচে থাকার জন্য এক মহান নেয়ামত এবং মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর অন্যতম। জীবনের অন্যান্য দিকের মত বিবাহের ক্ষেত্রেও ইসলাম মানুষকে এর খুঁটিনাটি দিকনির্দেশনা দিয়েছে। দুজন মানব-মানবী কিভাবে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সুখের সংসার গড়বে তার সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষা রয়েছে ইসলামে।

আমরা মানব সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, একদিকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বৈরাগ্য জীবন যাপন করি। আবার অন্যদিকে সেই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য অবাধ ও লাগামহীন উন্মাদনায় মেতে উঠি। বিপরীতমুখী এই দুই চরম নৈরাশ্য ও ভোগ-বিলাসী জীবনের পরিবর্তে ইসলাম মানুষকে দিয়েছে পারিবারিক নিরাপত্তার বেষ্টনী। সেই সুদৃঢ় বেষ্টনীতে থেকে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সহ প্রত্যেকের সকল প্রয়োজন পূরণে বিবাহ অনন্য এক ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আজ মুসলিম সংসারগুলোতে বিরাজ করছে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা।

ইসলামের শাশ্বত বিধি-বিধানের সাথে পরিচয়হীনতার ফলে আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ সহ পশ্চিমা দুনিয়া আজ চরম হতাশায় নিমগ্ন। ফলে বেড়ে গেছে আত্মহত্যার প্রবণতা, ধর্ষণের উন্মত্ততা এবং সর্বোপরি ভেঙ্গে পড়েছে পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক শৃঙ্খলা। বেপরোয়া, লাগামহীন ও অবাধ মেলামেশার বৈধতা থাকায় কলুষিত হয়ে পড়েছে পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন। পরিচ্ছন্ন মানুষের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে ভেজাল মানুষের আধিক্য। ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরছ করে গড়ে তুলতে হয়েছে 'চাইল্ডহোম' ও 'ওল্ডহোম'। নাউযু বিল্লাহ।

ইসলামের বৈবাহিক বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলে সুখের সংসার গড়তে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি বিবাহের মত একটি জাগতিক বিষয়কে পরিণত করবে মহান ইবাদতে। আর এতে করে শুধু ব্যক্তি মুসলিমই নয়, উপকৃত হবে পুরো সমাজ ও রাষ্ট্র।

বিবাহের তাৎপর্য ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামী শরীয়তে বিবাহ শুধু বৈধই নয় বরং প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিবাহ করাটা নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) সুন্নাত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (سورة الرعد:৩৮)

অর্থাৎ- আর অবশ্যই আপনার পূর্বে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি" । [৩৯৮]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

অর্থাৎ-"তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদের বিবাহ কর। যথাযথভাবে তাদের মোহর প্রদান কর, যেন তারা বিবাহের দূর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌনচর্চা ও গোপন বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে না পড়ে" [৩৯৯]।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিয়ে করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থাৎ- "আমি বিবাহ করি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নাত) অতএব, যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার উম্মত নয় [৪০০]। আর এ জন্যই ইমামে আযম আবু হানিফা (র.) সহ উলামায়ে হক্কানী রব্বানীগণ বলেছেন. সাগ্রহে বিবাহ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ বিবাহের মাধ্যমে অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়। মানুষের বংশীয় পরিশুদ্ধতা ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন: যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম থেকে বাঁচতে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

[৩৯৭]. সূরা আর-রাআদ-৩৮।
[৩৯৯]. সূরা আন-নিসা-২৫।
[৪০০]. সহীহ বুখারী-৫০৫৬, সহীহ মুসলিম-৩৪৬৯।

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

অর্থাৎ- "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ রাখে তারা যেন বিবাহ করে। কেননা তা' চক্ষুকে অবনত করে আর লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে এর সামর্থ রাখেনা তার কর্তব্য হচ্ছে রোযা রাখা। সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় বা প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে"। [৪০১]

বিবাহের খোতবা ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُخْبِرًا وَ آمِرًا: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (المعجم الأوسط للطبراني:8794) و قال عليه أفضل الصلوات و التسليم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»

আল-হামদু লিল্লাহি নাহমাদুহু, ওয়া নাসতাঈনু বিহী ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যিয়াতি আ'মালিনা মান ইয়াহ্‌দিল্লাহু ফালা মুদ্বিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলি ফালা হা-দিয়া লাহু, ওয়া

[৪০১]. সহীহ বুখারী -৫০৬৬, সহীহ মুসলিম-৩৪৬৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, ক্বালাল্লাহু তা'আলা: "ইয়া আইয়্যুহান নাসুত্ তাকূ রব্বাকুমুল্লাযি খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাতিন ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাচ্ছা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআন, ওয়াত তাকুল্লাহাল লাযী তাসা-আলূনা বিহি ওয়াল আরহামা ইন্নাল্লাহা কা-না আলাইকুম রাক্বীবা (সূরা আন-নিসা-১), ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত তাকুল্লাহা হাক্কা তুক্বা-তিহি ওয়া লা তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমূন (সূরা আলু ইমরান-১০২), ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত-তাকুল্লাহা ওয়া কূলূ কাওলান সাদীদা ইউস্লিহ্ লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনূবাকুম ওয়া মান ইউতিয়িল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাক্বাদ ফা-যা ফাওযান আযীমা (সূরা আল-আহযাব-৭১,৭২)।

বিবাহে অভিভাবকের গুরুত্ব ঃ

বিবাহ হচ্ছে মানবজীবনের একটি অনন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা ও ভুলের কারণে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই ধ্বংস হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে অভিভাবকের মতামত ও পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু অনভিজ্ঞ ছেলে মেয়ের কল্যাণ অকল্যাণ অভিভাবকরাই অধিক জানেন এবং বুঝেন। অভিভাবকের পছন্দ ও সন্তুষ্টি ছাড়া আবেগতাড়িত হয়ে ঘটে যাওয়া বিবাহের স্থায়িত্ব ও সুফল একেবারেই ক্ষীণ। সাংসারিক অশান্তি, পারিবারিক বিশৃংখলা ও সামাজিক অনাচারের পেছনে অভিভাবকের সন্তুষ্টি ও মতামত ছাড়া প্রেম ঘটিত বিয়ে বা কোর্ট ম্যারেজ অন্যতম দায়ী। এই অশান্তি, বিশৃংখলা ও অনাচার থেকে রক্ষা করতেই হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হবেনা" [৪০২]

বিবাহ পূর্ব করণীয় ঃ

কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পালন করা একান্ত জরূরী ঃ

১. ইস্তিখারা করা ঃ

মুসলিম নারী-পুরুষের জীবনে বিবাহ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই তারা যখন বিবাহের সিদ্ধান্ত নিবেন তাদের কর্তব্য হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর

[৪০২]. জামে' তিরমিযী-১১০১, সুনানে আবু দাউদ-২০৮৫, সুনানে ইবনে মাজা-১৮৮০, মুসনাদে আহমদ-২২৬০, ।

কাছে কল্যাণ কামনা করা। হযরত জাবির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কুরআনের সূরা যেমনিভাবে শিক্ষা দিতেন অনুরূপবাবে আমাদেও যাবতীয় কাজে ইস্তিখারা করার শিক্ষা দিতেন। তিনি ইরশাদ করতেন, যখন তোমাদের কেউ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে চায় সে যেন দু'রাকাআত নফল নামায পড়ে অতপর বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي .

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা আপনিই মহা শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন আর আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে সামর্থ দিন। পক্ষান্তরে এই কাজটি যদি আপনার জ্ঞান মোতাবেক আমার দ্বীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর হয় তবে তা' আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা' থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমার কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা' নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন।[৪০৩]

২. পরামর্শ করা ঃ

কেউ বিবাহ করতে চাইলে আরেকটি করণীয় হলো বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে ভালো জানাশুনা আছে এমন

[৪০৩]. সহীহ বুখারী-১১৬৬, সুনানে আবু দাউদ-১৫৪০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তির সঙ্গে পরামশ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের সাথে সব সময় পরামর্শ করতেন। হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে অন্র কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখিনি"। [৪০৪]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, " মানুষের মধ্যে তিন ধরণের ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি একেবারে ব্যক্তিত্বহীনন। পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন। অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেই যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন না। আর ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি সেই যে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আবার কারো সাথে পরামর্শও করেন না [৪০৫]।

এদিকে পরামর্শদাতার কর্তব্য হল বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি তার জানা কোন দোষ লুকাবেন না, তেমনি অসদুদ্দেশ্যে নিজের থেকে বানিয়ে কোন দোষও বলবেন না। আর এই পরামর্শের বিষয়টিও কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।

৩. পাত্রী নির্বাচনঃ

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন এবং আত্মীয়তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মাপকাঠি কী হবে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টিও পরিস্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, আত্মীয়তা স্থাপনের ক্ষেত্রে তোমরা দ্বীনি এবং আখলাকি বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেবে। ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কাছে আত্মীয়তার প্রস্তাব আসে আর তাদের চারিত্রিক এবং ধর্মীয় বিষয়টি সন্তোষজনক হয় তাহলে সে প্রস্তাব গ্রহণ করবে। যদি তা না কর তাহলে ফেতনার সৃষ্টি হবে।[৪০৬]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, চার কারণে কোনো মেয়েকে বিয়ে করা হয় থাকে। আঙ্গতা হলো সম্পদ, বংশ, রূপ ও দীনদারী। তন্মধ্যে দীনদারকে

[৪০৪]. জামে' তিরমিযী-১৭১৪. সুনানে বাইহাকী-১৯২৮০।
[৪০৫]. আল-মুসতাতরিফ ফী কুল্লি মুসতাযরিফ-১/১৬৬।
[৪০৬]. জামে' তিরমিযী-১০৮৩. মুস্তাদরাকে হাকেম-২৬৯৫. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক-১০৩২৫. শরহুস সুন্নাহ-২২৪০।

বিয়ে করে দাম্পত্য জীবনকে সফল করে তোল। সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর রূপ-সৌন্দর্য এবং স্বভাব মোতাবিক অন্য কোনো গুণকেও পাত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে- "যে নারীকে তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে কর।"[৪০৭]

তবে ভালো হয়, ছেলে এবং মেয়ের দীনদারী ও চারিত্রিক বিষয়টাকেই মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করলে। আল্লামা কাসানী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন- আমাদের দৃষ্টিতে শুধু দীনদারীকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করাটাই উত্তম।

৪. বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ :

কেউ কোন নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হলে তার উচিত হল ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে পেতে চেষ্টা করা। আর এ জন্য বিশ্বস্ত ও সৎ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মেয়ের অভিভাবকের নিকট প্রস্তাব পাঠাবে।

৫. পাত্রী দেখা ঃ

বিবাহ করতে আগ্রহী ব্যক্তির উচিত হল নিজে অথবা বিশ্বস্ত কোন মহিলা আত্মীয়ের মাধ্যমে পাত্রীকে দেখা। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে প্রস্তাব দেয়, অতঃপরতার পক্ষে যদি ঐ নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয় যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে, সে যেন তা দেখে নেয়"। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এর পর আমি সালামাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিই। আমি খেজুর গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন রেখে সেই মেয়েটির সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছি যা আমাকে মুগ্ধ করেছে, অতঃপর আমি সেই মেয়েটিকে বিবাহ করি"।[৪০৮]

অপর এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জানাল যে, সে একজন আনসারী মেয়েকে বিবাহ করেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাকে দেখেছ?" সে বলল, না। তিনি বললেন,

[৪০৭]. সূরা আন-নিসা-৩।
[৪০৮]. সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-১৩৮৬৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেকে নাও। কারণ আনসারীদের চোখে কিছু একটা (সমস্যা) রয়েছে ।[৪০৯]

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তাকে দেখে নেয়া উত্তম।

❑ ছবি বা ফটো বিনিময় ঃ

উল্লেখ্য যে, নারী পুরুষ কারো জন্য কোনভাবে ছবি বা ফটো বিনিময় বৈধ নয়। কারণ, প্রতমত এ ছবি অন্যরাও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা' দেখা অবৈধ। দ্বিতীয়ত ছবি কখনো পূর্ণ সত্য তুলে দরতে পারে না। প্রায়শই এমন দেখা যায়, কাউকে ছবিতে দেখার পর বাস্তবে দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে ভিন্ন কেউ। তৃতীয়ত কখনো এমন হতে পারে যে, প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়া হয় বা প্রত্যাখ্যাত হয় অথচ ছবি সেখানে রয়ে যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে তাই করতে পারে।

টেলিফোন/ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের বিধান ঃ

উল্লেখ্য যে, বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দুই জন আযাদ (দাস নয়), বিবেকবান (পাগল নয়) মুসলমান সাক্ষীর উপস্থিতিতে একই মজলিস বা আসরে পাত্র/পাত্রী প্রস্তাব দিবে আর অপরপক্ষে পাত্র/পাত্রী তা কবুল করবে। আর স্বাক্ষীগণ উপস্থিত থেকে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনবে। আর শরীয়তের এই শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয় বিধায় টেলিফোন, মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ শুদ্ধ হবেনা।

যেহেতু বিবাহের ক্ষেত্রে মজলিস তথা আসর ও সাক্ষীর বিষয় জড়িত। সশরীরে উপস্থিত না হয়ে টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য দিলে পৃথিবীর কোন আদালত বা বিচারালয় সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করবে?

দুররে মুখতারে বলা হয়েছে,

وَ شُرِطَ حُضُورُ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا – وَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزِ الْمَنْكُوحَةِ عِنْدَ الشَّاهِدَيْنِ لِتَنْتَفِيَ الْجَهَالَةُ فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً مُتَنَقِّبَةً كَفَى الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا وَالِاحْتِيَاطُ كَشْفُ وَجْهِهَا فَإِنْ لَمْ يَرَوْا شَخْصَهَا

[৪০৯]. সহীহ মুসলিম-৩৫৫০।

وَسَمِعُوا كَلَامَهَا مِنَ الْبَيْتِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْبَيْتِ وَحْدَهَا جَازَ النِّكَاحُ لِزَوَالِ الْجَهَالَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ زَوَالِهَا

অর্থাৎ- "বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্ত হল শরীয়তের মুকাল্লাফ (যাদের উপর শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়) এমন দুইজন আযাদ পুরুষ সাক্ষী বা একজন আযাদ পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী হতে হবে, যারা 'ঈজাব' ও 'কবুল' বলার উভয় বক্তব্য স্বকর্ণে উপস্থিত থেকে শুনতে পায়। আর সাক্ষীগণ কর্তৃক কনেকে আলাদাভাবে পার্থক্য করতে পারা আবশ্যক, যেন কনে সম্পর্কে অজ্ঞতা না থাকে। আর যদি কণে নিকাব পরা অবস্থায় উপস্থিত থাকে, আর অভিভাবক ইশারা করে দেখিয়ে দেয়, তাহলে যথেষ্ট হবে, তবে চেহেরা অবমুক্ত রাখা উত্তম। আর যদি সাক্ষীগণ কনেকে দেখতে না পায়, ঘরের ভিতর থেকে শুধু কণ্ঠস্বর শুনে, তখন ঘরের মধ্যে যদি কনে একা থাকে তাহলে বিবাহ বৈধ হবে। আর যদি কনের সাথে অন্য মহিলা থাকে, তাহলে বিবাহ বৈধ হবেনা"।[৪১০]

প্রকাশ থাকে যে, আকদ মজলিসে যদি বর বা কনের কোন একজন সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারে সেক্ষেত্রে টেলিফোন, মোবাইল ইন্টারনেটের যান্ত্রিক বিবাহ না করে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শরয়ী পদ্ধতি হল, কোন এক পক্ষ অপর পক্ষ যেখানে থাকে সেখানকার কোন ব্যক্তিকে ওকীল বানাবে। তারপর সে ওকীল দুইজন সাক্ষীর সামনে তার পক্ষে ঈজাব/কবুল করিয়ে নিবে। যেমনঃ যদি সে বরের উকিল হয় তাহলে বলবে, আমি এত এত মোহরানায় অমুকের কন্যা অমুককে অমুকের নিকাহে কবুল করলাম। আর কনের উকিল হলে বলবে, আমি এত এত মোহরানায় অমুকের ছেলে অমুককে অমুকের কন্যা অমুকের পক্ষে প্রস্তাব দিলাম। তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে,

يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ الشُّهُودُ

অর্থাৎ- **"নিকাহর জন্য উকিল নিযুক্ত শুদ্ধ হবে, যদি আকদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারে।**[৪১১]

❑ বিবাহ পূর্ব নির্জনে অবস্থান বা বাইরে বের হওয়া ঃ

[৪১০]. দুররে মুখতার-২/২১, আলমগীরী-১/২৬৮, আল-মুহীত-৩/২৯, বাহরে রায়েক-৩/৯৫।
[৪১১]. আলমগীরী-১/২৯৪.

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিবাহের পূর্বে প্রস্তাব দেয়া দেয়া নারীর সঙ্গে নির্জনে অবস্থান বা তার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। কারণ একনো সে বেগানা নারীই রয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রস্তাব প্রদানকারী পুরুষের সাথে বাইরে ঘুরতে যায়। উপরন্তু সফরও করে! ভাবখানা এমন যে, মেয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে গেছে। ফলে নিজেও নির্লজ্জ দৈয়ূছের খাতায় নাম লিখাচ্ছেন আর মুসলিম সমাজকেও কলুষিত করছেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন।

❑ একজনের প্রস্তাবের উপর অন্যজনের প্রস্তাব দেয়া নিষিদ্ধ ঃ

যে নারীর কোথাও বিবাহের কথা-বার্তা চলছে সেটার সুরাহা হওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ

অর্থাৎ- "কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর যেন প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়" ।[৪১২]

তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না জেনে থাকে তাহলে অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না দিয়ে থাকেন তবে দুজনের মধ্যে যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন।

❑ এ্যাংগেজমেন্ট করা ঃ

ইদানিং আমাদের মুসলিম সমাজেও পাশ্চাত্য বিজাতীয় সভ্যতার প্রভাবে কিংবা অনুকরণে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে, এর মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা' শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, মুসলিম সমাজ বা ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। আরো নিন্দনীয় ব্যাপার হল, এই আংটি প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে কনেকে পরিয়ে দেয়। কেননা এই পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি। কেবলমাত্র আকদ তথা বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেই তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হবেন।

[৪১২] . সহীহ বুখারী-৫১৪৪, সুনানে নাসায়ী-৩২৪১।

❑ উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাঃ

উপযুক্ত পাত্র পেলে তার প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ .

"যদি এমন কেউ তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজতা সৃষ্টি হবে।" [৪১৩]

প্রিয় পাঠকপাঠিকা-, আজ আমাদের ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ কোথায় আর আমরা কোথায়। ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি। আমরা কি অস্বীকার করতে পারি যে, এসব আদর্শ আজ আমাদের আমলের বাইরে চলে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে ইসলামের বিমল রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি আর করণীয়গুলো ভুলে থাকি। আল্লাহ মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও প্রশান্তিময় করতে হলে আমাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতেই হবে। ইসলামের আদর্শকেই আকড়ে ধরতে হবে। শুধু কনে দেখা আর বিয়েশাদীতেই নয়-; জীবনের প্রতিটি কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুখে নয়; কাজে পরিণত করতে হবে তাঁর উম্মত দাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর যাবতীয় আদেশ এবং তাঁর রাসূলের সকল আদর্শ মেনে চলার তাওফীক দিন। আমীন।

❑ কুফু বা সমতার বিধানঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো কোনো হাদিসে স্বামী-স্ত্রীর সমতার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফকিহগণ

[৪১৩] . জামে' তিরমিযী-১০৮৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বামী-স্ত্রীর সমতার ক্ষেত্রে নয়টি বিষয় বিবেচনায় রাখার কথা বলেছেন। যথা- বংশ, খান্দান, আযাদি ও গোলামি, খান্দানি মুসলমান আর নওমুসলিম, দীনদারী, তাকওয়া, সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থান, আভিজাত্য, পেশা, শারীরিক সুস্থতা এবং বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন। প্রকৃত সত্য হলো, দীনদারী এবং চারিত্রিক বিষয়টি মূলত সবিশেষ লক্ষণীয়। বংশ বা খান্দানের বিচারে বাড়াবাড়ি করা ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ পরিপন্থী। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো পরিষ্কার বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের থেকে জাহেলী যুগের মন্দ স্বভাব ও পিতৃপুরুষের মিথ্যা অহংকার দূর করেছেন। মানুষ হয়তো মুমিন মুত্তাকি হবে, অথবা পাপী ও দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম সন্তান, আর আদম সৃষ্টি মাটি থেকে" ।[৪১৪]

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদের স্ব স্ব আমল দ্বারা এ ক্ষেত্রে সুন্দর উপমা স্থাপন করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচাতো বোন হযরত যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে স্বীয় গোলাম হযরত যায়েদ ইবনে হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে বিয়ে দিয়েছেন। এ যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ছেলে হযরত উসামা এর কাছে বিয়ে দিয়েছেন কুরাইশি কন্যা ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে। হযরত যাবাআ'হ বিনতে যুহাইর বিন আবদুল মুত্তালিবকে বিয়ে দিয়েছেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আলোকময় জীবনে এ জাতীয় উপমা প্রচুর। তাই বিয়েশাদিতে লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত দীনদারী এবং আখলাক বা চরিত্র। তবে মানুষের স্বভাবগত

[৪১৪]. ত্বাহাবী-৩৪৫৮, আল-জামে' লিইবনে ওয়াহাব-৩০। শরহুস সুন্নাহ-৩৫৪৪।

বৈচিত্রের বিবেচনায় বংশ, পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং ইসলাম গ্রহণে আগ পরের বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

❑ মহর এর গুরুত্ব ঃ

বিবাহ এজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যকার শরয়ী বন্ধন; আর বিবাহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে মহর, যা আমাদের দেশে কাবিন নামে পরিচিত। ইসলাম মহরকে স্ত্রী হালাল বা বৈধ হবার বিনিময় বলে ঘোষণা করেছেছ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে"।[৪১৫]

এই মহর সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মহর হচ্ছে সে জিনিষ যার বিনিময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করে নাও।[৪১৬]

স্ত্রীকে মহর পরিশোধ করা ফরয। আমরা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সহ অন্যান্য আমলকে অনেক গুরুত্ব দিরেও মহরের ব্যাপারে গুরুত্ব দেই না। অথচ মহর পরিশোধ করাকে আল্লাহ পাক ফরয করেছেন। মহর পরিশোধ করাকে কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে যে স্বাদ গ্রহণ কর তার বিনিময়ে অপরিহার্য ফরয হিসেবে তাদের মহর পরিশোধ করে দাও ।[৪১৭]

যারা মহর আদায়ে উদাসীন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে লোক স্ত্রীকে মহর প্রদানের শর্তে বিবাহ করেছে, অথচ সে ইচ্ছা করেছে মহর পরিশোধ না করার, তাহলে কিয়ামতের দিন সে যিনাকারী হিসেবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। [৪১৮]

এই মহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোন দান বা অনুগ্রহ নয়। এটা মহান আল্লাহর দেওয়া হুকুম এবং স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার, স্বামী তার স্ত্রীর এই অধিকার কোনভাবে ক্ষুন্ন করতে পারবে না।

❑ দেন মহর কিভাবে পরিশোধ করবে ঃ

স্বামীর উচিত কর্তব্য হল দাম্পত্য সংসার করার আগেই সম্পুর্ণ মহর পরিশোধ করা। তবে যদি কোন স্বামী অর্থাভাবে এই অধিকার একসাথে আদায়

[৪১৫]. সূরা আন-নিসা-২৪।
[৪১৬]. মুসনাদে আহমদ-৪৫৮৭।
[৪১৭]. সূরা আন-নিসা-২৪।
[৪১৮]. মুসনাদে আহমদ-১৮৯৩২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতে সক্ষম না হয়, তাহলে অল্প অল্প করে আদায় করতে পারবে। স্বামী তার এই দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করতে পারবে না। বরং ইসলাম তাকে মনের সন্তোষ সহকারে তা' পরিশোধ করার আদেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা মনের সন্তোষ্ট চিত্তে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মহরানা পরিশোধ করে দাও"। [৪১৯]

কিন্তু স্বামী একত্রে সব মহর পরিশোধ করতে না পারলেও বাসর রাত্রে মহরের একটা অংশ অন্তত পরিশোধ করা উচিত। আর বাকীটার ব্যাপারে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে।

❑ **মহর সম্পর্কে ইসলামের বিধান হচ্ছে;**

১. মহরকে ফরয মনে করে পরিশোধ করতে হবে।
২. মহর পরিশোধ করতে হবে সানন্দে সন্তোষ সহকারে।
৩. বাসর রাত্রেই মহর পরিশোধ করা উচিত।
৪. স্ত্রী ইচ্ছা করলে মহর পরিশোধের জন্য স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে।
৫. স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে পূর্ণ বা আংশিক মহর মাফ করে দিতে পারে।
৬. মহর নগদ অর্থ এবং দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমে ও দেয়া যায়।
৭. স্ত্রী মহরের দাবী প্রত্যাহার করে নেয়ার পর, পূণরায় তা দাবী করলে, স্বামী তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

❑ **মহরের পরিমাণঃ**

মহর নামায রোজার মতই ফরয, তাই এমনভাবে তা নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে স্বামীর পক্ষে সহজে আদায় করা সম্ভব হয়। আর এমনভাবে নির্ধারণ করা যাবে না যা স্বামীর জন্য পরিশোধ করতে কষ্ট হয়। কারণ এই মহর কোন হাসি তামাশা বা খেলনার বিষয় নয়। মোহরের সর্বোচ্চ কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। হযরত হাসান ইবনে আলী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে- তিনি এক মেয়েকে বিয়ে করে মোহরস্বরূপ তাকে একশ' দাসী দিয়েছিলেন, আর প্রত্যেক দাসীর সাথে দিয়েছিলেন এক হাজার দিরহাম। [৪২০]

[৪১৯]. সূরা আন-নিসা-৩।
[৪২০]. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-৮/৪৩।

ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে সর্বনিম্ন মোহর হলো দশ দিরহাম। আর এই দশ দিরহামের পরিমাণ হলো সাড়ে সাত মাশা রুপা। হানাফি মাযহাবের মতের পক্ষে দলিল হলো এই হাদিসটি- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "দশ দিরহামের কম কোনো মোহর নেই"। [৪২১]

তবে মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভারসাম্যতা রক্ষা করা জরুরি। উল্লেখ করার মতো নয় এমন তুচ্ছ মোহর নির্ধারণ করাও ঠিক নয়, আবার স্বামীর পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় এমন উচ্চ মাত্রার মোহর নির্ধারণ করাও সঙ্গত নয়। হযরত উমর (র.) মোহরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন- অধিক মোহর যদি মর্যাদা ও অহংকারের বিষয় হতো তাহলে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবিগণের মোহর অধিক হতো। আর উম্মুল মুমিনিনগণের অধিকাংশের মোহরই ছিল পাঁচশ' দিরহাম। প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (র.) এর মোহরের পরিমাণ ছিল চারশ' আশি দিরহাম। পাঁচশ' দিরহাম- আমাদের একালের দশ গ্রামে এক তোলা এই হিসাবে দেড় কিলো ত্রিশ গ্রাম এবং নয়শ' মিলি গ্রাম রুপা। এই হিসেবে মোহর নির্ধারণ করাই উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যাগণ এবং সাহাবিয়াগণের বিয়েতে রুপা কিংবা স্বর্ণ হিসেবেই মোহর নির্ধারণ করা হতো। সুতরাং প্রচলিত মুদ্রা কিংবা রুপার হিসাবে মোহর নির্ধারণ করার চাইতে সোনা কিংবা রুপার হিসাবে মোহর নির্ধারণ করাটাই সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয়। তাছাড়া নারীদের পক্ষেও এটা অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয়। তাছাড়া নারীদের পক্ষেও এটা অধিক ইনসাফ সম্মত। মুদ্রায় যদি মোহর নির্ধারণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রতিনিয়ত এর মূল্যমান কমছে। ফলে একটা সময়ে গিয়ে নির্ধারিত মান আর বহাল থাকে না।

❑ **যৌতুক এর বিধান :**

[৪২১]. মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-১৬৩৮৪, সুনানে দারেকুতনী-৩৬০৬, সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী-১৪৩৮৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যৌতুক শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। এটা এক প্রকার দান বিশেষ। এ দান আজ-কাল বিয়ের জন্যে শর্ত হয়ে গিয়েছে। আজ আমাদের সমাজে এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বের সহিত দেখা হচ্ছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে যে অর্থ বা উপহার আদায় করা হয়, সেটাকেই যৌতুক বলে। এই যৌতুকের কারণেই স্ত্রীর উপর চলে নানা ধরনের অত্যাচার। প্রিন্ট মিডিয়া খুললেই দেখা যায়, যৌতুক দিতে অক্ষম , এ কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে, এসিড দিয়ে মুখ ঝলসে দিয়েছে, আগুনে পুড়ে মেরেছে। যৌতুক প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের অনুশাসন মেনে নিতে পারলেই এই যৌতুক নামে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে কি কন্যা পক্ষ বরকে কিছুই দিতে পারবে না? উত্তর হলো; বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরকে কি দিয়ে উপহার দেবে সে কথাটি আমরা হাদীস থেকে জেনে নিই। বিশ্ব নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কালিজার টুকরা হযরত ফাতিমাকে বিয়ের সময় যা দিয়েছেন, সেগুলো হলোঃ-

১. একটি পাড়ওয়ালা কাপড়
২. একটি পানির পাত্র
৩. একটি চামড়ার বালিশ
৪. যাঁতা (আটা পিসার জন্য)
৫. মাটির পাত্র ইত্যাদি।

আর এইগুলো দেওয়ার কারণ যেহেতু বিয়ের পর কন্যা নতুন করে সংসার গড়ে তোলার দায়িত্ব নিচ্ছে, সে হিসেবে নতুন সংসারের সূচনা লগ্নে পিতা বা আপন আত্মীয় এবং অভিভাবক কন্যাকে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের কিছু সামগ্রী দিতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সামর্থের বাইরে প্রদর্শনীর জন্যে কিছু দেওয়া শরীয়ত বা ইসলাম কন্যার পিতাকে বাধ্য করেনি। এ ব্যাপারে তিনি যা করবেন তা নিজের সামর্থ অনুযায়ী করবেন।

❑ দাবি করাটাই যৌতুকঃ

আজকাল বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট চেয়ে বা দাবি করে যা আদায় করে নেয়, এমন কি বরপক্ষ এটাকে বিয়ের একটি শর্ত হিসেবে মনে করে। কিন্তু ইসলাম এটাকে সামান্য পরিমাণ ও অনুমতি দেয়নি। ইসলামের বিধান অনুযায়ী বরই কন্যার সকল প্রকার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। কনের যা কিছু প্রয়োজন বরই তা খরচ করবে। বরের জন্য খরচ করার কোন বিধান ইসলামে নেই। ইসলাম যেসব কারণে স্বামীকে স্ত্রীর উপর কতৃর্ত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে , সে সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে। "পুরুষ নারীদের পরিচালক বা কর্তা । কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপর জনের উপর বৈশিষ্টতা দান করেছেন। আর এ কারণে ও যে, পুরুষ (স্ত্রীর জন্যে) তার অর্থ সম্পদ ব্যয় করে" । [৪২২]

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব স্বামীর। আর এ খরচ করার কারণেই তাকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্বশীল পরিচালক বানানো হয়েছে। এই যৌতুক এক সময় হিন্দু সমাজে চালু ছিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম পরিবারে এই হিন্দু প্রথা চালু রয়েছে, আর এমনভাবে চালু রয়েছে যা ছাড়া একটি মেয়ের বিবাহ হয় না। এই যৌতুক বরপক্ষ থেকে শর্ত দিয়ে দাবী করে আদায় করছে অথচ যৌতুক দাবী করার কোন অধিকার ইসলাম বরকে দেয়নি।

❑ বর্তমান যৌতুকের অবস্থাঃ

এই যৌতুক এমন এক সামাজিক ব্যাধি যা ব্যক্তিকে অনেক নিকৃষ্ঠতম করে ফেলে। আজ সর্বদিক দিয়ে কোন মেয়েকে পছন্দ করার পর মেয়ের অভিভাবক কেবল যৌতুকের শর্ত পূরণ করতে না পারায় ছেলে উক্ত মেয়েকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে, এমনটি আজ অহরহ ঘটছে। যৌতুক দাবী করার এ অধিকার পুরুষকে কে দিলো? বিয়ের জন্যে কোনো মুসলমান এমন অন্যায় ও অশোভনীয় শর্তারোপ করতে পারে না। এটা একমাত্র কন্যাপক্ষের উপর জুলুম বৈ কিছু নয়। পিতা তার মেয়ের নতুন সংসার করার জন্য কিছু দিতে পারেন কিন্তু দাবী বা জোর করে কিছু আদায় করা কোন অবস্থাতে ঠিক

[৪২২] . সূরা আন-নিসা-৩৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না। এই যৌতুকের কারণে অনেক ঘরে যুবতী মেয়েরা পিতার উপর বোঝা হয়ে বসে আছে, কিন্তু পিতা তাদেরকে বিয়ে দিতে পারছে না ।

অন্য দিকে যাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু বরকে যৌতুক না দেওয়ার কারণে কতো দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। কতো সোনার সংসার বিষাদে পরিণত হয়েছে। আর অকালে কত জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে, কতো নারী নিজেদের জন্মকে ব্যর্থ মনে করছে। এই যৌতুকের কথা প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় বিভীষিকাময় তান্ডব লীলা। তাই বলব ও মুসলিম যুবকেরা আমরা কেন নিজের পায়ে না দাড়িয়ে অন্যের দিকে তাকাব। পরের দিকে না তাকিয়ে নিজেকে আগে গড়ি, তার পর বিয়ে করি। আমরা পুরুষ কেন মেয়ের বাপের অর্থের দিকে চেয়ে থাকব? তাই আসুন এই অভিশপ্ত যৌতুককে ঘৃণা করে সমাজ থেকে এই নিকৃষ্ট প্রথাকে চিরবিদায় দিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসি। একটি যৌতুক মুক্ত সমাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলেই সমাজ মুক্তি পাবে একটি জুলুমের কারাগার থেকে, শান্তি আর ভালবাসা থাকবে সংসার জীবনে। এই প্রত্যয় নিয়ে নারী-পুরুষ প্রতিটি যৌতুকলোভির বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামে এগিয়ে আসি। আল্লাহ আমাদের এই অভিশপ্ত অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন

❑ ওলীমা বা বৌভাতঃ

বিয়ে যেহেতু একটি মানবিক চাহিদা পূরণের হালাল ও বৈধ পন্থা, তাই শরিয়ত এটাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রচার ও প্রসার পছন্দ করেছে। বিয়েকে প্রচার করার একটি উত্তম পন্থা হলো ওলিমা। ওলিমার দাওয়াতের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর এই বন্ধনের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ওলিমা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামকেও ওলিমা করতে উৎসাহিত করেছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র.) বিয়ে করলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এই বলে ওলিমা করতে তাকিদ দেন- "একটি ছাগল জবাই করে হলেও ওলিমা কর।" [৪২১]

[৪২১]. সহীহ বুখারী-২০৪৮, সহীহ মুসলিম-১৪২৭।

সুতরাং ওলিমা করা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিশেষ সুন্নত। ওলিমায় কী ধরনের খাবার তৈরি হবে সেটা একান্তই আয়োজকদের সামর্থের ওপর নির্ভরশীল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়নাব (র.) এর ওলিমায় ছাগল জবাই করেছেন । [৪২৬]

আবার উম্মুল মুমিনিনদের কারও কারও ওলিমা করেছেন সামান্য যবের ছাতু দিয়ে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, ওলিমার সম্পর্ক সামর্থের সাথে। তাই সামর্থের বাইরে খরচ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। বিয়ে এবং স্ত্রীর সাথে বন্ধন সম্পাদিত হওয়ার পরই ওলিমা করা বাঞ্চনীয়। একটি বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে এ কথা উলিখিত হয়েছে, হযরত যায়নাব (র.) এর সাথে বাসর হওয়ার পরই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজন ডেকেছেন এবং তাদেরকে ওলিমার খাবার খাইয়েছেন। হাদিস শরিফে ওলিমার দাওয়াত কবুল করার প্রতি জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (র.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে- "কেউ যদি কাউকে ওলিমার দাওয়াত দেয় তাহলে অবশ্যই উপস্থিত হওয়া উচিত" । [৪২৭]

কোনো কোনো বর্ণনায় ওলিমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করাকে নাফরমানি এবং পাপ বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র.) লিখেছেন- ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফিঈ (র.) প্রমুখের মতে ওলিমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব; অবশ্যই যদি সুনির্দিষ্টভাবে দাওয়াত দেয়া হয়। তবে বিশুদ্ধ মত হলো- ওলিমার দাওয়াত কবুল করা সুন্নত এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো অমুসলমান কোনো মুসলমানকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ডেকে পাঠায় তাহলে তাতে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে। আর যদি ওলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত পরিপন্থী কার্যাবলী হয় তাহলে সেখানে শরিক না হওয়াই উচিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ পরবর্তী দিনে ওলিমাকে হক বলেছেন। দ্বিতীয় দিনের ওলিমাকে বলেছেন লোক দেখানো; তাই একাধারে দুই তিন দিন পর্যন্ত অথবা তার চেয়েও অধিক সময়ব্যাপী

[৪২৬]. সহীহ বুখারী-৫১৬৮, সহীহ মুসলিম-১৪২৮, সুনানে আবু দাউদ-৩৭৪৩।
[৪২৭]. সহীহ মুসলিম-১৪২৯, মুয়াত্তা মালেক-২০০৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওলিমা করা মাকরুহ এবং অপছন্দনীয়। অবশ্য যদি এর পেছনে কোনোরূপ অহংকারবোধ না থাকে, আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা অধিক হয় আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের অতিথিগণ সম্পূর্ণ আলাদা হন তাহলে একাধিক দিনব্যাপী ওলিমা করা জায়েয আছে। হযরত আনাস (র.) এর বর্ণনা মতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সফিয়্যা (র.) এর বিয়ে উপলক্ষে তিনদিন পর্যন্ত ওলিমা করেছেন। [৪২৬]

বরং হযরত হাফসা বিনতে সীরীন (র.) বলেন, "আমার বাবা সীরীন বিবাহ করলে ওলিমা করেছেন সাতদিনব্যাপী এবং বিভিন্ন সাহাবিকে বিভিন্ন দিন দাওয়াত করেছেন"। [৪২৭]

সাধারণভাবে আমাদের ফকিহগণ এ কথাই লিখেছেন- বিয়ের পরের দিন অথবা দ্বিতীয় দিনই ওলিমা করবে। তারপর আর ওলিমা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বিবাহ পরবর্তী ওলীমা করা বরের পক্ষে সুন্নাত হলেও আজকাল আমাদের সমাজে কিছু রক্তচোষা যৌতুকলোভী ডাকাত অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এটাও কনের পিতার উপর চাপিয়ে দেয়। রীতিমত কতজনকে খাওয়াবে এটা নিয়ে দর কষাকষিও চলে। এমনকি অনেক সময় বরযাত্রী খাওয়ানোর সংখ্যা নিয়ে দর কষাকষি করতে গিয়ে বিবাহই ভেঙ্গে যায়। এই রকম দরাদরি করে চাপিয়ে দেওয়া দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা এবং খাওয়া সম্পুর্ণরূপে অবৈধ। আরো আশ্চর্য বিষয় হল, কন্যা দায়গ্রস্থ পিতার উপর দর কষাকষি করে চাপিয়ে দেয়া এই ভোজ অনুষ্ঠানের কুপ্রথা প্রচলনের ফলে অনেক বিবাহে বরপক্ষে আর ওলীমা অনুষ্ঠানও করা হয় না। বিবেকহীন এই সমস্ত ডাকাতেরা বর পক্ষের জন্য নির্ধারিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ওলীমাকে কনে পক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়া বিদাআতের মাধ্যমে আদায় করতে চায়। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বদা সত্যকে সত্যের খাতিরে সত্য হিসেবে জানার, বলার ও অনুসরণ করার এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে জানার, বলার ও পরিত্যাগ করার শক্তি ও সৎসাহস দান করুন। আমীন

[৪২৬]. সহীহ বুখারী-৪২১২।
[৪২৭]. মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ-১৭১৬৩।

ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশেমী ছাহেব কিবলা (মু. জি. আ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আউলিয়ায়ে কেরাগণের স্মৃতিধন্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন হাটহাজারী, পাঁচলাইশ বর্তমান বায়েজীদ থানার অন্তর্গত জালালাবাদের কুলগাঁও গ্রামে এক ধর্মভীরু সম্ভ্রান্ত মুসলিম কাযী পরিবারে হাশেমী বংশে ১৯২৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর রবিবার রাতে আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মু.জি.আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ সূফী মাওলানা কাযী আহছানুজ্জামান হাশেমী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ হাশেমী বংশের একজন কৃতিপুরুষ। তাঁর মাতা ছিলেন বাংলার মুহাদ্দিসে আযম অলিয়ে কামেল চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতীব আল্লামা ছফিরুর রহমান হাশেমী রাহিমাহুল্লাহ এর ঔরসজাত কন্যা। তাঁর পূর্বপুরুষ সৈয়্যদুশ শোহাদা ইমাম হোসাইন (রা.) এর বংশধর। তাঁর পিতার পূর্বপুরুষ মদীনা শরীফ হতে হিজরত করে বাগদাদে আসেন। (তাঁদের বংশ ইমাম হাসান (রা.) এর সাথে মিলিত হয়)।

বাল্যকাল থেকেই আল্লামা হাশেমী (মু. জি. আ.) তীক্ষ্ণ মেধাবী ও অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন। ছয় বছর বয়সে কুরআন মাজীদ খতম করেন। উর্দূ, ফার্সি, আরবী ও বাংলার প্রাথমিক জ্ঞান স্বীয় গৃহে আপন বুযর্গ পিতার কাছ থেকে অর্জন করেন। অতঃপর প্রাইমারি স্কুল পাশ করে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং নিয়মিতভাবে শিক্ষা অর্জন আরম্ভ করেন।

আল্লামা হাশেমী (মু. জি. আ.) জমাতে উলা পাশ করে ওয়াজেদিয়া মাদ্‌রাসায় একবছর যাবৎ দরস দানে লিপ্ত থাকেন। তখন তাঁর অন্তরে উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা তথা কামিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য তৎকালীন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা-ই-আলীয়া ঢাকাতে ১৯৫১ সালে টাইটেল ক্লাসের হাদীস বিভাগে ভর্তি হন। তথায় তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে হাদীস শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এদিকে একই সময়ে তিনি সন্ধ্যাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দূতে ডিপ্লোমা কোর্সও সম্পন্ন করেন। তিনি তখনকার সময়ে পাক-ভারতের অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত আলেম শরিয়ত ও তরিকতের মাজমাউল বাহরাইন আরবী ও উর্দূ ভাষার উপর অগণিত গ্রন্থ রচয়িতা আল্লামা মুফ্‌তি সৈয়দ আমীমুল এহছান মুজাদ্দেদী বরকতী কুদ্দেসা সিররুহুর সান্নিধ্যে থেকে ইল্‌মে হাদীস, ফিক্‌হ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৫২ সালে হযরত মুফ্‌তি ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে "নাইলুল মুরাদ বে-আসানিদে আশ্ শায়খ নূরুল ইসলাম" বিশেষ সনদ ও সম্মাননা প্রদান করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা হাশেমী তৎকালীন বহু খ্যাতনামা বুযর্গ, বিজ্ঞ, সুদক্ষ, দ্বীনি আলেমগণের কাছ থেকে ইল্‌ম অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম শরিয়ত ও তরিকতের মাজমাউল বাহরাইন আল্লামা মুফ্‌তি সৈয়দ আমীমুল এহছান মুজাদ্দেদী বরকতী রাহিমাহুল্লাহ হতে তারীখে ইল্‌মে হাদীস ও বোখারী ২য় অধ্যয়ন করেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ হলেনঃ

(১) আশ শায়েরুল আবকরী আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরী (র.)
(২) মাহেরুল ফুনুন আল্লামা হুজ্জাতুল্লাহ্ মুহাম্মদ শফী ফিরিঙ্গী মহল্লী (র.)
(৩) আল্লামা আবদুস সত্তার বিহারী (র.)
(৪) মাওলানা মমতাজুদ্দীন (র.)
(৫) খাতেমুল মুহাক্কেকীন হযরতুল আল্লাম নজীরুদ্দীন কটকী (র.)
(৬) হযরতুল আল্লাম জাফর আহমদ উছমানী (র.)
(৭) জামেয়ে উলূমে মাকুল ওয়া মনকুল আল্লামা আজিজুর রহমান (র.)
(৮) মুক্‌তাদায়ে শরিয়ত আল্লামা মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আতীকুল্লাহ্ খাঁন (র.)
(৯) হযরতুল আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ মুছা মুজাদ্দেদী (র.)।

ঢাকা হতে হুযুর কিবলা শিক্ষা সমাপনীর পর স্বীয় বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় যোগ দেন এবং প্রধান মুহাদ্দিস পদে নিযুক্ত হন। মাদ্‌রাসা অভ্যন্তরে তাঁকে টাইটেল সাহেব সম্বোধন করা হতো। এছাড়াও তিনি পটিয়া শাহ্‌চাঁন্দ আউলিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী অদুদীয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসায় বেশ কিছুদিন যাবৎ হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম- এর খেদমত করেন।

হুযুর কিবলা ১৯৬৪ সালে নিজের বাড়ীতে একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি মসজিদ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাতে তিনি অধ্যক্ষ ও পরিচালক পদে থেকে দরস দানে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে দিবারাত্রি হুযুর কিবলা তরিকতের মহান দায়িত্ব পালন এবং দেশের আনাচে কানাচে ওয়াজ নসীহত ও ভাষণ-বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে দ্বীনের সঠিক মতাদর্শ আকাঈদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে প্রতিষ্ঠা করার মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

হুযুর কিবলা আল্লামা হাশেমী (মু. জি. আ.) তাঁর শিক্ষকতা জীবনে কত ছাত্রকে পাঠদান করেছেন তার হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন। বর্তমানে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নামকরা যত আলেম ও পীর মাশায়েখ রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই হুজুরের শিষ্যত্ব গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। দেশের আনাচে কানাচে হুজুরের অগণিত শিষ্য রয়েছেন। শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন ও দিবারাত্রি সর্বদা ওয়াজ নসীহত, বিভিন্ন বিষয়ে

গবেষণা ও ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি ব্যস্ততা সত্বেও হুযুর কিবলা নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাবলী রচনা করেন ঃ

১. নসীহাতুত্ তালেবীন।
২. যাদুল মুসলেমীন।
৩. আকাঈদে বাতেলা।
৪. সত্যের আহবান।
৫. আদ্‌দুররুদ্-দলায়েল বে-কেরাহতিল জামাতে ফিন্ নাওয়াফেল।
৬. আল্ আরবাইন ফি মুহিম্মাতিদ্ দ্বীন।
৭. মে'রাজুল মু'মিনীন।
৮. মুসলমানদের সম্বল পরহেজগারদের দিশারী।
৯. ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন?
১০. নূরে মোস্তফা।
১১. আল্লামা আহ্‌ছানুজ্জামান হাশেমী (র.)-এর জীবনী গ্রন্থ।
১২. শাযরাতুয্ যাহাব।
১৩. দো'আর ভাণ্ডার।
১৪. তাযকেরাতুল কেরাম।
১৫. ওয়াযায়েফে হাশেমীয়া।

হুযুর কিবলা আল্লামা হাশেমী (মু.জি.আ.) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে সুদৃঢ়করণে অদ্যাবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। হুযুর কিবলা নিজ বাড়ীতে ১৯৬৪ সালে আহ্‌ছানুল উলূম জামেয়া গাউছিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা, হেফজখানা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। মাদ্‌রাসা সংলগ্ন মসজিদে গাউছিয়া রেফাঈয়া স্থাপন করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি কামিল শ্রেণী পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। আনোয়ারায় রায়পুর গাউছিয়া হাশেমীয়া মাদ্‌রাসা হেফজখানা ও এতিমখানা নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এছাড়াও চাঁদপুর জেলায় গাউছিয়া হাশেমিয়া সেকান্দর আলী (ফাযিল) মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ জামিরজুরি রজবিয়া আজিজিয়া মাদ্‌রাসা সহ আরো বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি আধ্যাত্মিক তরিকত ভিত্তিক সংগঠন "আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাউছিয়া জিলানী কমিটি" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার দেশব্যাপী অনেক শাখা রয়েছে। এ সংগঠনের মাধ্যমে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে হুযুরের নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় হুজুর কেবলার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার ব্যবস্থাপনায় ও মাঠে ১২দিন ব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শীর্ষক সেমিনার দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুযর্গানে দ্বীনের অংশগ্রহণে বর্তমান সময়ে দেশে ঐতিহাসিক মাহ্ফিলে পরিণত হয়েছে।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও হুযুর কিবলার অবদান অতুলনীয়। সর্বদা ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হুযুর কিবলা সদা সচেষ্ট। হুযুর কিবলার অবদানের সুফল ও খ্যাতি শুধু স্বদেশেই সীমিত নয়, বরং আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্বের বহুদেশ সফরের মাধ্যমে সুন্নীয়তের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আটবার পবিত্র হজ্জব্রত ও একবার পবিত্র ওমরাহ্ পালন করেন। ১৯৮৯ইং সনে প্রথমবারের মত তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। এরপর প্রবাসী সুন্নীদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকবার আরব আমিরাত ও কাতার সফর করেন।

১৯৯৪ইং সনে সুদূর আমেরিকায় অবস্থানরত সুন্নী মুসলমানদের একান্ত আবেদন ও ব্যবস্থাপনায় হুযুর কেবলা আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটে কষ্টসাধ্য সফর করেন। তাছাড়া হুযুর কেবলা ইরাকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, গাউছে পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহিমাহুল্লাহ এর মাযার সহ প্রায় ২৫ জন নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর রওজায়ে পাক এবং বিভিন্ন দেশে আরো বহু আউলিয়া কেরামের মাযার জিয়ারত করে ফুয়ুজাত ও বারাকাত লাভে ধন্য হন।

হুজুর কেবলার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা, সংগঠন, সমাজ সেবামূলক সংস্থা সমূহ সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার ব্রতে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক রেজিঃকৃত আন্তর্জাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'গোলজার হাশেমী ট্রাষ্ট' ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা ও অনুমোদন নেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। নতুন প্রজন্মকে বিশেষ করে ছাত্রদেরকে সুন্নিয়তের আলোকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা' সংগঠনের তিনি প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। সুন্নী জনতাকে রাজনীতি সচেতন ও একই প্লাটফর্মে একত্রিত করার মানসে 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' নামে রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশ মাতৃকার ভালবাসায় বিভোর আল্লামা হাশেমী ৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় অধ্যয়নরত অবস্থায়ই প্রথম সারির ছাত্রনেতাদের অন্যতম ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে ওলামা-মাশায়েখগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসীলায় মাসলাকে আহলে সুন্নাত ও মাযহাবে হানাফীর প্রচার প্রসারের স্বার্থে ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠির কল্যাণে হুজুর কিবলাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। আমীন।

রাসূলুল্লাহর (দ.) জামা মুবারকের বরকত

হযরত আসমা বিনতু আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

" هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَلْبَسُهَا، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ , قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا، يَسْتَشْفِي بِهَا".

অর্থাৎ "ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুব্বা। তিনি ইহা পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর ইহা আমার বোন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর এটা আমার কাছে রাখি। আমাদের কেউ অসুস্থ হলে এটি ধুয়ে তাকে পান করাতাম। ফলে সে সুস্থ হয়ে যেত। (সহীহ মুসলিম-২০৬৯, মুসনাদে আহমদ-২৬৯৪২)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات

دل میں ہیں لاکھوں امیدیں جلوہ گر
ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر
آیت لاتقنطوا پر رکھ نظر
ہاتھ پھیلائے ہیں بندے تیرے در
تو نہ بخشے جرم وعصیاں کو اگر
تیرے در کو چھوڑ کر جائے کدھر
یاالٰہی بہر آں خیر البشر
کر روا ہر مدعا کو سر بسر
جرم سے آزاد کر کے موت کر
زمرۂ ناجی میں یارب حشر کر
الٰہی تو ہمیں غم سے چھڑا دیگا تو کیا ہوگا
رہ عرفان غریبوں کو بتا دیگا تو کیا ہوگا
تو صدھا کافروں کو دولت ایمان دیتا ہے
مسلمان مجھ سے کافر کو بنا دیگا تو کیا ہوگا
آسرا ہے نور اسلام کو تیرا
انت ربی انت حسبی ای خدا

প্রাণীর প্রতি দয়া

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"আল্লাহ পাক সকল ক্ষেত্রে দয়া আবশ্যক করে দিয়েছেন। তোমরা কোন প্রাণী যবেহ করলে তাকে দয়া অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। আর যখন কোন প্রাণীকে হত্যা করতে হয় তাহলে দয়া পরবশ হয়ে হত্যা কর। তোমাদের উচিত যবেহ করার পূর্বে ছোরা (যবেহ করার উপকরণ) ভালভাবে ধারালো করে নেয়া আর যবেহ যোগ্য প্রাণীকে আরাম শান্তি দিবে।"

(সুনান ইবনু মাজাহ-৩১৭০- মুসনাদে আহমদ-১৭১১৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রাপ্তিস্থান ঃ

গোলজার হাশেমী ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত

আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া কামিল (এম,এ) মাদ্‌রাসা

প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক : ইমামে আহলে সুন্নাত, মুরশেদে বরহক

আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ : ০৩১-৬৮৩৯১৭